শ্বেত-চক্র

কামাক্ষীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়

প্রাপ্তিস্থান : 'সংকেত-ভবন', শম্ভুনাথ
পণ্ডিত ষ্ট্রিট, পোঃ আঃ এলগিন রোড, কলকাতা

'সাহিত্যিকা'র পক্ষে ১২৩, আমহার্স্ট স্ট্রীট, কলকাতা
থেকে সাধন চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক প্রকাশিত

দাম দু টাকা

প্র থ ম সং স্ক র ণ
ভাদ্র :: ১৩৫৩

৩, শম্ভুনাথ পণ্ডিত স্ট্রীট, কলকাতার 'রংমশাল প্রেস
লিমিটেড' থেকে দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক মুদ্রিত

চেয়ারে বসে রঞ্জিত বললো, "এ-পথ দিয়ে যাচ্ছিলুম তাই ভাবলুম আর একবার দেখা করে যাই!"

বিশেষ আপ্যায়িত হয়ে মাধব বললো, "নিশ্চয়ই! বিলক্ষণ! এতো আপনাদেরই ঘরবাড়ি। তা একটু চা-টা—"

"মন্দ কি? যা বৃষ্টি নেমেছে, চা না খেলে ঠিক যেন জমছে না!"

সঞ্জীব এক পাশে বসে দোকানের হিসেব-পত্র দেখছিলো। পুলিশের লোককে ঘনঘন আসতে দেখে ব্যাপারটা সে যেন ঠিক পছন্দ করলো না। মুখ তুলে একবার রঞ্জিতকে ভালো করে দেখে আবার নিজের হিসেবে মন দিলো।

চায়ের পেয়ালা শেষ করে রঞ্জিত বললো, "ওই ২৭৭ নম্বরে খুনের ব্যাপারটা বলছিলুম মশাই! ব্যাপারটা এবার রীতিমতো ঘোরালো হয়ে উঠেছে। সেই ভাঙা বাল্‌ব্‌টা বিশেষজ্ঞদের দিয়ে আমরা পরীক্ষা করিয়েছি। তাঁরা ভালো করে পরীক্ষা করে বলছেন আসলে ওটা নাকি বাল্‌ব্‌ই নয়—এক ধরণের বিষাক্ত বোমা!—"

"বলেন কি? বোমা?—এ যে দেখছি বোমার যুগ এলো! একটা মানুষ মারতেও বোমা? কিন্তু এ কেমনধারা বোমা মশাই, ঠিক মানুষটি মরলো অথচ দেয়াল থেকে চূর্ণবালি পর্যন্ত খসলো না?"

"এই বোমার ব্যাপারটাই তো মজার! এ-ভাবে কখনো

আগে মানুষ খুন করা হয়েছে বলে শুনিনি। বাল্‌ব্‌টার ভেতরের ফিলামেণ্টটা সরিয়ে নাকি পাতলা একটা তারের সঙ্গে গান্‌-কটন্‌ জড়ানো ছিলো। সকেট্‌ আর ঐ গান্‌-কটন্‌-এর সঙ্গে ছুঁয়েছিলো সেলুলয়েডের চারদিক-বন্ধকরা একটি পাত্র আর সেই পাত্রের মধ্যে ছিলো কী যেন এ্যাসিড—কী এ্যাসিড··· ট্র্‌সিক, না—"

রঞ্জিতকে বাধা দিয়ে সঞ্জীব বললো, "ট্র্‌সিক না, সম্ভবত প্রুসিক এ্যাসিড। ব্যাপারটা বুঝতে পারলুম। ঐ বাল্‌ব্‌-এর মতো দেখতে বোমাটিকে ল্যাম্প-হোল্ডারে লাগিয়ে সুইচ টিপলেই বিদ্যুতের উত্তাপে পাতলা তারটা গরম হয়ে উঠবে, গরম তারটা গান্‌-কটন্‌কে জ্বালিয়ে দেবে, ফলে সেলুলয়েডের পাত্রটাও জ্বলে উঠবে—আর সেই আগুনের আঁচে প্রুসিক এ্যাসিডের বাষ্পে ভরে যাবে সমস্ত ঘর। সেই বাষ্প নাকে গেলে মৃত্যু হতে খুব বেশি দেরি হয় না।"

সঞ্জীবের কথা তারা দুজনে মন দিয়ে শুনছিলো। কথা শেষ হলে রঞ্জিত বললো, "আপনি বুঝি বিজ্ঞানের ছাত্র?"

জীবনে এই বোধহয় প্রথম মাধব গর্ব বোধ করলো তার ছেলের লেখাপড়ার সম্বন্ধে। সে-ই উত্তর দিলো, "হ্যাঁ মশাই, আর বলেন কেন! এই লেখাপড়াটাই ওর একমাত্র নেশা।"

"তাই নাকি?" উত্তরে বললো রঞ্জিত তারপর আড়চোখে একবার ভালো ক'রে সঞ্জীবকে দেখে নিয়ে অন্য প্রসঙ্গ উত্থাপন

করলো। সঞ্জীবের কেন জানি না সেই স্বর আর ঐ আড়চোখের চাউনিটুকু মোটেই ভালো লাগলো না।

"আপনার বাড়ির সামনে কে থাকেন, মাধববাবু?"

"ধনঞ্জয় শর্মা, কবিরাজ।"

"শুনছিলুম শুধু কবিরাজিই তাঁর ব্যবসা নয়, তিনি নাকি হাত-টাত দেখেন, নানা লোককে নাকি নানা পরামর্শ দেন, এ-পাড়ায় নাকি তাঁর খুব নাম-ডাক?"

"হাত দেখার ব্যাপারটা জানি না মশাই! তবে তিনি অত্যন্ত বিচক্ষণ আর প্রাচীন লোক। সবাই তাই তাঁর কাছে যায়।"

"ভারি অদ্ভুত মজার লোক তো! তাঁর কাছে একবার আমাকে নিয়ে চলুন না। ভদ্রলোকের কাছে হয়তো দরকারী নানা খবর পাওয়া যাবে।"

উৎসাহিত হয়ে মাধব বললো, "আমিও তো তাঁরই জন্যে অপেক্ষা করছি। তিনি সেই কোন ভোরে বেরিয়েছেন কলকাতার কাছে কোথায় যেন গাছ-গাছড়ার সন্ধানে। এখনি ফিরলেন বলে।—খোকা, দেখ তো, ধনঞ্জয় শর্মার ঘরে আলোটা জ্বলছে কিনা।"

সঞ্জীব দরজা ফাঁক করে দেখে বললো, "হ্যাঁ, কবিরাজমশাই বোধ হয় এই এলেন। আলো জ্বলছে। জানলাটা তিনি খুলছেন দেখলুম। বৃষ্টিটা তো ধরে এলো বাবা, আমি একটু ঘুরে আসছি। এখনি আসবো।"

মাধব আর রঞ্জিত বেরিয়ে যেতে সঞ্জীবও বেরুলো।

এতোক্ষণে বৃষ্টির জোর কমে এসেছে। বাতাসের জোর বিশেষ নেই। তাই রাস্তা পেরিয়ে ধনঞ্জয় শর্মার বাড়ি পৌঁছতে তাদের অসুবিধে হোলো না।

ঘরে ঢুকে তারা দেখলো ধনঞ্জয় একটা বেশ বড়সড় গোছের ঝুলি থেকে নানা ভিজে গাছগাছড়া স্তূপাকার করে একপাশে রেখেছেন, তারপর সযত্নে এক-এক জাতের লতাপাতাগুলো বেছে আলাদা করে রাখছেন।

মাধব বললো, “কবিরাজমশাই, ইনি রঞ্জিতবাবু, পুলিশ ইন্স-পেক্টর। আপনার সঙ্গে দেখা করতে এসেছেন ২৭৭ নম্বরে জয়-কৃষ্ণ সামন্তের মৃত্যু সম্পর্কে।”

স্মিত মুখে ধনঞ্জয় তাদের বসতে বললেন। “ভারি খুসি হলুম রঞ্জিতবাবু আপনার সঙ্গে পরিচিত হয়ে। কী খবর জানতে চান বলুন। সব রকম সাহায্য করতেই আমি প্রস্তুত। তবে তার আগে একটু চা—”

“না-না,” হাত ঘড়ির দিকে চেয়ে রঞ্জিত উত্তর দিলো, “সাড়ে-আটটা বেজে গেছে। এতো রাতে আর চা নয়। তা ছাড়া একটু আগেই মাধববাবুর ওখানে খেয়ে এলুম।”

“বেশি চা না খাওয়াই ভালো,” বলে ধনঞ্জয় একেবারে কাজের কথা পাড়লেন, “কিন্তু জয়কৃষ্ণ সম্বন্ধে তো কোনো কথা আমি জানি না। আট বছর আগে আমি প্রথম এ-পাড়ায়

আসি। তারো সাত বছর আগে ভদ্রলোক এ-পাড়া ছেড়ে গিয়েছিলেন।”

“জানবার অবশ্য কথা নয়। তবে আপনার কাছে নানা ধরণের লোকজন সব আসে তো! তাই ভাবছিলুম কারুর কাছে যদি এমন কোনো খবর পেয়ে থাকেন যাতে আমাদের পক্ষে তদন্তের কোনো রকম সুবিধে হয়—”

“আপনারা তা হলে এই মৃত্যুকে আত্মহত্যা বলে মনে করেন না?”

“কী করে করি বলুন! প্রথমত জয়কৃষ্ণের পকেটে আনন্দ-মোহন নামে যে-ভদ্রলোকের চিঠি পাওয়া গিয়েছিলো তাতে স্পষ্ট ইঙ্গিত ছিলো জয়কৃষ্ণ চোরাই জিনিস কেনাবেচার ব্যবসা করে। আমরা তার বাড়ি খানাতল্লাস করে অনেক সব চোরাই মাল পেয়েছি। যে-লোক আত্মহত্যা করতে যায় সে কি কখনো মরবার আগে নিজেকে চোর বলে প্রমাণ করে যাবে?”

“কী জানি মশাই! মানুষের মন ভারি বিচিত্র জিনিস। আমার তো ঢের বয়েস হোলো—কিন্তু এখনো পর্যন্ত মানুষের মন ঠিক চিনলুম না। খবরের কাগজের ও করোনার তদন্তের রিপোর্ট পড়ে আমার তো একরকম ধারণা জন্মে গিয়েছিলো যে জয়কৃষ্ণ সামন্ত কোনো কারণে আত্মহত্যা করতে বদ্ধপরিকর হয়েছিলেন এবং সে-কারণেই একটা ঘোরালো উপায়ে বিষ খেয়ে মরেছেন! কিন্তু কাগজে তো চিঠির সবটা ছাপা হয়নি। তাই চোরাই মালের কথা জানতুম না।”

"এটা যে আত্মহত্যা নয় আরো অনেকগুলি প্রমাণ তার সাক্ষী দেয়। ও-বাড়িটা সত্যিই আনন্দমোহন কিনেছেন, তাতে সন্দেহ নেই। অবশ্য বলাই বাহুল্য আনন্দমোহন বলছেন এই চিঠির বিষয়ে কিছুই তিনি জানেন না। টেলিফোনে চাবি কাউকে দেবার কথাও তিনি নাকি বলেননি। যাঁর বাড়িতে চাবি থাকতো তাঁর নাম পরিতোষবাবু। পরিতোষবাবু বলছেন আনন্দমোহন নাকি তার আগের দিনেও টেলিফোন করেছিলেন এক শিখ ভদ্র-লোককে চাবি দেবার জন্যে। সেই শিখ ভদ্রলোক নাকি বাড়িটার মেঝে পেটেণ্ট স্টোনের বানাবার কনট্র্যাক্ট নিয়েছেন। জয়কৃষ্ণ-বাবুর মৃত্যুর আগের দিন সেই শিখ ভদ্রলোক অল্প সময়ের জন্যে চাবি নিয়েছিলেন। অথচ আনন্দমোহনবাবু বলছেন সেই শিখ ভদ্রলোকের কথাও তিনি কিছুই জানেন না।"

তারপর রঞ্জিত সেই বিষাক্ত-বোমার কথা জানালো এবং জানতে চাইলো এ-পাড়ায় এ-ধরণের কোনো শিখ থাকে কিনা যার উপর ধনঞ্জয়ের সন্দেহ হয়।

উত্তরে ধনঞ্জয় বললেন, "কিন্তু কী রকম দেখতে বললেন না তো!"

"ওইখানেই গোলমাল! পরিতোষবাবু বলছেন তাকে যে-কোনো সাধারণ শিখের মতোই দেখতে। শুধু দাড়ির রঙটা কটা আর কপালের ওপর গভীর ক্ষতের দাগ—"

রঞ্জিতের কথা শেষ হবার আগেই সবাইকে চমকে

হুড়মুড় করে ঘরে ঢুকলো সঞ্জীব। তার মুখ চোখ উত্তেজনায় উদ্‌ভ্রান্ত।

"রঞ্জিতবাবু! আপনার খোঁজেই এসেছি। সাঙ্ঘাতিক কাণ্ড। শিগগীর আমার সঙ্গে আসুন। 'চাঁদনি টকির' কয়েকটা বাড়ির পরে ছোটো একটা গলি আছে। সেখান দিয়ে যাবার সময় কার যেন গায়ে পা লাগলো। অন্ধকারে দেখতে পাইনি। দেশলাই জ্বেলে দেখি এক ভদ্রলোক পড়ে রয়েছেন। চিনতে কষ্ট হোলো না, তাঁর নাম রমেন মজুমদার। প্রত্যেক শুক্রবার তাঁর দিদিমার সঙ্গে দেখা করতে আসেন। আপনারা শিগগীর আসুন। মনে হচ্ছে বেঁচে নেই। সমস্ত জায়গাটা জলে আর রক্তে একাকার। তার পিঠে একটা ছুরির ফলা বিঁধে রয়েছে।"

তৃতীয় অধ্যায়

"দুই"

বাইরে বৃষ্টি থেমেছে। কিন্তু মেঘের কামাই নেই। ভিজে বাতাস হু-হু করে বইছে। সমস্ত শরীরটা সিরসির করে।

'চাঁদনি টকি'র পর কয়েকটা বাড়ি ছাড়িয়ে সেই অন্ধকার গলি। যুদ্ধের আগে গ্যাসের আলো জ্বলতো। এখন জ্বলে না। রঞ্জিত পকেট থেকে ছোটো টর্চ বার করে জ্বাললো। সে পুলিসে কাজ করে। অনেক রকম খুন-খারাপী দেখতে অভ্যস্ত। তবু, আলো জ্বালাবার পর, সে-ও শিউরে উঠলো। কয়েক পা দূরেই পড়ে রয়েছে একটি দেহ। উপুড় করা। জলে আর কাদায় একাকার জায়গাটা। মৃত ব্যক্তির জামা-কাপড় জলে কাদায় মাখামাখি হয়ে গেছে। পিঠের উপর কী একটা জিনিস চকচক করছে।

ধনঞ্জয় উবু হয়ে বসে সেই চকচকে জিনিসটায় হাত দিতে গেলেন। তাঁর হাতটা ধরে ফেলে রঞ্জিত বললো, "ছোঁবেন না কবিরাজমশাই। আঙুলের ছাপ থাকতে পারে।"

টর্চের আলোয় ধনঞ্জয়ের চোখ দুটি একবার শুধু চকচক করে উঠলো। তারপর বললেন, "ক্ষমা করবেন। জানতুম না আপনাদের তদন্তের অসুবিধে করে ফেলেছিলুম আর একটু হলেই। কিন্তু আমি কবিরাজ, আমার কর্তব্য এখুনি পরীক্ষা করে দেখা প্রাণ আছে কিনা। নাড়ি দেখতে পারি কি?"

রঞ্জিত উত্তর দিলো না। শুধু মাথা হেলিয়ে টর্চ জ্বালিয়ে রইলো। ধনঞ্জয় নাড়ি পরীক্ষা করলেন। বেশিক্ষণ লাগলো না পরীক্ষা করতে। অল্প পরেই উঠে দাঁড়িয়ে শুধু মাথা নাড়ালেন। দেহে যে প্রাণ নেই সে-কথা স্পষ্ট করে বলতে হোলো না।

"কতক্ষণ আগে মৃত্যু হয়েছে বলে মনে হয়?" রঞ্জিত প্রশ্ন করলো।

"সঠিকভাবে বলা কঠিন," ধনঞ্জয় উত্তর দিলেন। "আধঘণ্টা থেকে পঁয়তাল্লিশ মিনিট আগে হয়েছে, মোটামুটি এই রকমই বলা যায়।"

রঞ্জিত তার হাত-ঘড়িটা দেখলো। সাড়ে আটটা বাজে' বললো, "তা হলে আটটা থেকে পৌনে আটটার মধ্যে হয়েছে। মাধববাবুর বাড়িতে আমি এসেছিলুম ঠিক সাড়ে সাতটায় কবিরাজমশায়ের বাড়িতে যাই প্রায় আটটায়। এই সময়টুকুর মধ্যেই খুন হয়েছে।" বলে সবাইকার মুখের দিকে সে চাইলো। মাধব, যে এতো কথা বলে, এই অপ্রত্যাশিত ঘটনায় সে-ও নির্বাক। ধনঞ্জয়ের দাড়ি গোঁফভরা মুখে কোনো রকম অভিব্যক্তি নেই। শুধু সঞ্জীব যেন কী রকম উদ্‌ভ্রান্ত হয়ে পড়েছে।

তার মুখের দিকে খানিক চেয়ে রঞ্জিত বললো, "আপনিই প্রথম আবিষ্কার করেছিলেন, না?"

কী রকম যেন অদ্ভুত শোনালো রঞ্জিতের গলা!

সঞ্জীব বললো, "হ্যাঁ।"

"তখন কটা বাজে বলতে পারেন ?"

"না। তবে বাড়ি থেকে বেরিয়েই আমি এখানে আসি।"

"আমরা বেরুবার কতক্ষণ পরে আপনি বাড়ি থেকে বেরিয়েছিলেন ?"

"প্রায় সঙ্গে-সঙ্গেই।"

"আপনাদের বাড়ি থেকে এখানে আসতে মিনিট দুয়েক লাগে। আটটার কিছু আগে আমরা আপনাদের বাড়ি থেকে বেরিয়েছিলুম। প্রায় সঙ্গে-সঙ্গেই আপনিও বেরিয়েছিলেন। এখানে তা হলে মোটামুটি আটটার মধ্যেই আপনি পৌঁছন!" বলে উত্তরের কোনো অপেক্ষা না রেখে পকেট থেকে নোটবই আব পেনসিল বার করে রঞ্জিত কী সব খসখস করে লিখে নিলো। মাধবের মুখ উত্তেজনা ও ভয়ে সাদা হয়ে গেছে। গলার কাছটা আঠা-আঠা। তবু কোনো রকমে সে বললো, "রঞ্জিতবাবু, রঞ্জিতবাবু···।"

নোটবই বন্ধ করে পকেটে রাখতে-রাখতে রঞ্জিত হেসে বললো, "কিছু ভাববেন না মশাই। আমাকে ভালো করে রিপোর্ট লিখতে হবে। সময়টা সঠিকভাবে জানানো দরকার। তাই এই সব প্রশ্ন করতে হোলো। সঞ্জীববাবু, আপনি চট করে গিয়ে মোড়ের পাহারাওলাকে ডেকে আনুন। এখুনি সমস্ত ব্যবস্থা ঠিক করে ফেলতে হবে।"

সঞ্জীব চলে গেলো।

রঞ্জিত উবু হয়ে বসে টর্চটা ধনঞ্জয়ের হাতে দিয়ে ভালো করে পরীক্ষা করতে লাগলো। ছুরিটা অদ্ভুত ধাঁচের। কোনো হাতল নেই। যেখানটা বেরিয়ে রয়েছে সেটা ধারালো না হলেও ছুঁচলো। ফলার সমস্তটাই প্রায় বিঁধে গেছে। এই ছুঁচলো দিকটা ধরে হত্যাকারী যদি বিঁধিয়ে থাকে তা হলে নিশ্চয়ই সেখানে তার আঙুলের ছাপ থাকবে। পকেট থেকে রুমাল বার করে সাবধানে ছুরিটা সে টেনে বার করলো। তারপর, পরে ভালো করে পরীক্ষা করার জন্যে, রুমালে মুড়ে রেখে দিলো পকেটে।

ধনঞ্জয় বললেন, "খুব জোরেই ছুরিটা বসাতে হয়েছে। ওই ছুঁচলো হাতল ধরে অত জোরে বসানো সম্ভব কী করে সে-টা ভাববার বিষয়। রঞ্জিতবাবু, এই ব্যাপারটা লক্ষ্য করা দরকার বলে মনে করি।"

"নিশ্চয়ই।" উত্তর দিলো রঞ্জিত। তারপর ফিরে দেখলো পাহারাওয়ালা এসেছে। পিছনে সঞ্জীব।

পাহারাওলাকে দাঁড় করিয়ে রঞ্জিত চটপট মৃতব্যক্তির পকেট-গুলো পরীক্ষা করে নিলো। রুমাল, সিগারেট কেস, দেশলাই, মনিব্যাগ আর একটা খাম। খামটা টর্চের আলোয় তুলে ধরে সে দেখলো সাধারণ বালি কাগজের তৈরি। উপরে টাইপ করা রয়েছে: রমেন মজুমদার। তারপর তার শ্যামবাজারের ঠিকানা। খামটা সে খুলে ফেললো। ভিতরে কোনো চিঠি নেই। শুধু লাল কালিতে লেখা রয়েছে: "তুই"।

চতুর্থ অধ্যায়

তিন নম্বরের চাক্তি

পরের দিন সকাল হতে-না-হতেই কলকাতার সমস্ত ছোটো-বড় কাগজে বড়বড় হরফে শঙ্কর মিত্র স্ট্রিটের হত্যাকাণ্ডের কথা ছাপা হয়ে গেলো। জয়কৃষ্ণ সামন্তর মৃত্যুব পর এতোটা হৈ-চৈ হয়নি। তার মৃত্যুকে 'রহস্যজনক' আখ্যা দিয়েই কাগজওলারা শান্ত ছিলো। কিন্তু রমেন মজুমদারেব মৃত্যুর পব কোনো এক উৎসাহী সংবাদদাতা রাতারাতি অনেক সব তথ্য সংগ্রহ করে ফেলে-ছিলো। জয়কৃষ্ণ'র মৃত্যু যে রহস্যজনক আত্মহত্যা নয় এ-কথা সবাই জানলো রমেন মজুমদাবের মৃত্যুতে। আর হত্যাকারী যে বিভিন্ন নয় সে-বিষয়েও কাগজওলারা নিঃসন্দেহ হয়েছে ওই শাদা চাক্তির ব্যাপারে।

সকালবেলায় আজ রোদ উঠেছে। গত কয়েক দিনকার ঝুপঝুপে বৃষ্টিব ভূতুড়ে আবহাওয়ার চিহ্নমাত্র কোথাও লেগে নেই। রাতারাতি যেন অদ্ভুত একটা ম্যাজিক হয়ে গেছে! কালো-কালো মেঘগুলো একেবাবে নিশ্চিহ্ন। কয়েকদিন ধরে ক্রমাগত বৃষ্টি পড়ার পর বাতাস থেকে ধূলোর কণা একেবারে ধুয়ে গেছে। আজ সকালের কলকাতার আকাশ হঠাৎ যেন নীল হেসে সবাইকে অভিনন্দন জানাচ্ছে। বাংলাদেশে বর্ষাকালে এ-

রকম আচমকা খাপছাড়া দিন মাঝেমাঝে দেখা দেয়। সকালের এই আকাশ আর সোনার মতো এই রোদ মন থেকে সব রকম কালো ছায়া নিয়ে যায় উড়িয়ে।

অনেক আগেই খবরের কাগজ পড়া শেষ করেছিলেন ধনঞ্জয়। তারপর মাধব সেটা অধিকার করেছে। উত্তেজিত মুখ-চোখ নিয়ে মাধব সমস্ত কাগজটা যেন গিলে খাচ্ছে। ধনঞ্জয় তার পড়ায় কোনো রকম বাধা না দিয়ে অতি ধীরে ও শান্তভাবে ঘরের সমস্ত জানালা-দরজাগুলো একে একে খুলে দিলেন। বাইরের নীল আকাশ আর সোনালি রোদের ঔজ্জ্বল্যে সমস্ত ঘরটা যেন এক মুহূর্তের মধ্যে হেসে উঠলো

জানালা-দরজা খুলে ধনঞ্জয় আবার এসে নিজের জায়গায় বসলেন। ততক্ষণে খবরের কাগজের শেষ লাইনটাও মাধবের খুঁটিয়ে পড়া হয়ে গেছে। উত্তেজিতভাবে মুখ তুলে সে যেন কী বলতে গেলো।

তাকে বাধা দিয়ে উঠলেন ধনঞ্জয়। "বাইরে একবার চেয়ে দেখুন মাধববাবু! চমকে উঠবেন না, পুলিশের লোক আমাদের ধরতে আসেনি! আমি এই আশ্চর্য সকালবেলার কথা বলছিলুম। এই শান্ত নীল রঙের আকাশের দিকে চেয়ে কি মনে হয় মাত্র কয়েক ঘণ্টা আগে আমাদেরই কাছাকাছি জায়গায় একটা বীভৎস হত্যাকাণ্ড ঘটে গেছে?"

"কী জানি কবিরাজমশাই! গত রাত্রের ব্যাপারটা এখনো

ঠিকমতো বিশ্বাস করতেই পারছি না। দুঃস্বপ্ন বলে মনে হচ্ছে। রাতে আমার তো ঘুম হয়নি, ছেলেটাও ঘুমোয়নি।”

“ঘুমোয়নি?” একটু বিস্মিত হয়েই প্রশ্ন করলেন ধনঞ্জয়।

“একেবারেই না। সমস্ত রাত ধরে সে পায়চারি করেছে। রমেনকে সে চিনতো। শ্যামবাজারে তার একটা বই-এর দোকান ছিলো। সেখান থেকেই সে নিজের সমস্ত বই কিনতো। সবাইকে কিনতেও বলতো।”

“সঞ্জীবের মুখে তাঁর কথা অনেকবার শুনে আমিও রমেনবাবুর দোকানে কয়েকবার গিয়েছি।” বলতে-বলতে ধনঞ্জয়ের প্রশান্ত মুখে বেদনার কালো ছায়া যেন নেমে এলো। “আমার সঙ্গেও অল্পবিস্তর আলাপ ছিলো রমেনবাবুর। চমৎকার ছোট্ট দোকান। যে-বই দোকানে থাকতো না সমস্ত কলকাতা ঘুরে সে-বই তিনি জোগাড় করে এনে দিতেন। কী অদ্ভুত উৎসাহ তাঁর ছিলো! কে জানতো হঠাৎ এভাবে অপঘাতে তিনি মারা যাবেন।”

“কিন্তু সমস্ত ব্যাপারটা আপনার কী মনে হয়?” মাধব অসহিষ্ণু হয়েই প্রশ্ন করলো।

“দেখুন মাধববাবু,” গলার কাছটা পরিষ্কার করে ধনঞ্জয় বললেন, “সমস্ত ঘটনাটা এতোই আকস্মিক আর অদ্ভুত যে মনে অনেক কিছুই হয়। আমার তো মনে হয় খবরের কাগজগুলো যত আবোল-তাবোলই বকুক না কেন, একটা জিনিস তারা ঠিক ধরেছে। সেটা ওই শাদা চাক্তি এবং সেই চাক্তির ওপর লাল

কালিতে লেখা 'এক' আর 'ছুই' সংখ্যাগুলো। ওগুলোর বিষয় একটু মন দিয়ে ভাবুন। জয়কৃষ্ণ'র মৃতদেহ যখন পাওয়া গেলো তখন সেই ঘরেই আলোর সুইচে টাঙানো ছিলো একটা শাদা চাক্তি। তাতে লেখা ছিলো 'এক'। তারপর মারা গেলেন রমেন মজুমদার। তাঁর পকেটেও পাওয়া গেলো ওই শাদা চাক্তি। তাতে লেখা 'ছুই'। এর থেকে মনে হয় এই ছুটি হত্যাকাণ্ডের পেছনে রয়েছে হয় কোনো বিশেষ একটি দল, নয় কোনো বিশেষ একটি মানুষ। যে-ই থাকুক সে যাকে মারতে চায় প্রথমে ডাকে তার কাছে পাঠায় ওই একটি শাদা চাক্তি। দেখে-শুনে মনে হচ্ছে তার কাছে একটা লম্বা ফর্দ আছে। সেই ফর্দ মিলিয়ে এক-ছুই করে সে লোকদের কাছে প্রথমে শাদা চাক্তি পাঠাচ্ছে। তারপর করছে তাদের হত্যা!"

উত্তেজিত হয়ে মাধব প্রশ্ন করলো, "আপনি কি মনে করেন সেই খুনে লোকটাব ফর্দটা বেশ লম্বা? মানে এ-ভাবে আবো অনেক লোক সে মারবে?"

প্রশ্ন শুনে ধনঞ্জয় আবো গম্ভীর হয়ে গেলেন। তিনি যখন গম্ভীর হন তখন একটিও বেফাঁস বাজে কথা বলেন না। প্রত্যেকটি কথাই খুব ধীরে-ধীবে, যেন ওজন করে, বলেন। "আমার তো তাই মনে হয়। অনেকগুলি নাম ফর্দতে না থাকলে সেই হত্যা-কারী কখনো মাত্র ছু-জনকে হত্যা কবার জন্যে এই রকম শাদা চাক্তি আর তার ওপর লাল সংখ্যাগুলো লিখতো না।"

"কী ভয়ানক! কী সর্বনাশ—"বলতে-বলতে মাধবের গলা যেন বুজে গেলো।

ধনঞ্জয় বলে চললেন, "এই হত্যাকারী যেই হোক, সাধারণ মোটেই নয়—"

তিনি আরো কী যেন বলতে যাচ্ছিলেন। কিন্তু খোলা দরজা দিয়ে পুলিশ ইন্সপেক্টর রঞ্জিত ঘরে ঢোকায় থামলেন। রঞ্জিতকে দেখে মাধবের উত্তেজনা আরো বেড়ে গেলো। কিন্তু ধনঞ্জয়ের বিশেষ কোনো ভাব-পবিবর্তন বোঝা গেলো না। একটু হেসেই তিনি বললেন, "আসুন আসুন, রঞ্জিতবাবু। আপনাকেই আশা কবছিলুম! একটু চা চড়িয়ে দি, কী বলেন?"

সামান্য অপ্রস্তুত হেসে বঞ্জিত বললো, "আমাব সৌভাগ্য! তবু কেউ আমাকে দেখে অভ্যর্থনা করেন। এমনি চাকরি কবি যে মানুষের সঙ্গে দু'দণ্ড মন খুলে যে গল্প কববো কিংবা আলাপ-আলোচনা করবো তাব উপায় নেই। আমাকে দেখলেই লোকে কেমন যেন তটস্থ হয়ে যায়। সবাই ভাবে বুঝি তাদেব ধরবার জন্যেই সব সময় আমি ষড়যন্ত্র করছি!"

"সে দোষ আপনার নয়, আপনার ওই বেশভূষার। আপনি যদি ওই খাকি কোর্তা ছেড়ে ধুতি-পাঞ্জাবি পবেআসতেন তা হলে আপনাকে আমাদেরই একজন বলে ভাবতে কষ্ট হোতো না।"

বলে ধনঞ্জয় পাশের ঘরের ইলেকট্রিক স্টোভে চায়ের জল চড়িয়ে এলেন।

"রমেন মজুমদারকে আপনি হয়তো চিনতেন, তাই তাঁর সম্বন্ধে কিছু খবর নিতে এলুম," রঞ্জিত বললো।

ধনঞ্জয় বললেন, "তাঁর সম্বন্ধে এমন কোনো বিশেষ খবর জানি না যা আপনাকে জানাতে পারি। তিনি বিশিষ্ট একটি ভদ্রলোক, শ্যামবাজারে বই-এর দোকান আছে, সঞ্জীবের কাছে শুনেছি এ-পাড়ায় তাঁর বুড়ি দিদিমা থাকেন, প্রত্যেক শুক্রবার নিয়ম করে তাঁর খবর নিতে তিনি আসেন। কবিরাজি ওষুধ সম্বন্ধে তাঁর বিশেষ আস্থা ছিলো না। আমাকে বারবার বলতেন কবিরাজি ছেড়ে হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা করতে এবং হোমিও-প্যাথি চিকিৎসার একটি ভালো বই ছোটো করে লিখে দিতে—কারণ সে-বই-এর বাজার নাকি খুব ভালো। তাঁর সম্বন্ধে হয়তো কোনো দরকারী খবর মাধববাবুর ছেলে সঞ্জীবের কাছে পাবেন। সঞ্জীব তাঁকে অনেক দিন ধরে চিনতো।"

"সঞ্জীববাবু যে তাঁকে অনেক দিন ধরে চিনতেন সে-খবর আমি পেয়েছি," গম্ভীর সুরেই বললো রঞ্জিত।

তার কথা শুনে মাধবের মুখটা কেমন যেন ফ্যাকাশে ঠেকলো। কিন্তু ধনঞ্জয়ের কোনো ভাব-পরিবর্তন হোলো না।

শান্ত গলায় তিনি আবার কথা বলতে শুরু করলেন, "আপনি আসার আগে মাধববাবুর সঙ্গে এই অদ্ভুত হত্যাকাণ্ড নিয়েই আলোচনা চলছিলো। আপনার কি মনে হয় না এই দুই হত্যা-কাণ্ডের পেছনে রয়েছে একটি মানুষ কিংবা বিশেষ একটি দল?"

"মনে তো তাই হয়, কাগজেও তাই লিখছে দেখছি।"

"কাগজে কিন্তু এই ব্যাপারে বিশেষ কিছু ভুল লিখেছে বলে মনে হয় না। আমার আরো মনে হচ্ছে হত্যাকারী যে-ই হোক নেহাৎ বাজে সাধারণ খুনে সে নয়। বিরাট একটা ষড়যন্ত্র সে করেছে। সেই ষড়যন্ত্রকে সফল করার জন্যেই একটির পর একটি হত্যাকাণ্ড সে চালাবে।"

"আরো চালাবে?"

"অন্তত আমার তো তাই মনে হয়। এবং এমন নিখুঁত-ভাবে চালাবে যাকে বাধা দেওয়া খুব কঠিন। কারণ সে তো জানেই দ্বিতীয় হত্যাকাণ্ডের পর তার শাদা চাক্তির ব্যাপারটা পুলিশে নিশ্চয়ই ধরতে পারবে। আর আগের দুটি ঘটনা থেকে তো মনে হয় যাকে সে হত্যা করতে চায় তাকে আগে থেকেই সে পাঠায় একটি শাদা চাক্তি সংখ্যা বসিয়ে। তাই এ-কথা ভাবা খুব অন্যায় নয় যে ভবিষ্যতে যাকে সে হত্যা করতে চাইবে তাকেও সে পাঠাবে একটি শাদা চাক্তি। চাক্তির ওপর লেখা থাকবে 'তিন'। অন্তত সমস্ত ঘটনার কথা ভালো করে ভেবে দেখলে এই সম্ভাবনার কথাই মনে হচ্ছে। অবশ্য আপনারা পুলিশের লোক, এই নিয়েই আপনারা ভেবে থাকেন—আমার মতো সাধারণ মানুষের চেয়ে আপনারা যে অনেক ভালো বুঝবেন সে-বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই।"

বঙ্কিত গম্ভীর হয়ে বললো, "পুলিশ যে সব সময় ঠিক-ঠিক

ভাবে সে-কথা আমি মনে করি না। তারা নিতান্তই ছক-কাটা রাস্তায় চলে। কিন্তু বহু মানুষ সম্বন্ধে আপনার অভিজ্ঞতার কথা সবাই জানে। আপনার এ-বিষয়ের ধারণা তাই অনেক বেশি আমাদের সাহায্য করবে। সত্যি কথা বলতে কি ওই চাক্তি নিয়ে আমরা অনেক ভেবেছি, কিন্তু তিন নম্বরের চাক্তি যে কেউ পেতে পারে এবং তাকে যে হত্যা করার চেষ্টা হতে পারে সে-কথা আমার একবারও মনে হয়নি! অবশ্য এ-ধরনের ব্যাপার যে ঘটবেই সে-কথা আমি কিন্তু জোর করে বলতে পারি না। তবে আপনার কথার এ-টুকু নিশ্চয়ই মেনে নোবো যে এ-ধরনের একটা সম্ভাবনা খুবই আছে।"

ধনঞ্জয় মন দিয়ে বঙ্কিতের কথা শুনেছিলেন, কথা শেষ হলে নিঃশব্দে পাশের ঘরে উঠে গিয়ে তিন পেয়ালা চা তৈরি করে আনলেন।

মাধব চায়ের পেয়ালায় এক চুমুক দিয়ে খানিকটা যেন বল পেলো। গলা ঝেড়ে সে বললো, "কবিরাজমশাই-এর ওই তিন নম্বর চাক্তির কথাটা যদি ঠিক হয় তা হলে মানতেই হবে হত্যাকারী দারুণ একটা বেপরোয়া লোক। কাউকে সে মানে না। কারণ সে তো নিশ্চয়ই জানে তিন নম্বরের চাক্তি কেউ পেলেই সোজা পুলিশের কাছে গিয়ে সে হাজির হবে আর পুলিশও তাকে বাঁচাবার কোনো রকম চেষ্টার ত্রুটি করবে না।"

"আর সে নিজের শক্তি সম্বন্ধে এতোই নিশ্চিত যে পুলিশও

তাকে বাধা দিতে পারবে বলে সে মনে করে না!" ধীরে-ধীরে ধনঞ্জয় বললেন। "অবশ্য এর সমস্তটাই আমাদের কল্পনা ছাড়া কিছুই নয়! —কিন্তু একটা ব্যাপার ঠিক বুঝতে পারছি না। মানলুম জয়কৃষ্ণে'র কোনো শত্রু থকতে পারে, চোরাই মাল কেনাবেচা নিয়ে তার সঙ্গে কারুর ঝগড়া হতে পারে এবং তার ফলে তাকে তার শত্রু হত্যা করেছে। কিন্তু রমেন মজুমদারের শত্রু কে? তাঁর মৃত্যুতে কার কী লাভ? যে-লোক জয়কৃষ্ণকে মারলো সে-ই কেন মারলো রমেন মজুমদারকে? জয়কৃষ্ণের সঙ্গে রমেনের কোনোরকম যোগাযোগ যে থাকতে পারে এ-কথা সহজে বিশ্বাস হয় না।"

"ঠিক তাই," চায়ের পেয়ালা নামিয়ে রঞ্জিত বললো, "কথাটা কাল রাত থেকেই আমার মাথায় ঘুরছে। অথচ ইতিমধ্যে যতই খবর নিচ্ছি ততই দেখছি জয়কৃষ্ণের সঙ্গে তাঁর কোনোরকম যোগাযোগই নেই। এমন কি তাঁরা যে পরস্পরকে চিনতেন এমন কথাও কেউ বলতে পারছে না।"

এমন সময় মাধবের দোকানের এক কর্মচারী সকালেরডাকে-আসা মাধবের চিঠিগুলো পৌঁছে দিয়ে গেলো: দুটো পোস্টকার্ড ও একটি খাম। খামটা বালির কাগজে তৈরি, ঠিকানাটা টাইপ-করা। সেটা ছিঁড়ে ফেলেই মড়ার মতো ফ্যাকাশে হয়ে গেলো মাধবের মুখ। ভিতরে কোনো চিঠি নেই। শুধু শাদা একটা গোল চাক্তি এবং তার উপর লাল কালিতে শুধু একটি সংখ্যা লেখা: "তিন"।

ঘরের ভিতর মুহূর্তের মধ্যে যেন বজ্রপাত হোলো। তার প্রচণ্ড শব্দে আর চোখ-ধাঁধানো আলোয় সবাই যেন অবশ হয়ে গেছে। কারুরই যেন আর একটি আঙুল নাড়াবারও শক্তি নেই।

পঞ্চম অধ্যায়

শিখের পুনরাবির্ভাব

ধনঞ্জয় কবিরাজের ঘরে মাধব যখন তিন নম্বর লেখা শাদা চাক্তি পেলো সঞ্জীব তখন মনসুন কাফেতে বসে চা খাচ্ছে। বড় একটা এখানে সে আসে না। বিশেষ করে আজ সকালে রেস্তরাঁতে আরাম করে বসে চা খাবার মতো মানসিক অবস্থা তার নয়। কারণ গতকাল রাত্রেই রমেন মজুমদারের মৃতদেহ সে আবিষ্কার করেছিলো আর রমেন ছিলেন তার অনেক দিনকার পরিচিত। বয়সের ব্যবধান থাকা সত্ত্বেও রমেন ছিলেন তার বন্ধুর মতো। কত দিন বই-এর খোঁজে রমেনের দোকানে গিয়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা নানা আলোচনায় কেটে গেছে। কারণ রমেন কেবলমাত্র বই-এর দোকানের মালিক ছিলেন না—লেখাপড়ায় ছিলো তার অদ্ভুত নেশা। নানা বিষয়ের নানা খোঁজ তিনি রাখতেন। তাই গতকালকের দুর্ঘটনার টাটকা স্মৃতি সঞ্জীবের মন থেকে তখনো মুছে যায়নি।

আজ সকাল হতে-না-হতেই রমেনের বাড়ি যাবার জন্যে সে বেরুচ্ছিলো। এমন সময় 'মনসুন কাফে'র মালিকের সঙ্গে মুখোমুখী দেখা। গতকালের দ্বিতীয় হত্যাকাণ্ড নিয়ে ইতিমধ্যেই পাড়ার সবাই অতিমাত্রায় বিচলিত। আর সেই মৃতদেহ যে প্রথম আবিষ্কার করেছে সঞ্জীব সে-খবরও সবাই জানে। তাই

সঞ্জীবকে দেখে মনসুন কাফের মালিক কিছুতেই ছাড়লো না। অনেক খবরই যে কাগজে ছাপা হয়নি এ-ধারণা তার বদ্ধমূল এবং অনেক গোপনীয় খবর যে সঞ্জীব আর তার বাবা জানে এ-বিষয়েও তার বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই। কারণ পুলিশ ইন্সপেক্টর রঞ্জিতকে একাধিকবার তাদের বাড়িতে যাতায়াত করতে দেখা গেছে।

তাই মনসুন কাফেব মালিক, পাড়াব সবাইকাব ফকিরদা, সঞ্জীবকে কিছুতেই ছাড়লো না। বললো, "চলো দাদা, গরিবেব দোকানে পদধূলি দিয়ে এক পেয়ালা চা খেয়ে নিয়ে গলা ভিজিয়ে কাজে যেও। কোনো ওজর আপত্তিই শুনবো না।"

সঞ্জীব কিছুতেই এড়িয়ে যেতে না পেরে এখানে এক পেযালা চা খেতে এসেছিলো। অনেক আগেই কোনো বকমে গবম চা সে গিলে ফেলেছে। কিন্তু পাড়ার কৌতূহলী বেকাব ছোকবাব দল তাকে ছাড়েনি। তাকে নানা প্রশ্নবাণে বিদ্ধস্ত কবে ফেলেছে এবং তার মুখ-থেকে-বেরুনো প্রত্যেকটি অক্ষবই যেন গিলে খাচ্ছে।

বিশেষ কোনো কথাই সঞ্জীব বলবে না ভেবেছিলো। কিন্তু একবাব বলতে আরম্ভ কবাব পব বুঝলো সে যতটা জানে অন্তত ততটা না শোনালে এদের হাত থেকে নিস্তার নেই। তাই নিস্তার পাবাব জন্যে একেবাবে প্রথম খুন থেকে সুরু করে গতকালকের ঘটনাব কথা আবার সে বললো। কোনো কথাই বাদ দিলো না। এমন কি জয়কৃষ্ণ সামন্ত'র মৃত্যুব আগেব দিন

যে এক অজ্ঞাতকুলশীল শিখ পরিতোষবাবুর কাছ থেকে চাবি নিয়ে গিয়েছিলো এবং সেই শিখকে যে তারপর আর কেউ আবিষ্কার করতে পারেনি—সে-খবরও সঞ্জীব বাদ দিলো না।

"আমার মনে হয় ঐ শিখের সঙ্গেই এই হত্যাকাণ্ডের রহস্য খুব ঘনিষ্ঠভাবে জড়িয়ে রয়েছে। তাকে যদি কোনো রকমে একবার আবিষ্কার করা যায় তা হ'লে অনেক কিছুই জানা যাবে বলে মনে করি।" বলে সঞ্জীব তার বক্তৃতা শেষ করলো। আর শেষ করে মনে হোলো সত্যিই তো—ঐ শিখকে নিয়ে কেউ মাথা ঘামাচ্ছে না কেন? পরিতোষবাবু তো স্পষ্টই বলেছিলেন জয়কৃষ্ণের মৃত্যুর আগের দিন অল্প সময়ের জন্যে ঐ শিখ এসে তাঁর কাছ থেকে অনন্দমোহনের বাড়ির চাবিটা নিয়ে গিয়েছিলো। অথচ আনন্দমোহন তো বিস্মিত হয়ে বলেছেন কোনো শিখকে তিনি তাঁর বাড়ির মেঝেয় পেটেন্ট স্টোন বসাবার কোনো রকম কন্ট্র্যাক্ট দেননি। ফলে সেই শিখই যে অল্প সময়ের জন্য চাবি নিয়ে চোরা-কুঠরির ইলেক্ট্রিক বাল্বের জায়গায় বিষাক্ত বোমা রেখে গিয়েছিলো এমন সন্দেহ করলে কিছুই অন্যায় সন্দেহ করা হয় না। তারপর জয়কৃষ্ণের মৃত্যুর দিন যে লোকটি পরিতোষকে বলেছিলো জয়কৃষ্ণ এলে চাবিটা দিয়ে দিতে সে-লোক যে অনন্দমোহন নয় সে-কথা আনন্দমোহন তো নিজেই বলেছেন। সে তবে কে? আগের দিনের সেই শিখ নয় তো?"

সঞ্জীবের কথা সবাই বাস্তবিক গিলছিলো। মনসুন কাফেতে

ইতিপূর্বে বহুবার বহু উত্তেজিত আলোচনা হয়ে গেছে। কিন্তু আজকের সকালের মতো সত্যিকারের রোমাঞ্চকর আলোচনা কখনই হয়নি। তাই সঞ্জীব চুপ করতে আর সবাই-ও কোনো কথা খুঁজে না পেয়ে চুপ করে রইলো। পাড়ার ফকিরদা শুধু ভাবতে লাগলো আর এক পেয়ালা গরম চা সঞ্জীবকে দিলে আরো অনেক গরম খবর বেরিয়ে আসবে কিনা।

এমন সময় মেধো গলা খাঁকারি দিয়ে অস্বাভাবিক জোরে বলে উঠলো, "সঞ্জীবদা, আমি একটা শিখকে দেখেছি।"

মেধো ওই এক ক্যাবলাকান্ত ছেলে। সকাল বেলায় খেলা দেখতে বেরিয়ে কোনো দিনও বিকেলের মধ্যে মাঠে সে ঢুকতে পারেনি। হরদম তার পকেট কাটা যাচ্ছে, দরকারি কাগজপত্র হারাচ্ছে, ভুল ট্রামে উঠে উল্টো দিকে চলেছে, বাসে উঠে দেখেছে পয়সা আনতে গেছে ভুলে। যতই কেন সবাই তাকে ঠাট্টা-তামাসা করুক কিছুতেই সে দমে না। সব কথায় বোকার মতো কথা বলা তার প্রধান বদ অভ্যেস। এতোক্ষণ সে যে কী করে চুপ করেছিলো সেটাই একটা হেঁয়ালী।

সঞ্জীব তাকে ভালো করেই চিনতো। তাই মৃদু হেসে উঠে দাঁড়িয়ে বললো, "ভারি আশ্চর্য তো! পাঁচটা নয় দশটা নয়—ঠিক একটা শিখকেই দেখেছিস!"

সবাই উঠলো হেসে। সঞ্জীব তাদের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে

রাস্তায় এলো তারপর দ্রুত পা চালিয়ে ট্রাম রাস্তায় এসে বাসের জন্যে লাগলো অপেক্ষা করতে।

বাস এসে পড়লো। চলন্ত গাড়ীতে সঞ্জীব উঠতে যাবে এমন সময় জামার পিছনে টান পড়ায় ফিরে দেখলো মেধো। বাঁ হাতটা মুখের মধ্যে পুরে অপ্রস্তুত-অপ্রস্তুত মুখ করে সে হাসছে।

হাড়-পিত্তি জ্বলে গেলো সঞ্জীবের। রুক্ষ স্বরে বললো, "কী ইয়ারকি হচ্ছে?"

ঘাবড়ে গিয়ে মেধো বললো, "দোহাই সঞ্জীবদা, রাগ কোরো না! ও রকম করে চেয়ো না। কাল আমি সত্যিকারের একজন শিখকে দেখেছি। সত্যি বলছি—দশটা নয়, পাঁচটা নয়—একটা শিখ।"

সঞ্জীব ভালো করেই জানে এই বোকা-হাবা ছেলেটার উপর রাগ করে কোনো লাভ নেই। তা ছাড়া বাসটাও চলে গেছে। পরেরটা আসতে কিছু দেরী হবে। তাই আর ধমক না দিয়ে বললো, "সে কথা তো বলেইছিস। আবার বলতে এলি কেনো?"

"না, মানে কাল সন্ধেবেলাতেই দেখেছি কিনা!"

"কাল সন্ধেবেলায়? কোথায়?"

"ঐ ছবিঘরের তলায় দাঁড়িয়েছিলুম। ভাবছিলুম বিষ্টি ধরে গেলেই বাড়ি যাবো। তা ছাড়া ফাস্ট কেলাস গান হচ্ছিলো কিনা আর আমি দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে ঘুগনি খাচ্ছিলুম কিনা—"

"কী খাচ্ছিলি?"

"মিথ্যে বলবো না সঞ্জীবদা! একটা ডিমসেদ্ধো আর দুপয়সার ঘুগনি খাচ্ছিলুম।"

"ডিম আর ঘুগনি খাচ্ছিলি আর চাঁদনি টকির তলায় দাঁড়িয়ে গান শুনছিলি—এই তো? যা, বাড়ি যা। আমাব বাস এসে গেছে। আমি চললুম।"

"কিন্তু শিখটার কথা তো শুনলে না? এমন সময় সেই লম্বা মতো শিখটা বেরিয়ে এলো। তাব লাল দাড়ি, তার মাথায় ইয়া বড় পাগড়ি, তাব গালে মস্ত বড় কাটা একটা দাগ। দেখলেই ভয় করে।"

"কোথা থেকে বেরিয়ে এলো?"

"কেন, যে-গলি থেকে খুন হয়েছে সেই গলি থেকে!"

"তাই নাকি?" দ্বিতীয় বাসটাও সঞ্জীব ছেড়ে দিয়ে প্রশ্ন করলো। "তাবপর? লোকটা কোথায় গেলো?"

"তা কি জানি! বেরিয়ে জোরে হেঁটে কোথায় মিলিয়ে গেলো। খানিক পরে তুমি গলির মধ্যে ঢুকলে। ঢুকেই তো বেরিয়ে এলে, তারপব ভোঁ দৌড় দিলে বাড়িব দিকে! আমি কি তোমাকে দেখিনি মনে করছো? আমি সব দেখেছি!" বলে অত্যন্ত মুরুব্বির মতো হাসতে গিয়ে হঠাৎ সঞ্জীবের চোখে তার চোখ পড়লো। পরক্ষণেই দারুণ ঘাবড়ে বললো, "দোহাই সঞ্জীবদা! অমন চোখ করে তাকিও না।"

"না, না তাকাবো না। কিন্তু কথাটা তুই পুলিশকে বলিসনি কেন?"

পুলিশের নামে মেধো প্রায় কেঁদে ফেললো। "আমার কী হবে গো সঞ্জীবদা! দোহাই তোমার, কিচ্ছুটি বোলো না। পুলিশকে বললেই আমাকে ধরে নিয়ে গিয়ে ফাঁসি দেবে।"

হেসে সঞ্জীব বললো, "এখন বাড়ি যা। আমি কাউকে বলবো না। তুইও এখন কাউকে যেন বলতে যাসনি।"

মেধোর মুখে আবার হাসি ফিরে এলো। জিব কেটে বললো, "ছিছি! কী যে বলো। আমি কি অতই বোকা?"

রমেন মজুমদারের জন্যে কাঁদবার কেউ নেই, সেই বুড়িদিদিমা ছাড়া। বুড়ির আবার ভিমরতি হয়েছে। সব কথা ভালো বোঝে না। নিজের মনেই বকবক করে, নিজের মনেই থাকে চুপ করে। এই বুড়িই রমেনকে মানুষ করেছিলো। কাজের জন্যে রমেনকে থাকতে হোতো শ্যামবাজারে,তার বই-এর দোকানের উপরের ঘরে। কিন্তু বুড়ি তার পৈতৃক ভিটে ছেড়ে নড়তে রাজি হয়নি। ফলে রমেন শ্যামবাজারে একলাই থাকতেন। মাঝেমাঝে সময় পেলেই আসতেন দিদিমার খবর নিতে, বিশেষ করে শুক্রবার সন্ধেতে আসা তিনি ভুলতেন না। ঐ দিন সন্ধের দিকে এক বুড়ো ভদ্র-লোক এসে দোকানে বসতেন, কেনাবেচা দেখতেন, হিসেব

লিখতেন। রমেন নিতেন ছুটি। ছুটি নিয়ে দিদিমার খোঁজ খবর করে যেতেন।

সেই বুড়ো ভদ্রলোকের নাম তিনকড়ি। সঞ্জীব যখন দোকানে পৌঁছলো তিনকড়িবাবু মুখ শুকনো করে তখনো দোকানে রয়েছেন। গতকাল অনেক রাত পর্যন্ত তিনি যে ঘুমোতে পারেননি মুখে-চোখে তার স্পষ্ট চিহ্ন।

সঞ্জীবকে তিনি চিনতেন। তাকে দেখে খানিকটা যেন আশ্বস্ত হলেন।

"কী কাণ্ড সঞ্জীব। আমি তো এখনো বিশ্বাস করতেই পারছি না রমেন খুন হয়েছে!"

সঞ্জীব কোনো উত্তর দিলো না। চুপ করে একটা চেয়ার টেনে বসলো।

"কাল রাতে আপনার ঘুম হয়নি—দেখেই মনে হচ্ছে।" খানিক বাদে, কিছু একটা বলতে হয় বলেই যেন সঞ্জীব বললো।

"ঘুম কি আর হয়? তিরিশ বছরের চেনা লোক—হঠাৎ খুন হয়ে গেলো! রাত দশটাতেও যখন সে ফিরলো না তখনই কেমন যেন মনে হচ্ছিলো। কী মনে হচ্ছিলো জানি না, তবে একটা কিছু দুর্ঘটনা ঘটেছে বলে কেমন অদ্ভুত একটা ভয়ে ভেতরে-ভেতরে কাঁপছিলুম। আর তারপরেই এলেন পুলিশ ইন্সপেক্টর রঞ্জিতবাবু। রমেন সম্বন্ধে যা জানি খুঁটিয়ে-খুঁটিয়ে বললুম। সব কথা তিনি লিখে নিলেন। আবার হয়তো আসবেন। তাই

সকাল থেকে বসে আছি। আর ভাবছি অমন মানুষটারো শত্রু থাকে যে তার বুকে বিনা দ্বিধায় বসাতে পারে ছোরা! এমন ঘটনাও দেখতে হোলো?” একটু চুপ করে থেকে মাথা নাড়িয়ে নিজের মনেই তিনকড়িবাবু আবার সুরু করলেন, “পুলিশে যাই মনে করুক, আমার কিন্তু বিশ্বাস কোনো শত্রু-টত্রুর কাজ নয়। কোনো গুণ্ডার কীর্তি। পকেটে তার প্রায় সত্তর টাকা ছিলো; তার লোভেই খুন করেছে।”

“কিন্তু জানলো কী করে?”

“টাকার কথা? জেনেছে কোনো রকমে। বই-এর দোকানের মালিক, ফেরবার সময় কিছু টাকা তো সঙ্গেই থাকে। সে-খবর জানা কিংবা অনুমান করা কি খুব শক্ত ব্যাপার?”

“মানলুম শক্ত নয়। কিন্তু টাকা-কটা না নিয়ে গেলো কেনো?”

“সে-খবরও গতকাল রাতে বঙ্কিতবাবুর কাছে শুনেছি: রমেনের পকেটে নোটের তাড়া যেমন ছিলো ঠিক তেমনিই পাওয়া গেছে। কিন্তু এটার জবাবও সহজ। হয়তো কারুর পায়ের আওয়াজ পেয়ে, হয়তো তোমারই পায়ের শব্দ পেয়ে গুণ্ডাটা পালিয়েছে—তুমিই যে খুন হবার পরে গলিতে প্রথম ঢুকেছিলে সে-খবরও বঙ্কিতবাবুর কাছে পেয়েছি।”

“এটাও মানলুম। কিন্তু ওই শাদা চাক্তি আর তার ওপর লাল কালিতে ‘দুই’ লেখা—এটার কারণ কী?”

তিনকড়িবাবু একটু নড়েচড়ে বসে বললেন, "ঠিক ওই খানটাতেই খটকা লাগছে। এর মানে কী?"

"আমারও কিন্তু এক ব্যাপারে খটকা লাগছে—এটা কোনো গুণ্ডার কীর্তি কিংবা শত্রুর কাণ্ড তা নিয়ে নয়—কারণ আমার দৃঢ় বিশ্বাস কোনো শত্রুরই এটা কাণ্ড। তবে আমার খটকা লাগছে রমেনবাবুর এমন শত্রু কে থাকতে পারে? এমন কোনো লোকের কোনো রকম আভাস ইঙ্গিত রমেনবাবুর কাছ থেকে আপনি আগে কখনো পেয়েছিলেন কি?"

মাথা নেড়ে তিনকড়িবাবু জানালেন না।

একটু চুপ করে থেকে সঞ্জীব প্রশ্ন করলো, "আচ্ছা তিনকড়িবাবু! জয়কৃষ্ণ সামন্তর কথা কখনো রমেনবাবুর মুখে শুনেছিলেন?"

"কাল রাত থেকেই সে-কথা ভাবছি। রঞ্জিতবাবুও ঠিক ঐ প্রশ্ন করেছিলেন। কিন্তু কিছুতেই তো মনে করতে পারলুম না! তা ছাড়া জয়কৃষ্ণের সঙ্গে রমেনের কোনো রকম সম্পর্ক যে থাকতে পারে সে-কথাও একেবারে বিশ্বাস হতে চায় না।"

সঞ্জীব আরো খানিক চুপ করে রইলো তারপর প্রশ্ন করলো, "এমন কোনো লোকের কথা মনে হয় কি রমেনবাবু যার নাম করতেন, যার সঙ্গে জয়কৃষ্ণ সামন্ত'র পরিচয় থাকা সম্ভব?"

তিনকড়িবাবু অনেকক্ষণ ভাবলেন। কিন্তু কোনো হদিসই করতে পারলেন না। শেষে বললেন, "নাঃ সঞ্জীব, বয়েস হয়েছে।

সব কথা ঠিক মনে পড়ে না। কিন্তু একজন লোকের নাম করতে পারি যাঁর কাছে রমেনবাবু পড়েছেন। বৃদ্ধ ভদ্রলোক—প্রায় সত্তর বছর বয়েস হবে, শ্রীরামপুরে থাকেন। আশ্চর্য তাঁর স্মরণ-শক্তি। এই বয়সেও পরিষ্কার তিনি বলে দিতে পারেন পঞ্চাশ বছর আগেকার অতি তুচ্ছ সব ঘটনার কথা। রমেনবাবুর কাছে তাঁর মাস্টারমশাই-এর অনেক গল্প শুনেছি। তাঁর কাছে গেলে হয়তো হদিস হতে পারে। অঘোরবাবু নাম।"

ঠিকানা সংগ্রহ করে শ্রীরামপুরে অঘোরবাবুর বাড়িতে যখন সঞ্জীব পৌঁছলো বেলা তখন একটা। স্নান হয়নি। একটা মিষ্টির দোকানে দাঁড়িয়ে যৎসামান্য আহার করে নিলো। আর যতই ভাবতে লাগলো সমস্ত ঘটনার কথা ততই একটা চাপা অস্বস্তিতে সমস্ত শরীর যেন ব্যথা করতে লাগলো।

ষষ্ঠ অধ্যায়

রমেনবাবুর মাস্টারমশাই

শ্রীরামপুরে অঘোরবাবুর বাড়িটি ছোট্ট। গুটি তিনেক ঘর, দোতলায় ছোটো একটি চিলে-কুঠরি। ভিতর দিকে খানিকটা জমি। সেই জমিতে তিনি শাক-সবজির গাছ লাগিয়েছেন। সমস্ত জীবন কেটেছে তাঁর ছাত্র পড়িয়ে। এখন বয়স বেড়েছে বলে ছাত্র আর পড়ান না। এই ছোটো বাগান নিয়েই থাকেন।

সঞ্জীব যখন পৌঁছলো সবে তখন তিনি বাগানের কাজ সেরে, স্নানাহার শেষ করে, ভিতর দিকের বারান্দায় ইজিচেয়ারে বসে গড়গড়ায় তামাক টানছিলেন।

মানুষটি ছোট্ট, একমাথা টাক, ঘাড়ের দিকের চুলগুলি ধব-ধবে শাদা। গায়ের রঙ তামাটে। শরীর শীর্ণই বলা যায়। সেই ছোট্টখাট্ট বৃদ্ধ মানুষটির চোখে কালো মোটা ফ্রেমের চশমাটা সবচেয়ে আগে নজরে পড়ে। সেই মোটা ফ্রেমের চশমার পুরু কাঁচের তলায় অঘোরবাবুর চোখ দুটিকে যেন অস্বাভাবিক রকম বড় দেখায়।

তাঁর ইজিচেয়ারের পাশের মোড়ায় বসে সঞ্জীব ধীরে-ধীরে তাঁকে রমেনের মৃত্যু-সংবাদ জানালো। গতকাল রাত্রের ঐ দুর্ঘটনার কথা আজকের সব কাগজেই ছাপা হয়েছে। কিন্তু অঘোরবাবু কাগজ পড়েন খাওয়া-দাওয়ার পর দুপুরবেলায়, তাই সঞ্জীবের কাছে শোনার আগে অঘোরবাবু এই দুর্ঘটনার খবর জানতেন না।

সমস্ত শুনে এই বৃদ্ধের চোখ সজল হয়ে উঠলো। অনেক-ক্ষণ কোনো কথা তিনি বলতে পারলেন না। বার দুই শুধু পুরু ফ্রেমের চশমাটা খুলে নিজের চোখ দুটি মুছলেন। রমেন তাঁর অতি প্রিয় ছাত্রদের মধ্যে একজন। ছেলেবেলা থেকেই তাঁকে জানতেন। এই বৃদ্ধ বয়সে হঠাৎ তাঁর মৃত্যুসংবাদ অঘোববাবুকে একেবারে অভিভূত করে ফেললো।

সঞ্জীব আরো খানিক চুপ কবে রইলো। তারপর বললো, "আমার দৃঢ় বিশ্বাস জয়কৃষ্ণ আর রমেনবাবুর হত্যাকারী একই লোক। আর রমেনবাবুর মৃত্যুতেই সেই হত্যাকাবী যে থামবে তা নয়, নিশ্চয়ই ভবিষ্যতে আরো অনেককেই হত্যা কবতে চেষ্টা কববে। ভবিষ্যতে ঠিক কার জীবন যে বিপন্ন সে-কথা আমরা এখনো জানি না বটে, তবে শিগগীরই যে জানতে পারবো তাতে সন্দেহ নেই। কাবণ এই হত্যাকারী বরাবরই দেখছি হত্যার ঠিক আগেই একটি খামে করে নম্বর লেখা শাদা চাক্তি পাঠায়। সেই শাদা চাক্তি পৌঁছবাব পর হত্যার কাজ সে চালায়। তিন নম্বরের শাদা চাক্তি যিনি পাবেন তখুনি নিশ্চয়ই তিনি সেই চাক্তিসমেত পুলিশের শবণাপন্ন হবেন। কিন্তু এই অদৃশ্য হত্যাকারী এতো চালাক আর তার বন্দোবস্ত এতো নিখুঁত যে এই ধরনের সম্ভাবনার কথা জানা সত্ত্বেও মোটেই সে ভয় পায় না। সে যেন নিঃশব্দে পুলিশকে এই লড়াইতে ডাকছে আর দেখিয়ে দিতে চাইছে তার ফর্দে যাদের নাম আছে

তাদের রক্ষা করতে পারে পৃথিবীতে এমন কোনো ক্ষমতাই নেই !”

“কিন্তু কে সেই অদ্ভুত হত্যকারী ?” ভাঙা-গলায় অঘোর-বাবু প্রশ্ন করলেন, “কেনই বা সে হত্যা কবতে চায় ? হঠাৎ সে পাগল হোলো নাকি ?”

উত্তরে সঞ্জীব বললো, “সেই হত্যাকাবী কোনো বিকৃত মস্তিষ্কের লোক কিনা এ-কথা আমিও বহুবার ভেবেছি । ক্ষেপে গিয়ে একটিব পর একটি লোককে খুন করে চলেছে এ-রকম পাগলের দৃষ্টান্তও অজানা নয়। কিন্তু যার মাথা একদিকে এতো সূক্ষ্ম হিসেব করে চলেছে তাবই মাথা আবার অন্যদিকে বিকৃত ভাবা কঠিন নয় কি ? যে পাগল সে-পাগলই ; সে খুন করতে চাইলে পাগলের মতোই খুন কবে চলবে—এমন হিসেব করে, প্ল্যান কবে খুন করতে যাবে কেন ? আব পাববেই বা কেন ? আমাব কথা হচ্ছে : যার মাথার ভেতব গোলমাল হয়ে গেছে—তাব সমস্ত কাজেব ভেতবেও সেই গোলমালের আভাস থাকবে। কিন্তু এক্ষেত্রে কোনো রকম গোলমালের আভাস দেখছিই না, ববঞ্চ চরম ধূর্ততাব উদাহবণ পাচ্ছি তার কাজের মধ্যে। জয়কৃষ্ণ'র হত্যাকাণ্ডের কথাটাই ধরুন না। তাকে মিথ্যে চিঠি দিয়ে ফাঁকা বাড়িতে টেনে আনা, শিখ সেজে সেই বাড়ির চোবা-কুঠরিতে বিষাক্ত বোমা বেখে আসা, টেলিফোনে জয়কৃষ্ণকে চাবি দেবার ব্যবস্থা করা—এ-সব কি কোনো পাগলের কাজ ?

ওই রকম কোনো অদ্ভুত বোমা বানানো কি বিকৃত মস্তিষ্কের পক্ষে সম্ভব? কখনই না।"

ভালো করে এইসব কথা ভাবলেন অঘোরবাবু, তারপর বললেন, "তোমার কথাই ঠিক বলে মনে হচ্ছে। এ কোনো বিকৃত মস্তিষ্কের পরিচয় নয়। বরঞ্চ ঠিক তার উল্টোটাই। কিন্তু কে সেই লোক?" শেষের প্রশ্নটি অঘোরবাবু সঞ্জীবকে করলেন না, অনেকটা যেন নিজেকেই নিজে প্রশ্ন করলেন।

সঞ্জীব বললো, "হত্যাকারী কে বলা এখন পর্যন্ত অসম্ভব। কিন্তু কেন সে হত্যা করছে সেটা ভালো করে ভাবা আগে দরকার। তার উদ্দেশ্যটা কী? যতই এই উদ্দেশ্যের কথা ভাবছি ততই সমস্ত ব্যাপারটা যেন গুলিয়ে যাচ্ছে। কারণ জয়কৃষ্ণকে যে হত্যা করেছে সেই একই লোক হত্যা করেছে রমেনবাবুকে। অথচ শোনা গেছে জয়কৃষ্ণ মোটেই সুবিধের লোক ছিলো না— চোরাইমাল কেনাবেচাই ছিলো তার ব্যবসা। অথচ রমেনবাবু বই ছাড়া জীবনে আর কিছু জানতেন না, চোরাইমালের ব্যবসা করার প্রশ্ন তো তাঁর ক্ষেত্রে উঠতেই পারে না। তাই আমার সবচেয়ে আশ্চর্য লাগছে যে-লোক জয়কৃষ্ণকে শত্রু মনে করে, সেই লোক কী করে রমেনবাবুকে মনে করে শত্রু? এই প্রশ্নের সমাধান করতেই এসেছি আপনার কাছে। আমার সঙ্গে রমেনবাবুর যতদিনকার পরিচয় তার মধ্যে একদিনও তাঁর মুখে জয়কৃষ্ণ'র নাম শুনিনি। অনেকের কাছে খবরও নিয়েছি। কিন্তু

কেউই বলতে পারলো না কোনো সূত্রে রমেনবাবুর মুখে জয়কৃষ্ণ'র নাম শোনা গেছে বলে। আপনি বহুকাল ধরে রমেনবাবুকে চেনেন। তাই ভাবলুম আপনার কাছে একবার খোঁজ নিয়ে যাই।"

ইজিচেয়ার ছেড়ে অঘোরবাবু বারান্দায় পায়চারি করতে সুরু করলেন। সঞ্জীব কোনো প্রশ্ন না করে চুপ করে বসে রইলো। এই বৃদ্ধ মানুষটি যে গভীর চিন্তায় আচ্ছন্ন হয়ে রয়েছেন স্পষ্টই সে-কথা বোঝা যায়।

বেশ খানিকক্ষণ অঘোরবাবু পায়চারি করলেন। শেষে একটু ক্লান্ত হয়েই ইজিচেয়ারে আবার আশ্রয় নিয়ে বললেন, "নাঃ, বুড়ো হচ্ছি, সব কথা ঠিক সময়ে মনে পড়ে না। কিন্তু রমেনের সব কথা তো মনে পড়া উচিত। সব সময়েই দেখেছি তাকে চোখের ওপর। জীবনে সে যখনই যা কিছু করতে গেছে সবচেয়ে আগে এসেছে আমার সঙ্গে পরামর্শ করতে। যখনি বিপদে পড়েছে তখনি আগে ছুটে এসেছে আমার কাছে—"

বাধা দিয়ে সঞ্জীব বললো, "বিপদে পড়েছেন? কী ধরনের বিপদ?"

হেসে অঘোরবাবু বললেন, "না-না, কোনো বিশেষ ধরনের বিপদ নয়! নিতান্ত সাধারণ সব বিপদ, বেঁচে থাকতে গেলেই গেরস্ত মানুষদের যে-সব বিপদ আসে—অসুখ-বিসুখ, টাকার অভাব, ব্যবসার ব্যাপার—এইসব আর কি।"

একটু হতাশ হয়েই সঞ্জীব বললো, "কোনো অসাধারণ ঘটনা রমেনবাবুর জীবনে কোনোদিন ঘটেনি ?"

মাথা নাড়তে-নাড়তে অঘোরবাবু উত্তর দিলেন, "না, কোনো অসাধারণ ঘটনাই নয়। এমন কি ফুটবল খেলতে গিয়ে হাত-পা ভাঙা বা সাইকেল চাপা পড়ার মতো ঘটনাও তার জীবনে কোনোদিন ঘটেনি। নিতান্ত সহজ, সরল জীবন। শুধু একবার —সে বহু বছর আগেকার কথা -একবার হঠাৎ তাকে এক মামলার ব্যাপারে জুরি হতে হয়েছিলো। এই জুরি হবার ব্যাপারটাকে যদি খানিকটা অসাধারণ বলো। তা জুরি তো যে-কোনো লোকই হতে পারে—পাটগুদামের মালিক থেকে, সরকারি চাকুরে থেকে, ইস্কুল মাস্টার থেকে, আলু-বেগুনের কারবারীর পর্যন্ত জুরি হতে কোনো রকম বাধা নেই।—কিন্তু রমেনের জীবন এমন সোজা সহজ পথে বয়ে গেছে যাতে এই জুরি হওয়াটাকেই খানিকটা অসাধারণ ঘটনা বলতে পারো। অনেক কাল আগেকার কথা -কিন্তু সমস্ত ঘটনাই আমার মনে আছে। কে যেন এক ডাক্তার ছিলো। সে নাকি তার কোন এক রোগী বন্ধুকে মেরে ফেলেছিলো। তারই বিচারের জুরি হয়েছিলো রমেন। আরও ছ'জন জুরি ছিলেন রমেন ছাড়া— তাইতো! দাঁড়াও—" বলতে-বলতে অঘোরবাবুর শান্ত মুখের মধ্যে হঠাৎ যেন বিদ্যুৎ খেলে গেলো। পেয়েছেন, এতোক্ষণে খুঁজে পেয়েছেন তিনি! অবাক বিস্ময়ে সঞ্জীব দেখতে লাগলো :

বৃদ্ধের কপালের শিরাগুলো উত্তেজনায় দপ-দপ করছে, মোটা কাঁচের চশমার পিছনে তাঁর চোখ দুটো যেন আরো বড়-বড় হয়ে উঠেছে। হঠাৎ তিনি যেন একেবারে অন্য মানুষ হয়ে গেছেন উৎসাহে, উত্তেজনায় তাঁর বয়স যেন অনেক কমে গেছে।

প্রায় আর্তনাদ করে উঠলেন অঘোরবাবু, "ঠিক কথা পেয়েছি সঞ্জীব, পেয়েছি। এতোক্ষণে মনে পড়েছে সব কথা। রমেন আর ছ'জন জুরি ছিলেন সেই মামলায়। তাঁদের নামগুলো অনেকবার রমেনের কাছে শুনছি— জয়কৃষ্ণ, অনাদি, হৃদয়রঞ্জন, বিশ্বনাথ, আসানুল্ল আর মাধব।"

এইবার উত্তেজিত হবার পালা সঞ্জীবের। মাধবও ছিলো ঐ জুরিদের মধ্যে একজন? তার বাবা মাধব! ধীরে-ধীরে তারও আবছা মনে পড়লো বহুকাল আগে রমেনের কাছে সে-ও যেন শুনেছিলো এই কথা—তিনি আর সঞ্জীবের বাবা এক মামলার ব্যাপারে নাকি জুরি ছিলেন। সেই থেকেই তাঁদের দুজনের পরিচয়। তারপর বহু বছর কেটে গেছে। দু'জনে গিয়েছেন দু'পথে। একজনের মনিহারি দোকান, আর একজনের দোকান বই-এর। মাধব আর রমেনের মধ্যে দেখাশুনো বড় একটা আর হয়নি। সঞ্জীব তাঁদের মধ্যে শুধু যোগসূত্র এতদিন বজায় রেখেছে।

কিন্তু বহুকাল আগে যে-মামলার সূত্রে একদিন এঁরা পরিচিত হয়েছিলেন সেই মামলার কথা কোনোদিনই সঞ্জীব জিগগেস করা প্রয়োজন মনে করেনি। এতোদিন পরে আজ সেই মামলার

ব্যাপারটাই সবচেয়ে প্রয়োজনীয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। কিন্তু এতোদিন পরে সে-কথা কি কারুর মনে থাকা সম্ভব ?

নিজের মনের সমস্ত উত্তেজনা দমন করে সঞ্জীব শুধু প্রশ্ন করলো, "কিন্তু মামলাটা কিসের ? কার বিরুদ্ধে মামলা ? আপনি কিছু জানেন নাকি ?"

ইজিচেয়ারে অঘোরবাবুর দেহ শিথিল হয়ে এসেছে। পুরু কাঁচের ওপাশে তার দুটি চোখ বোজা। তিনি মৃদু-মৃদু শুধু হাসছেন ! সঞ্জীবের মনে হোলো এই মুহূর্তে অঘোরবাবুর মনে আর কোনো চিন্তা নেই। বহুকাল আগেকার ঘটনার মধ্যে একেবারেই তিনি ডুবে গিয়েছেন।

সত্যিই তাই, সঞ্জীব ভুল করেনি। তার প্রশ্ন শুনে তিনি চোখ খুললেন না। ইজিচেয়ারে শরীর ঢেলে যেমন শুয়েছিলেন তেমনিই রইলেন। সঞ্জীব রুদ্ধ নিশ্বাসে অঘোরবাবুর কথা শুনে যেতে লাগলো।

"জানি না ?" অঘোরবাবু বলে চললেন, "নিশ্চয়ই জানি। কতবার রমেনের মুখে ঐ ঘটনার কথা শুনেছি, তা ছাড়া খবরের কাগজেও ব্যাপারটা নিয়ে তখন কম তোলপাড় হয়নি। দেখো, ঠিক বলে যেতে পারি কিনা :

"আসামীর নাম ছিলো মৃত্যুঞ্জয় পালিত। তিনি ছিলেন ডাক্তার। তাঁর এক বন্ধু ছিলেন, নাম সত্যেন রায়। সত্যেন ছিলেন মস্ত ধনী লোক। পাটের ব্যবসায় অনেক টাকা

করেছিলেন। মৃত্যুঞ্জয় আর সত্যেন ছিলেন ছেলেবেলার বন্ধু। মৃত্যুঞ্জয় গেলেন ডাক্তারিতে আর বি-এ পাস করে সত্যেন ঢুকলেন ব্যবসায়। দুজনেই খুব উন্নতি করলেন : একজন ডাক্তার হিসেবে আর একজন ব্যবসায়ী হিসেবে। বড় হবার পর অনেক ছেলেবেলার বন্ধুরা যেমন হারিয়ে যায়, পরস্পরের কাছ থেকে সরে যায় দূরে—তাঁদের মধ্যে কিন্তু সে-রকম কোনো ছাড়াছাড়িই হয়নি। বরঞ্চ বয়স বাড়ার সঙ্গে-সঙ্গেই তাদের বন্ধুত্ব যেন আরো গভীর হয়ে উঠেছিলো।

"মৃত্যুঞ্জয় সত্যেনের সব অসুখেই চিকিৎসা করতেন। নামী ডাক্তার হওয়া সত্ত্বেও সত্যেনের বাড়িতে প্রতিদিন তিনি অনেকটা করে সময় কাটাতে যে পারতেন তার কারণ শুধু পরস্পরের মধ্যে বন্ধুত্বই নয় : সত্যেন ছিলেন বরাবরই অত্যন্ত রুগ্ন গোছের। আজ এটা কাল সেটা তাঁর লেগেই আছে। নিজের অসুখে সত্যেন যেমন অন্য কোনো ডাক্তারের চিকিৎসায় থাকতে চাইতেন না, মৃত্যুঞ্জয়ও সে-রকম চাইতেন না অন্য কারুর হাতে সত্যেনের চিকিৎসার ভার দিতে।

"ঐ মামলার বিচার আরম্ভ হবার প্রায় বছর দেড়েক আগে সত্যেনকে একদিন ভালো করে পরীক্ষা করার পর মৃত্যুঞ্জয়ের মুখচোখ ভাবনায় কালো হয়ে উঠলো। তিনি বিচক্ষণ ডাক্তার, বুঝতে তাঁর দেরী হোলো না তাঁর বন্ধুর আসল অসুখটা আর কিছুই নয়, ক্যান্সার! অনেক দিন থেকেই এই ভয়ই তিনি

করছিলেন। কিন্তু এতোদিন কোনো স্পষ্ট প্রমাণ পাননি, সেইদিন পেলেন। এই ভয়ঙ্কর অসুখের কথা সত্যেনের কাছে তিনি গোপন করতে পারলেন না। তাঁকে জানাতে হোলো যে তাঁর অসুখ একেবারে সেরে যাবার সম্ভাবনা অত্যন্ত কম। তবে একটা অপারেশন করে দেখা যেতে পারে। কিন্তু অপারেশনের পর ঐ বিষাক্ত ঘা যে আবার হবে না এ-রকম কথা কেউ জোর করে বলতে পারে না।

"সমস্ত ঘটনা শুনে সত্যেন অপারেশন করাবেন বলেই ঠিক করলেন। হোলোও অপারেশন। কিন্তু মৃত্যুঞ্জয় যা ভয় করেছিলেন ঠিক তাই হোলো। কিছুদিন পরে আবার দেখা দিলো সেই মারাত্মক ঘা।

"সত্যেন নিজে কোনো লুকোচুবি পছন্দ করতেন না, তাই, ঐ রোগ আবার দেখা দেবার পর, মৃত্যুঞ্জয়কে সোজা তিনি প্রশ্ন করলেন তাঁর সারবার কোনো উপায় আছে কিনা আর যদি না থাকে তা হলে কতদিন তিনি বাঁচবেন বলে মৃত্যুঞ্জয় মনে করেন। ডাক্তার হয়ে রোগীকে তার জীবনের কোনো আশা নেই জানানো বড় সহজ কথা নয়, বিশেষ করে মৃত্যুঞ্জয়ের পক্ষে —কারণ রোগী তাঁর পরম বন্ধু। তবু কথাটা তিনি চেপে রাখতে পারলেন না। সত্যেনের বহু প্রশ্নের উত্তরে ধীরে-ধীরে সব কথাই তাঁকে প্রকাশ করতে হোলো। তিনি জানালেন এই অসুখের হাত থেকে সত্যেনের ভালো হয়ে ওঠবার কোনো রকম

সম্ভাবনাই নেই—তাঁর জীবনের শেষ দিন আসতে ছয় থেকে বড় জোর মাস দশেকে বাকী।

"এর পর থেকে মৃত্যুঞ্জয় নিজের প্র্যাকটিস ইচ্ছে করেই যেন কমিয়ে ফেললেন। অধিকাংশ সময় তাঁর কাটতো সত্যেনের বিছানার পাশে। সত্যেনের নিকট আত্মীয় বলতে গেলে কেউই ছিলো না। মৃত্যুঞ্জয় একাধারে বন্ধু, আত্মীয় এবং ডাক্তারের সব কাজ করে চললেন।

"কিন্তু মাসখানেক বাদেই দেখা গেলো সত্যেনের অসুখ যত তাড়াতাড়ি বাড়বে বলে মৃত্যুঞ্জয় মনে করেছিলেন তার চেয়ে অনেক বেশি তাড়াতাড়ি অসুখটা বাড়ছে। যন্ত্রণার হাত থেকে রোগীকে বাঁচানোর জন্যে মৃত্যুঞ্জয় ঘন-ঘন মর্ফিয়া দিতে লাগলেন। ফলে অধিকাংশ সময়েই সত্যেন থাকতেন অজ্ঞান হয়ে। মৃত্যুঞ্জয় নিজের কাজে প্রায় বেরুতেনই না। থাকতেন বিছানাব পাশে। অল্পক্ষণের জন্যে জ্ঞান হলে সত্যেন দেখতেন তাঁর ঘরে মৃত্যুঞ্জয় আর এক নার্স আছেন। তাঁদেব সঙ্গেই যা সামান্য কথাবার্তা বলতেন সত্যেন।

"আরো মাসখানেক পরে হোলো সত্যেনেব মৃত্যু। মৃত্যুর আগে যে- মর্ফিয়া ইনজেকসন দেওয়া হয়েছিলো তারপর আর তাঁর জ্ঞান হয়নি। মর্ফিয়ার আচ্ছন্ন অবস্থা থেকে ধীরে-ধীরে মৃত্যুর দেশে তিনি চলে গেলেন। সত্যেনের অতি দূর সম্পর্কের এক ভাই ছিলো, তার নাম রামপদ। সত্যেনের মৃত্যুব দিন

পনেরো আগে থেকে সে এসে ছিলো। সে ছাড়া সত্যেনের আর কোনো আত্মীয় ছিলো না। সত্যেনের মৃত্যুর পর মৃত্যুঞ্জয় রাম-পদকে ডেকে বললেন যে তিনি বাড়ি থেকে প্রয়োজনীয় 'ডেথ সার্টিফিকেট' লিখে আনতে যাচ্ছেন। কিন্তু বাড়ির কাছাকাছি পৌঁছবার পর অন্যমনস্ক হয়ে চলার জন্যে তিনি একটা গাড়ি চাপা পড়েন। অত্যন্ত বেকায়দায় পড়ার জন্যে খুব জখম হয়েছিলেন এবং সেইখানেই তাঁর জ্ঞান লোপ পায়। রাস্তার লোক ধরাধরি করে তাঁকে বাড়িতে দিয়ে যায়। নিজের বাড়িতে প্রায় দিন সাতেক তিনি অজ্ঞান হয়ে ছিলেন। তারপর যখন জ্ঞান হোলো মৃত্যুঞ্জয় দেখলেন তাঁর বাড়ি পুলিশের কবলে রয়েছে।

"সত্যেনের ভাই রামপদ মৃত্যুঞ্জয়ের অসুস্থতার খবর পেয়ে 'ডেথ সার্টিফিকেটে'র জন্যে অন্য এক ডাক্তার ডাকে। মৃতদেহ দেখে এবং অসুস্থতার সমস্ত বিবরণ শুনে সেই ডাক্তারের কেমন যেন সন্দেহ হয়। তিনি পুলিশে খবর দিয়ে সত্যেনের মৃতদেহকে মর্গে পাঠান এবং সেখানে 'পোস্ট মর্টেম' পরীক্ষার পর জানা যায় অতিরিক্ত পরিমাণ মর্ফিয়া ইনজেকসনের দরুন সত্যেনের মৃত্যু হয়েছে। ডাক্তাররা জানালেন সত্যেন অন্তত আরো বছর খানেক বাঁচতে পারতেন। ফলে খুনীর আসামী হিসেবে মৃত্যুঞ্জয়কে ধরবার জন্যে সঙ্গে-সঙ্গে পুলিশের লোক তাঁর বাড়ি ছোটে।

"এদিকে সত্যেনের উইলে দেখা যায় তিনি তাঁর সমস্ত সম্পত্তি

মৃত্যুঞ্জয়কে দিয়ে গেছেন। মৃত্যুর মাস খানেক আগে সেই উইল তৈরি হয়েছিলো।

"মৃত্যুঞ্জয়ের বিরুদ্ধে নর-হত্যাব মামলা রুজু হোলো। সরকার পক্ষের উকিল বললেন মৃত্যুঞ্জয় সত্যেনের উইলেব কথা জানতেন। ফলে সত্যেন সজ্ঞানে থাকলে পাছে নিজের মত বদলে সমস্ত সম্পত্তি অন্য কাউকে দিয়ে দেন এই ভয়েই মৃত্যুঞ্জয় তাঁকে ক্রমাগত মর্ফিয়া দিযা আচ্ছন্ন কবে রাখতেন এবং তাড়াতাড়ি সম্পত্তি পাবাব জন্যে শেষটায় অতিরিক্ত পরিমাণ মর্ফিয়া ইনজেক্ট করে তিনি সত্যেনকে হত্যা কবেন।

"কিন্তু মৃত্যুঞ্জয়েব উবিল জানালেন অন্য কথা। তিনি বললেন মৃত্যুঞ্জয় যে অতিবিক্ত মর্ফিয়া দিয়ে সত্যেনের মৃত্যু ঘটিয়েছেন তাতে কোনো ভুল নেই। কিন্তু ঐ পরিমাণ মর্ফিয়া দেওয়া হয়েছিলো সত্যেনের আদেশে এবং ইচ্ছেয়। ইতিমধ্যেই সত্যেন অসহ্য যন্ত্রণা ভোগ করেছিলেন এবং তাঁর দেহে অস্ত্রোপচার করাও হয়েছিলো। আব যন্ত্রণা ভোগ করতে তিনি একেবারেই রাজী ছিলেন না। তাই মৃত্যুঞ্জযের মুখে তাঁব জীবনেব আর কোনো রকম আশা নেই শোনার পর থেকে সত্যেন বারবার তাঁর বন্ধুকে অনুরোধ জানান ঐ মর্মান্তিক যন্ত্রণার হাত থেকে তাঁকে বাঁচাতে, মর্ফিয়া দিয়ে তাঁকে চিরকালের মতো ঘুম পাড়িয়ে দিতে। সত্যেন বাববাব বলতেন তাঁর মৃত্যু হলে কারুরই কোনো ক্ষতি নেই—কারণ আত্মীয়-স্বজন বলতে কে

নেই তাঁর। মৃত্যুঞ্জয় প্রথমে তাঁর বন্ধুর কথায় কানই দেননি। কিন্তু শেষে সত্যেন একদিন জানালেন মৃত্যুঞ্জয় তাঁকে মর্ফিয়া দিতে রাজী না হলে যেমন করে হোক অন্য উপায়ে আত্মহত্যা তিনি করবেনই। মৃত্যুঞ্জয় অনেক ভাবলেন। তিনি নিজে অত্যন্ত বিচক্ষণ ডাক্তার। হিসেব করে দেখলেন সত্যেনের কথাই ঠিক—তাঁর তো বাঁচবার কোনো আশাই নেই, বরঞ্চ যে ক'মাস বেঁচে থাকবেন সে-ক'মাসই ভুগতে হবে অসহ্য যন্ত্রণায়। মৃত্যুঞ্জয় তাই ক্রমশ মর্ফিয়ার পরিমাণ লাগলেন বাড়াতে। শেষবার সত্যেনের জ্ঞান হবার পর, দু' বন্ধুতে খানিক কথাবার্তা কইলেন। অবশেষে পরস্পরের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে মৃত্যুঞ্জয় দিলেন শেষ মর্ফিয়া ইনজেকসন। ঐ ইনজেকসনের ফলেই হোলো সত্যেনের মৃত্যু। মৃত্যুঞ্জয়ের উকিল জানালেন সত্যেন যে উইল করে সমস্ত সম্পত্তি মৃত্যুঞ্জয়কে দিয়ে গিয়েছেন এ-খবর ঘুণাক্ষরেও তিনি জানতেন না। এমন কি সত্যেনের কোনো উইল আছে কিনা সে-খবর জানতেও কোনোদিন তিনি চেষ্টা করেননি।

"মৃত্যুঞ্জয়ের মামলা নিয়ে চারদিকে সে-সময় দারুণ চাঞ্চল্য দেখা গিয়েছিলো। অধিকাংশ লোকই বলেছিলো মৃত্যুঞ্জয় ঠিক কাজই করেছেন, তাঁর মুক্তি পাওয়াই উচিত। কিন্তু ঐ মামলার জুরি মৃত্যুঞ্জয়কে অপরাধী সাব্যস্ত করলেন এবং জানালেন নরহত্যার জন্যে তাঁর ফাঁসি হওয়া উচিত। আপিলে অবশ্য ফাঁসির বদলে তাঁর যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের আদেশ হোলো।"

এতোক্ষণ একটানা কথা বলে অঘোরবাবু থামলেন। মন্ত্র-মুগ্ধের মতো শুনছিলো সঞ্জীব। এবার সে প্রশ্ন করলো, "কিন্তু তারপর কী হোলো মৃত্যুঞ্জয় ডাক্তারের ? তিনি কি এখনো বেঁচে আছেন ? নাকি জেলে রয়েছেন ?"

অঘোরবাবু মাথা নাড়তে লাগলেন ধীরে-ধীরে। বললেন, "না সঞ্জীব, মৃত্যুঞ্জয় আর বেঁচে নেই। রমেনের কাছে এতোবার তাঁর কথা শুনেছি যে ব্যাপারটা কোনো দিন ভুলতে পারিনি। বছর দশেক আগে কাগজে ছোটো একটি খবর ছাপা হয়েছিলো। সেটা মনে থাকার কথা নয় তবু মনে আছে। তার কারণ বোধ হয় মৃত্যুঞ্জয়ের মামলা নিয়ে এক সময় আমিও খুব মাথা ঘামিয়ে-ছিলুম। রমেনের সঙ্গে সে-সময় প্রায়ই আমার তর্ক হোতো। রমেন বলতো আইন অনুসারে মৃত্যুঞ্জয়ের ফাঁসি হওয়াই উচিত ছিলো—রোগী যন্ত্রণা পেলে তো আবোল-তাবোল কথা বলবেই, বলবেই তো যন্ত্রণার চেয়ে মৃত্যু ভালো। তাই বলে ডাক্তার কি রোগীর কথা শুনে তাকে মেরে ফেলবে ? এ-ক্ষেত্রে হয়তো মৃত্যুঞ্জয় ঠিকই অনুমান করেছিলেন রোগী বেশি দিন বাঁচবে না। কিন্তু এমনো তো হতে পারে যে ডাক্তারের অনুমান ভুল। কতবার তো দেখা গেছে যে ডাক্তার জবাব দিয়ে যাবার পরেও রোগী ক্রমশ সেরে উঠেছে। মৃত্যুঞ্জয়ের সাজা না হলে অন্যান্য ডাক্তার-দের সাহস যাবে বেড়ে! অনেকেই হয়তো ভুল করে যন্ত্রণার হাত থেকে রোগীদের মুক্তি দেবার জন্যে তাদের হত্যা করবে।

সমাজের পক্ষে সেটা ভালো কথা নয়। সেই জন্যেই, অন্তত যাতে ঐ ধরনের ঘটনা আর না ঘটে, মৃত্যুঞ্জয়ের ফাঁসি হওয়াই উচিত। আমি বলতুম হয়তো আইনের চোখে মৃত্যুঞ্জয় অপরাধী! কিন্তু শুধু আইনের চোখ দিয়েই তো সব ব্যাপার দেখা উচিত নয়। মানুষের চোখ দিয়ে দেখলে মৃত্যুঞ্জয়কে অপরাধী কোনো মতেই বলা যায় না!—যাই হোক, এই একটি ব্যাপারে রমেনের সঙ্গে কোনোদিন একমত হতে পারিনি। তাই বছর দশেক আগে যখন কাগজের এক কোণে খবর বেরুলো যে দেওঘরে মৃত্যুঞ্জয় নামে এক নজরবন্দী আসামীর আগুনে পুড়ে মৃত্যু হয়েছে, ব্যাপারটা তখন অনেকেই লক্ষ্য না করলেও আমি বিশেষ-ভাবে লক্ষ্য করেছিলুম। খুব সংক্ষেপে এই খবরটা ছাপা হয়েছিলো: মৃত্যুঞ্জয় তেরো বছর জেলে থাকার পর কর্তৃপক্ষ তাঁকে জেল থেকে মুক্তি দিয়ে দেওঘরে নজরবন্দী করে রাখেন। মৃত্যুঞ্জয় সেখানে একলা একটি ছোটো বাড়িতে, অত্যন্ত নিরিবিলি জায়গায়, থাকতে সুরু করেন। কারুর সঙ্গেই বড় একটা তিনি মিশতেন না, নিজের ছোটো-বাড়িতে শুধু পড়াশুনো করতেন আর করতেন নানা ধরনের ডাক্তারি পরীক্ষা। ঐ ছোটো বাড়ির মধ্যেই তিনি একটি কাজ-চালানো গোছের ল্যাবরেটারি বানিয়ে-ছিলেন আর তাই নিয়েই থাকতেন ব্যস্ত। কারুর সঙ্গেই তিনি মিশতেন না, কেউ আলাপ করতে এলে তেড়ে যেতেন! সমস্ত মানুষই যেন তাঁর শত্রু—এই রকম ছিলো একটা ভাব। সপ্তাহে

শুধু একবার সেখানকার থানায় গিয়ে তিনি হাজিরা দিয়ে আসতেন।--একদিন মাঝরাত্রে হঠাৎ দেখা যায় মৃত্যুঞ্জয়ের ছোটো বাড়িটা দাউ-দাউ করে জ্বলছে। বাড়িটা এতো দূরে আর জলের এতো অভাব যে নেভানো সম্ভব হোলো না। পরের দিন সকালে আগুন আপনা থেকে নেভবার পর পুলিশের লোকেরা খুঁজে দেখলো বিশেষ কিছু অবশিষ্ট নেই। শুধু কয়লার মতো কালো কতকগুলো পোড়া হাড় রয়েছে আর রয়েছে খানিকটা গলা সোনা। মৃত্যুঞ্জয়ের হাতে একটি সোনার আংটি সর্বদা থাকতো। পুলিশের লোকরা অনুমান করে ঐ হাড় এবং সোনা মৃত্যুঞ্জয়েরই শেষ চিহ্ন।"

সমস্ত দিনটা বেশ পরিষ্কার ছিলো। সন্ধের মুখে সঞ্জীব যখন অঘোরবাবুর বাড়ি থেকে বেরুলো ততক্ষণে আবার মেঘ করে এসেছে। ট্রেনে ওঠার পরেই বইতে লাগলো ঠাণ্ডা বাতাস, তারপর কয়েক মিনিটের মধ্যেই নামলো তুমুল বৃষ্টি। হঠাৎ যেন রাত হয়ে গেলো। চারিদিক ঘিরে নামলো রাত্রির কালো ঢাকা। সঞ্জীব বুঝলো আজকের মতো দিনের আলোর এইখানেই শেষ। কাল সকালেও সূর্য উঠলে হয়।

সকালে সেই যে সঞ্জীব বেরিয়েছে তারপর থেকে এতোক্ষণ সে বাড়ির বাইরে। একটা খবরও দেওয়া হয়নি। হয়তো বাবা

তাব ভাবছে। তবে সে বলেই বেরিয়েছিলো ফিবতে তাব দেবী হবে। এতো দেবী যে হবে সে-কথা অবশ্য তখনো সে ভাবতেই পারেনি!

অঘোরবাবুব কাছে ঐ অদ্ভুত মামলাব কাহিনী শোনাব পব থেকে তাব যেন সমস্তটাই গোলমাল হয়ে গেছে। এখনো সে ভেবে ঠিক কবতে পারছে না যাদেব কাছে শাদা চাক্তি আসে তাবা ঐ মামলাব জুবি ছিলো কিনা। জয়কৃষ্ণ আব রমেনবাবু অবশ্য জুবি ছিলেন। কিন্তু এটা হয়তো ইংবিজিতে যাকে বলে এ্যাকসিডেন্ট তাই। অন্তত আব একজন ঐ চাক্তি না পেলে ঠিক বোঝা যাচ্ছে না ব্যাপাবটা ঠিক কি। মনেমনে ভাবতে লাগলো সঞ্জীব : এখনো বাকী আছেন অনাদি, হৃদয়বঞ্জন, বিশ্বনাথ, আসানুল আব তাব বাবা মাধব। তখনো সে জানে না মাধবের কাছে তিন নম্বর লেখা সেই শাদা চাক্তিটা সকালে সে বাড়ি ছেড়ে বেরুবাব পরেই গেছে পৌছে!

সঞ্জীব ভাবতে লাগলো হাওড়া ইস্টিশানে পৌছতে প্রায় ন'টা—গাড়ি যদি লেট না করে। তারপর এই বৃষ্টিব মধ্যে ট্রাম-বাসে সে যদি সোজা বাড়ি যায় তাহলেও অন্তত আবো এক ঘণ্টা। অর্থাৎ রাত দশটার আগে বাড়ি পৌছনো সম্ভব নয়। সাড়ে দশটা ধরে রাখাই ভালো। সোজা বাড়িতে গিয়ে তার বাবাকে প্রশ্ন করবে অনাদি, হৃদয়বঞ্জন, বিশ্বনাথ আর আসানুলেব ঠিকানা তিনি জানেন কিনা। তাবপর কাল সকালেই বেরুবে ঐ ভদ্র-

লোকদের খোঁজে। তাঁদেরও খানিকটা সাবধান করে দেওয়া দরকার বৈকি। তবে তার কল্পনাটা নিতান্তই হয়তো আজগুবি। মৃত্যুঞ্জয় তো বহুদিন আগেই দেওঘরে মারা গেছেন। তিনি বেঁচে থাকলে আর বাইরে থাকলে তবু ববং কথা ছিলো। তা হলে কে এই হত্যাকারী ?

সমস্ত দিনের উত্তেজনা আর পবিশ্রমেব পব ট্রেনের ঢুলুনিতে তার ভারি ক্লান্ত লাগলো। আরাম করে বিছানায় একবার গড়িয়ে নিতে পাবলে হোতো।···কারুব সঙ্গে যদি সে একবার ভালো করে পবামর্শ করতে পারতো। মেধো-বর্ণিত ওই শিখেব কথাটাও ভবে দেখা উচিত বৈকি। তার মনে হতে লাগলো অনেক কিছুই সে যেন জেনে গেছে, অথচ তাদের ঠিক মতো জোড়া লাগাতে পারছে না। কোথায় যেন কোন জিনিসটা গেছে হারিয়ে। সে কি বঙ্কিতকে সব কথা খুলে বলবে ? কিন্তু বঙ্কিতকে তার ভালো লাগে না : এমন করে তার দিকে তাকায় আর মাঝেমাঝে এমন অদ্ভুত স্বরে প্রশ্ন করে তাতে মনে হয় তাকে যেন বঙ্কিত সন্দেহ করে। সে খুন করেছে ?—ভাবতে-ভাবতে নিজেব মনেই হাসলো সঞ্জীব। তার মতো চালাক ছেলেকে কে ধরতে পারবে ? কে পারবে তাকে বিপদে ফেলতে !

তবে এক-এক সময় তার মনে হয় বটে রঞ্জিতটাকে শেষ করে দিলেই ভালো হয়। তার ঐ চাউনি আর বাঁকা-বাঁকা কথা সহ্য হয় না। সে তো দেখেইছে তাদের দোকানের টাইপরাইটারে রঞ্জিতকে টাইপ করতে, তাদের দোকানের লাল কালিতে দোকানের কলম দিয়ে হিজিবিজি লিখতে। তারপর আরো লক্ষ্য করেছে টাইপ-করা সেই কাগজ আর লাল কালির সেই লেখা তাকে কায়দা করে পকেটে পুরতে। রঞ্জিত ভেবেছে বুঝি কেউই তার চালাকি ধরতে পারেনি। সন্দেহ করেছে সেই চাক্তি পাঠাবার খামের উপরকার টাইপকরা লেখাটা তাদেরই মেশিনে ছাপা হয়েছে, সেই শাদা চাক্তির উপরকার লাল কালির সংখ্যাগুলো হয়েছে তাদেরই কালিতে লেখা। ইতিমধ্যে নিশ্চয়ই নানা বৈজ্ঞানিক উপায়ে সমস্ত পরীক্ষা সে শেষ করেছে! মনে-মনে সঞ্জীব আবার হাসতে লাগলো! অত সহজ নাকি সমস্ত ব্যাপারটা! টাইপের অক্ষর-গুলো যদিই বা মেলে, লাল কালিটাও যদি এক বলে জানা যায়—তা হলেই বা প্রমাণ কী হোলো? কে দেখেছে তাকে টাইপ করে ঐ শাদা চাক্তি পাঠাতে? কে দেখেছে তাকে শাদা চাক্তির উপর লাল কালিতে ওই সংখ্যাগুলো বসাতে? কে দেখেছে তাকে সেই বিষাক্ত বাম্ব লাগাতে? কে দেখেছে তাকে রমেনের পিঠে ছুরি বসাতে? এ-সবের উত্তর দেবে কে?

আসলে রঞ্জিতটার ঘটে এককোঁটাও বুদ্ধি নেই। সে ভুল পথে চলেছে। তার সঙ্গে পরামর্শ করতে গেলেই নানা গোলমাল

বাধবে। দরকার নেই তাব। ববঞ্চ প্রবীন লোক ধনঞ্জয় কবিরাজ। আজ বাত্রেই তাঁব সঙ্গে দেখা করবে সঞ্জীব। তাঁব সঙ্গেই বরঞ্চ আলোচনা কববে। ভাবতে-ভাবতে ঘুমে তাব চোখ জড়িয়ে এলো। মনে হোলো সমস্ত পবামর্শ-টবামর্শ বাজে। সবচেয়ে আগে দবকাব শাদা নবম বিছানায় হাত-পা মেলে শুয়ে পড়া!

সপ্তম অধ্যায়

ভাঙা ছুঁচ

রাত্রি সাড়ে দশটা।

ঘণ্টা খানেক আগে থেকেই আবার ঝমঝম ক'রে বৃষ্টি নেমেছে। সমস্ত আকাশ গভীর অন্ধকারে আচ্ছন্ন। রাতের কলকাতায় মাঝে-মাঝে আলো দেখা যাচ্ছে বটে, তবু এই অন্ধকারের সান্নিধ্যে সমস্ত সহরটা কেমন যেন ভয় পেয়ে গেছে। বৃষ্টির শব্দ ছাড়া আর কোনো শব্দ নেই, মাঝে-মাঝে শুধু মেঘের চাপা গুরুগুরু ধ্বনি। ঐ চাপা শব্দে আপনা থেকেই যেন বুকের ভিতরটা কেঁপে ওঠে।

এই বৃষ্টি-ভেজা মেঘ-ডাকা নির্জন রাতে বড় একটা কেউ জেগে নেই। ঘরে-ঘরে দরজা বন্ধ। পথে লোকজন নেই বললেই চলে। কিন্তু ধনঞ্জয় কবিরাজ এখনো ঘুমোতে যাননি। অনেক রাত পর্যন্ত জেগে কাজ করা তাঁর অভ্যেস। আজকের রাতেও তাঁর কাজের কামাই নেই। একতলায় দোকান-ঘর বন্ধ করে তিনি দোতলার ঘরে এসে বসে আলো জ্বালিয়ে-কাজ করছেন। এই ঘরটি বিশেষ ছোটো নয়, কিন্তু সমস্ত ঘরময় কাগজের ছোটোবড় ঠোঙা ও কাঠের প্যাকিং বাক্স ছড়িয়ে রয়েছে। এতো-

টুকু জায়গা খালি পাওয়াও মুসকিল। ফলে ঘরটি আসলে যত না ছোটো তার চেয়ে অনেক ছোটো বলে মনে হয়। ঘরের এক পাশে গদি-মোড়া একটি ইজিচেয়ার ও আরো একটি বেতের চেয়ার রয়েছে, লেখার জন্যে রয়েছে একটি টেবিল। চারদিকেব দেয়ালেই কাঠের তাক মেঝে থেকে প্রায় ছাত পর্যন্ত উঁচু হযে উঠেছে। তাকগুলি প্রায় এখন খালি। দেখলেই বোঝা যায ঐ তাক থেকেই ঠোঙা আর কাঠেব প্যাকিং বাক্সগুলো নামানো: ধনঞ্জয় চেয়াব-টেবিলে বসে কাজ কবতে পছন্দ করেন না। মেঝেয় সমস্ত জিনিসপত্র নামিয়ে কাজ কবতে তাঁর স্নবিধে হয়।

ওই ছোটোবড় ঠোঙা আব কাঠের বাক্স'য় ভরা রয়েছে নানা ধরনের গাছপালাব পাতা-শেকড়-ডাল। সযত্নে একটিব পব একটি ঠোঙা পবীক্ষা করে তিনি দেখতে লাগলেন। বাজে শেকড়-বাকড়-গুলো বেছে এক পাশে রাখলেন জমা করে। কাঠেব বাক্সগুলোয় পবিচ্ছন্ন হাতে কাগজের টুকরোয গাছপালাব কবিবাজি নাম লিখে আঠা দিয়ে এঁটে দিতে লাগলেন। কখনোই তাঁর এই কাজ সম্পূর্ণ হয় না। সপ্তাহে একবাব কবে তিনি গাছপালার খোঁজে বেরোন, ফলে শেকড়-বাকড়ের সংখ্যা ও পরিমাণ ক্রমাগতই বেড়ে যায়। আশ্চর্য মানুষ ধনঞ্জয়। তাঁব শরীরে ক্লান্তিও নেই, মনে বিরক্তিও নেই। কাজে কখনো অবহেলা করেন না। প্রসন্ন মুখে তিনি কাজ করে চলেন।

আজকের সকালটা যে-রকম সুন্দর হয়ে দেখা দিয়েছিলো

এখন আর তার আভাস নেই। আসলে মানুষের জীবনটাই এই রকম। কখনো সূর্যের আলোয় ঝলমল করে, কখনো মেঘের বিষণ্ণতায় ঢেকে যায়। কখন যে কী হয় কেউ সঠিক বলতে পারে না।

কাজের ফাঁকে মাঝেমাঝে চোখ তুলে জানালার ভিতর দিয়ে ধনঞ্জয় দেখতে লাগলেন। রাস্তা পেরিয়ে ঠিক সামনের বাড়িটি মাধবের। মাধবের শোবার ঘরটা এখান থেকে স্পষ্ট দেখা যায়। এখনো মাধব জেগে আছে কি ঘুমিয়েছে ঠিক বোঝা যায় না, তবে তার ঘরের আলোটা নেভানো নয়। বেচারা মাধব। দারুণ ভয় পেয়েছে। এমনিতেই সে ভীরু প্রকৃতির। তার উপর ঐ তিন নম্বর লেখা চাক্তিটা এসে পৌঁছনোয় তার ভিতরে সাহসের কণামাত্রও আর অবশিষ্ট নেই। মাধবের ছেলে সঞ্জীবই বা কী ধরনের! সেই যে সকাল থেকে বেরিয়েছে, এখনো দেখা নেই। কোথায় যে গেছে কেউ জানে না। অবশ্য সে জানবে কী করে তার বাবার নামে তিন নম্বর লেখা চাক্তি এসেছে; কিন্তু সকালে বেরিয়ে রাত্রি সাড়ে দশটা পর্যন্ত এই ঝড়-জলের সময়ে বাইরে থাকাটাই বা কোন ধরনের কাজের কথা হোলো? সঞ্জীব ঐ এক খাপছাড়া ছেলে। সব সময়েই যেন কী ভাবে, নিজের মনের কথা কাউকেই বলতে চায় না। বিশেষ করে শঙ্কর মিত্র স্ট্রিটের এই ধরনের খুন-খারাপীর পর থেকে সে যেন আরো অনেক বদলে গেছে। সেই বিষাক্ত বোমার কথাটা ঠিকই সে

ধরেছিলো। পুলিশ ইন্সপেক্টার রঞ্জিত তাতে যে রীতিমতো বিস্মিত হয়েছে সে-কথা ধনঞ্জয় জানে। রঞ্জিত মুখে অবশ্য কিছু বলেনি, কিন্তু তার হাবভাবে কেমন যেন মনে হয়। সঞ্জীবকে সে যেন ঠিক সোজা চোখে দেখছে না।

কথাগুলো মনে হতে ধনঞ্জয় নিজের মনেই একটু হাসলেন। সঞ্জীব খুন করেছে? এটা বিশ্বাস করবার মতো একটা কথা হোলো? তারপর আবার মিলিয়ে গেলো ধনঞ্জয়ের হাসি। কিন্তু বাইরেটা দেখেই কি লোক চেনা যায়? মানুষের বাইরের চেহারা এক রকম, কিন্তু মনের চেহারার কথা কে বলতে পারে?

বৃষ্টি-পড়া রাতের শঙ্কর মিত্র স্ট্রিটের অনুজ্জ্বল আলোয় ধনঞ্জয় চুপ করে খানিক দেখতে লাগলেন। মাধবের বাড়ির কাছাকাছি একটি লোক বর্ষাতি গায়ে ছাতা মাথায় ধীরে-ধীরে নড়েচড়ে বেড়াচ্ছে। তার হাতের জ্বলন্ত সিগারেটের লালচে আলো মাঝেমাঝে চোখে পড়ে। লোকটা পুলিশের, মাধবের মিনতিকে রঞ্জিত উপেক্ষা করতে পারেনি। মুখে অবশ্যই তিন নম্বর লেখা চাক্তিটাকে কোনো বদ ছোক্‌রার রসিকতা বলে সে জোর করে উড়িয়ে দিয়েছে সত্যি, কিন্তু তার মনের চেহারাটা ধনঞ্জয় অনেকটা দেখে ফেলেছে। শাদা চাক্তিকে কেন্দ্র করে পর-পর দুটি অবিশ্বাস্য ঘটনার পর রঞ্জিতও বেশ ঘাবড়ে রয়েছে। কোনো দিক দিয়ে নিজের কাজের অবহেলা যাতে না হয় সেদিকে তার কড়া নজর। তাই পুলিশ আপিস থেকে একজন ডিটেকটিভকে

সে পাঠিয়েছে সমস্ত রাত বাড়িটার উপর নজর রাখতে, মাধবকে পাহারা দিতে। সেই লোকটাই ঝড়-বৃষ্টির রাতে আজ ওখানে পায়চারি করছে, হাতে জ্বলন্ত সিগারেট। নিজের অবস্থার কথা ভেবে লোকটা নিশ্চয়ই মনে-মনে প্রসন্ন নয়, মাধবের মৃত্যু কামনাও সে যে করছে না এমন কথা জোর করে কে বলতে পারে?

কিন্তু যে-যাই ভাবুক, যে যতই সাবধানে থাকুক—কপালের লেখা কে খণ্ডাতে পারে? যা হবার তা তো হবেই—ভাবতে-ভাবতে ধনঞ্জয়ের চোখমুখ কেমন যেন বিবর্ণ হয়ে গেলো। তারপর আবার নিজের কাজে তিনি মন দিলেন। দূর ছাই, যত সব বিদঘুটে ভাবনা।

সম্ভবত মিনিট পনেরো এক মনে ধনঞ্জয় কাজ করেছেন এমন সময় নীচের তলার ঘরের দরজায় ঠিক যেন ডাকাত-পড়া শব্দ হতে লাগলো দুম-দুম করে। মুহূর্তের মধ্যে কাজ থামিয়ে ধনঞ্জয় মুখ তুললেন। সামনের দেয়াল-ঘড়িতে তখন ঠিক এগারটা বাজতে দশ মিনিট। কিন্তু দরজা ধাক্কার কামাই নেই। জিনিসপত্র যে-রকম ছড়ানো ছিলো সে-রকমই রইলো। দ্রুত পায়ে সিঁড়ি দিয়ে নেমে দরজা খুললেন তিনি।

বাইরে দাঁড়িয়ে রয়েছে সঞ্জীব। বৃষ্টিতে জামা-কাপড় আধভেজা। কিন্তু সেদিকে তার কোনো খেয়াল নেই। মুখচোখের পাগলের মতো উদভ্রান্ত। ধনঞ্জয়কে কোনো কথা বলতে না

দিয়ে সঞ্জীব বললো, "শিগগির একবার আসুন, বাবাকে একবার দেখতে চলুন।"

"কেন, কী হয়েছে?" প্রায় সঙ্গে-সঙ্গেই প্রশ্ন করলেন ধনঞ্জয়।

"কী জানি! ঠিক বুঝতে পারছি না। কিন্তু শোবার ঘরের মেঝেয় তিনি পড়ে রয়েছেন। দেহে প্রাণ আছে কিনা জানি না। সম্ভবত নেই। আমি কিছু বুঝতে পারছি না। এইমাত্র বাড়ি ফিরে তাঁর ঘরে ঢুকে ঐ দৃশ্য দেখলুম। কিন্তু দোহাই আপনার, আব দেরী করবেন না--শিগগীর আমার সঙ্গে একবাব আসুন।"

"নিশ্চয়ই সঞ্জীব, আমি যাবো বৈকি। কিন্তু তুমি বোধ হয় জানো না আজ সকালেই তোমাব বাবা তিন নম্বর লেখা শাদা চাক্তি পেয়েছিলেন। আব এক মুহূর্তও দেরী নয়—এখনি গিয়ে তুমি কোনো ডাক্তার ডেকে আনো। পুলিশ ইন্সপেক্টার রঞ্জিত তোমাদের বাড়ি পাহারা দেবার জন্যে একজন ডিটেকটিভকে মোতায়েন রেখেছেন। ঐ যে, ঐ ভদ্রলোক। এদিকেই আসছেন বলে মনে হয়। তাঁকে নিয়ে আমি তোমার বাবার ঘরে চললুম। ডাক্তার নিয়ে এখনি তুমি এসো, পারো তো রঞ্জিতকেও একটা টেলিফোন করে দিয়ো।"

এক মুহূর্ত ইতস্তত করে সঞ্জীব সেই ভিজে পথ ধরে দৌড়তে সুরু করলো ডাক্তারের বাড়ির উদ্দেশে। তাদের উত্তেজিত কথাবার্তা শুনে সেই ডিটেকটিভ এদিকে এগিয়ে আসছিলো।

নঞ্জয় দ্রুত পায়ে তার কাছে গিয়ে বললেন, "মাধবের কিছু একটা হয়েছে! তার ছেলেকে আমি পাঠিয়েছি ডাক্তার ডাকতে। লুন আপনাতে-আমাতে এখনি ভেতবে যাই।"

"কিছু একটা হয়েছে? বলেন কি?" উত্তেজিত হয়ে াতের সিগারেটটা ছুঁড়ে ফেলে লোকটি বললো, "কিন্তু কী য়েছে জানেন না? আমি তো সন্ধে থেকে বাড়িটা পাহারা দিচ্ছি। বিকেলে আপনার বাড়ি থেকে বেবিয়ে মাধববাবু সেই য নিজেব বাড়িতে ঢুকেছেন তাবপব থেকে আব বেবোননি। াইরেব কোনো লোকও তাব বাড়িতে আসেনি। শুধু মিনিট পাঁচেক আগে তাঁব ছেলে ঢুকেছিলেন। বাইরেব দবজাটা নিজেব কেটেব চাবি দিয়ে তিনি খুলে ফেললেন। দবজাটার দুটো াবি আছে জানতুম, তা ছাড়া মাধববাবুর ছেলে সঞ্জীবকে আমি অনেকবাব দেখেছি। তাই আব কোনো প্রশ্ন কবিনি, কিংবা বাধাও দিইনি।" প্রায় গড়-গড় কবে কথাগুলো বলা যখন শেষ হোলো ততক্ষণে তাকে প্রায় ঠেলে ধনঞ্জয় বাস্তা পেবিয়ে মাধবেব দোকানের দবজায এসে পৌঁচেছেন।

"সন্ধে থেকেই মাধবেব ঘবে আলো জ্বলছে। একবারও নেভেনি। ঐ দেখুন, এখনো জ্বলছে।" বলে লোকটি একবার উপবের খোলা জানালার দিকে আঙুল দেখালো তারপর আবার প্রশ্ন করলো, "কিন্তু মাধববাবুব কী হয়েছে আপনি কিছু জানেন না?"

"আমি কিছুই জানি না," চাপা দৃঢ় স্বরে ধনঞ্জয় বললেন। তারপর সেই ডিটেকটিভকে নিয়ে উঠে এলেন উপরে। মাধবের শোবার ঘরের দরজাটা খোলা। সেই খোলা দরজার ভিতর দিয়ে দেখা গেলো ঘরের মেঝের মাঝখানটায় মাধব পড়ে রয়েছে। গা খালি--বাড়িতে প্রায় সব সময়েই সে খালি গায়ে থাকতো। তার মুখে ভয়ের কোনো রকম চিহ্ন নেই : শুধু একটা দারুণ বিস্ময়ের ভঙ্গী।

ডাক্তার নিয়ে ফিরতে সঞ্জীবের প্রায় আধ ঘণ্টা দেরী হোলো। কাছাকাছি কোনো ডাক্তারকে না পাওয়ায় ট্যাক্সি নিয়ে মাইল তিনেক দূরের এক ডাক্তারকে সে এনেছে।

ডাক্তার যতক্ষণ ধরে প্রাথমিক পরীক্ষা শেষ করলেন ততক্ষণে ঘরের সবাই প্রায় রুদ্ধনিশ্বাসে অপেক্ষা করতে লাগলেন। বেশিক্ষণ সময় লাগলো না। ডাক্তার সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে বললেন, "দেহে প্রাণ নেই। কিন্তু কিসে মৃত্যু হয়েছে জানতে হলে আরো ভালো করে পরীক্ষা করা দরকার। যতক্ষণ না পুলিশ ইন্সপেক্টার আসেন ততক্ষণ বোধ হয় নাড়াচাড়া না করাই ভালো।"

ধনঞ্জয় শান্ত গম্ভীর গলায় বললেন, "নিশ্চয়ই। আমরা কিছু ছোঁবো না, নাড়াচাড়া করবো না। রঞ্জিতবাবুকে তুমি খবর দিয়ে এসেছো সঞ্জীব?"

সঞ্জীব যেন কেমন হয়ে গেছে। ঘরের এক কোণে পাথরের

মতো চুপ ক'রে সে দাঁড়িয়ে। কী যেন বলতে গেলো, পারলো না। শুধু ঘাড় নাড়িয়ে জানালো যে খবর সে দিয়েছে।

আর প্রায় সঙ্গে-সঙ্গেই বাড়ির বাইরে ট্যাক্সি থামার শব্দ হোলো, তারপরেই শোনা গেলো সিঁড়িতে দ্রুত পায়ের শব্দ। কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই উত্তেজিত হয়ে ঢুকলো রঞ্জিত।

"মাধবের মৃত্যু হয়েছে," ধনঞ্জয়ই প্রথম কথা বললেন, "ডাক্তারবাবু কোনো কিছু না ঘেটে বাইরে থেকে পরীক্ষা ক'রে দেখেছেন। এখন আপনার জন্যে আমরা সবাই অপেক্ষা করছি।"

রঞ্জিত সবাইকার মুখের উপর দ্রুত চোখ বুলিয়ে নিয়ে বললো, "কোনো জিনিসপত্র সরানো হয়নি তো?"

ধনঞ্জয় উত্তর দিলেন, "না।"

রঞ্জিত ক্ষিপ্রহাতে পকেট থেকে একটা খড়ি বার ক'রে মাধবের দেহ যেখানে পড়ে সেখানে কতকগুলি দাগ দিলো, নোটবুকে ঘরের জিনিসপত্রের অবস্থানের কথা টুকে নিলো, তারপর ডাক্তারের দিকে ফিরে বললো, "কিন্তু কী করে মৃত্যু হয়েছে এবং ক'টার সময়েই বা হয়েছে সে-কথা কিছু বলতে পারেন?"

"আধ ঘণ্টা থেকে তিন কোয়ার্টারের মধ্যে হয়েছে বলে মনে হয়।"

ঘড়ির দিকে চেয়ে রঞ্জিত বললো, "এখন সাড়ে এগারোটা।

তার মানে পৌনে এগারটা থেকে এগারোটার মধ্যে মৃত্যু হয়েছে।” তারপর ডিটেকটিভের দিকে চেয়ে প্রশ্ন করলো, “তখন তুমি কোথায় ছিলে?”

“আমি তো বাড়ির সামনেই পাহারা দিচ্ছিলুম। প্রায় পৌনে এগারোটায় সঞ্জীববাবু চাবি দিয়ে দরজা খুলে ভেতরে ঢুকলেন। ওপরে আলো জ্বলছিলো। সন্ধে থেকেই জ্বলছিলো। ঐ সময়ের মধ্যে আর কেউ ভেতরে যায়নি কিংবা ভেতর থেকে বাইরে আসেনি।”

রঞ্জিত ভালো করে একবার সঞ্জীবের মুখের দিকে চাইলো, কিন্তু তাকে কিছু না বলে ডাক্তারের দিকে চেয়ে বললো, “কিন্তু কী করে মৃত্যু হয়েছে সে-বিষয়ে কিছু বলা আপনার পক্ষে কি সম্ভব?”

ডাক্তার উত্তর দিলেন, “বোধ হয় না। কিন্তু আগে একবার ভালো করে পরীক্ষা করা দরকার।”

রঞ্জিত সম্মতি দিলে ডাক্তার নতজানু হয়ে মাধবের মৃত-দেহের পাশে বসলেন। চিৎ হয়ে মাধব পড়েছিলো। ধীরে-ধীরে দেহটিকে তিনি পাশ ফেরালেন, তারপর পিঠের উপর ঝুঁকে পড়ে কী যেন দেখতে লাগলেন।

“কী দেখছেন?” রঞ্জিত প্রশ্ন করলো।

“পিঠের ঠিক মাঝখানে প্রায় গোল লাল একটি দাগ। যেন রক্ত জমে গেছে। ঠিক তার মাঝখানে কী যেন বিঁধে রয়েছে

এক মিনিট অপেক্ষা করুন। ফরসেপ দিয়ে ওটা বার করি।— এই যে, কিন্তু আশ্চর্য! এটা যে ইনজেকসন দেবার সিরিঞ্জের একটা ছুঁচ। খানিকটা অংশ ভেঙে গেছে। বাকীটা কোথায়? —বঙ্কিতবাবু, খানিকটা এখন আঁচ করতে পারছি। সাপের বিষের মতো তীব্র কোনো বিষ ঐ সিরিঞ্জে ছিলো। ঠিক কী বিষ ভালো করে ল্যাবরেটারিতে পরীক্ষা না করলে বুঝতে পারবো না। ঐ বিষ প্রয়োগেই মাধববাবুর মৃত্যু হয়েছে।" বলে ডাক্তার অতি সাবধানে সেই ভাঙা ছুঁচটিকে একটি কাচের শিশিতে ভরে রাখলেন।

অষ্টম অধ্যায়

চার নম্বরের চাক্তি

রঞ্জিত বলতে লাগলো, "সমস্ত ঘটনাটির এই ভাবে উল্লেখ করলে বোধ হয় ভুল হয়না : জয়কৃষ্ণ সামন্ত'র চোরাই জিনিস কেনাবেচার কারবার ছিলো। ফলে নানা রকম চোর গুণ্ডা বদমাইসের সঙ্গে তাকে মিশতে হয়। কোনো এক ঘটনায় জয়কৃষ্ণের সঙ্গে ঐ ধরনের কোনো একটি লোকের ঝগড়া থেকে ক্রমশ দারুণ শত্রুতায় পরিণত হয়। সেই লোকটি কায়দা করে জয়কৃষ্ণকে শঙ্কর মিত্র স্ট্রিটের একটি খালি বাড়িতে ডেকে এনে বিষাক্ত বোমার সাহায্যে হত্যা করে। ঐ বিষাক্ত বোমাটি ঠিক কী ভাবে তৈরি হয়েছিলো বিজ্ঞানের ছাত্র সঞ্জীববাবু সে-কথা আপনাদের ভালো করে বুঝিয়ে বলতে পারেন," বলে সঞ্জীবের দিকে রঞ্জিত কয়েক মুহূর্তের জন্য চেয়ে রইলো।

সঞ্জীব কিন্তু কোনো উত্তর দিলো না।

রঞ্জিত আবার শুরু করলো, "তারপর আবার মৃত্যু হোলো রমেনবাবুর। রমেনবাবু প্রত্যেক শুক্রবার তাঁর দিদিমার সঙ্গে দেখা করতে আসতেন। সঞ্জীববাবুর সঙ্গে বয়সের ব্যবধান থাকা সত্ত্বেও রমেনবাবুর যথেষ্ট আলাপ ছিলো। প্রতি শুক্রবারেই রমেনবাবু যে তাঁর দিদিমার সঙ্গে দেখা করতে আসতেন সে-কথা

সঞ্জীববাবুর মুখেই আমরা শুনেছি। কোনো কারণে জয়কৃষ্ণের হত্যাকারীর সঙ্গে রমেনবাবুর হয়তো মনোমালিন্য হয়েছিলো—হয়তো রমেনবাবু ঐ হত্যার কোনো গোপন রহস্য জেনে ফেলে-ছিলেন। তাই রমেনবাবুকে পৃথিবী থেকে সরিয়ে ফেলা জয়কৃষ্ণ সামন্ত'র হত্যাকারীর পক্ষে একান্ত প্রয়োজন বলে মনে হয়েছিলো। গতকাল সন্ধে আটটার সময় রমেনবাবু এই অঞ্চলের একটা গলির মধ্যে অত্যন্ত সন্দেহজনকভাবে খুন হন। তাঁর মৃতদেহ প্রথম আবিষ্কার করেন সঞ্জীববাবু। ঠিক আটটার সময়েই আবিষ্কার করেন। রমেনবাবুকে যে-ছুরিটা দিয়ে হত্যা করা হয় সেই ছুরিটা অদ্ভুত ধাঁচের, তার হাতল নেই। ফলে সন্দেহ হয় ছুরিটা বোধহয় কোনো বৈজ্ঞানিক উপায়ে দূর থেকে রমেনবাবুর পিঠে বেঁধানো হয়েছিলো। এ-বিষয়ে সঞ্জীববাবু সম্ভবত আমাদের সাহায্য করতে পারবেন।" বলে রঞ্জিত আবার চাইলো সঞ্জীবের দিকে।

সঞ্জীব এবারেও নিরুত্তর। শুধু উত্তেজনায় তার আঙুলের ডগাগুলো থরথর করে কাঁপছে দেখা গেলো।

রঞ্জিত আবার শুরু করলো, "তারপর আজ সকালে মাধববাবু তিন নম্বর লেখা শাদা চাক্তি পেলেন। সঞ্জীববাবু তখন বাড়ি ছিলেন না। সমস্ত দিন তিনি নিখোঁজ। সন্ধে থেকে মাধববাবুর বাড়ি পাহারা দেবার জন্যে আমি একজন ডিটেক-টিভকে মোতায়েন রাখি। তিনি লক্ষ্য করেছেন সন্ধে থেকে

পৌনে এগারটা পর্যন্ত মাধববাবুর বাড়িতে কেউ ঢোকে নি। পৌনে এগারটায় সঞ্জীববাবু বাড়ি ফেরেন। প্রায় সঙ্গে-সঙ্গেই বেরিয়ে এসে তিনি খবর দেন মাধববাবুর মৃত্যু হয়েছে। মাধববাবুর মৃত্যুর কারণ শুনেছি কোনো এক মারাত্মক বিষ—ইনজেকসন দেবার সিরিঞ্জের মধ্যে ভরে তাঁর পিঠে ঐ বিষ প্রয়োগ করা হয়। আপনারা সবাই লক্ষ্য করুন—মাধববাবুর মুখে একটা বিস্ময়ের ছাপ। এ-রকম ভাবা মোটেই অন্যায় হয় না যে মাধববাবু তাঁর শোবার ঘরে দরজার দিকে পিঠ করে দাঁড়িয়ে ছিলেন। এমন সময় কারুর পায়ের শব্দে তিনি চমকে ফিরে দেখেন তাঁরই অতি পরিচিত কেউ খুব সাবধানে হাতে একটি ইনজেকসনের সিরিঞ্জ নিয়ে এগিয়ে আসছে। তিনি বিস্ময়ের ঘোর কাটিয়ে ওঠার আগেই হত্যাকারী সেই বিষ ক্ষিপ্রহাতে মাধববাবুর পিঠে ফুটিয়ে দেয়—তাড়াতাড়িতে নিখুঁতভাবে কাজ সে শেষ করতে পারেনি, তাই সিরিঞ্জের ওপরকার ছুঁচটা ভেঙে গিয়ে মাধববাবুর পিঠে আটকে থাকে।"

তারপর আধ মিনিট চুপ করে থেকে সঞ্জীবের দিকে পূর্ণ দৃষ্টিতে চেয়ে রঞ্জিত বললো, "আমি খবর নিয়ে জেনেছি সঞ্জীববাবুর সঙ্গে তার বাবার মোটেই সদ্ভাব ছিলো না।"

সঞ্জীবের আঙুলের ডগাগুলো থরথর করে কাঁপছে, তবু প্রাণপণ শক্তিতে নিজেকে সামলে নিয়ে দৃঢ় গলায় সে বললো, "আপনার সমস্ত কথা মন দিয়ে শুনলুম রঞ্জিতবাবু। খুবই

ইণ্টারেস্টিং সন্দেহ নেই, কিন্তু আগাগোড়া সমস্তটাই আপনার কল্পনা। কল্পনা দিয়ে কোনো প্রমাণ হয় না! আপনাকে প্রমাণ করেত হবে জয়কৃষ্ণ সামন্ত'র সঙ্গে আমার চোরাই মাল নিয়ে কারবার ছিলো, প্রমাণ করতে হবে রমেনবাবু এই গুপ্ত-রহস্য জেনেছিলেন, প্রমাণ কবতে হবে এই বিষ সংগ্রহ করে আমিই সিরিঞ্জে ভরে বাবার পিঠে প্রয়োগ করেছি—সেই ভাঙা সিরিঞ্জ-টাকেও এখান থেকে আবিষ্কার করতে হবে।—বঞ্চিতবাবু, আপনাব হাতে কোনো ঘটনাবই প্রমাণ নেই, শুধু ঘটনাচক্রে কয়েকবাব হত্যার সময়ে আমাকে নিহত লোকের কাছে আবিষ্কার করা ছাড়া। এটা দৈবাৎ হতে পারে, কিংবা সেই চতুর হত্যা-কারীর সূক্ষ্ম ষড়যন্ত্রও হতে পাবে যাতে সমস্ত সন্দেহটা আমার ঘাড়েই পড়ে।"

বঞ্চিত মৃদু হেসে বললো, "প্রমাণ যে একেবারেই নেই সে কথা মানলুম না। কিছু-কিছু প্রমাণ আমার কাছে আছে বৈকি। যাঁবা তিনজন নিহত হয়েছেন তাঁদের প্রত্যেকেই ডাকে বাদামি কাগজের খামে নম্বর-লেখা চাক্তি পেয়েছেন। সেই খামেব ওপর টাইপ করে নাম-ঠিকানা লেখা আছে। বৈজ্ঞানিকদের দিয়ে পরীক্ষা করিয়ে নিঃসন্দেহ হয়েছি যে যে-টাইপরাইটার দিয়ে ঐ খামগুলো ছাপা হয়েছে সেটা আপনাদেরই। শাদা চাক্তির ওপর যে-লাল কালি দিয়ে সংখ্যাগুলো লেখা হয়েছে সেই কালি নীচের তলায় আপনাদের দোকান-ঘরের টেবিলেই রয়েছে।"

"এটাও হত্যাকারীর আর একটা সূক্ষ্ম চাল—যাতে আমারই ওপর সন্দেহটা দৃঢ় হয়। কিন্তু রঞ্জিতবাবু, আজ সমস্ত দিন ঘুরে আমি অনেক নতুন খবর আবিষ্কার করেছি। আপনাকে খোঁজ নিতে হবে মৃত্যুঞ্জয় নামে কোনো ডাক্তার এখনো বেঁচে আছে কিনা। কিন্তু তার চেয়েও আগে দরকার অনাদি, হৃদয়রঞ্জন, বিশ্বনাথ আর আসানুল নামে ভদ্রলোকদের খুঁজে বার করা এবং তাঁদের জীবন যাতে বিপন্ন না হয় তার বন্দোবস্ত করা। আমাকে বিশ্বাস করুন, আমি নিঃসন্দেহে জেনেছি তাঁদের জীবনও আজ বিপন্ন এবং এই মুহূর্ত থেকে সাবধান না হলে আরো হত্যাকাণ্ড পরপর যে ঘটবে তাতে সন্দেহ নেই।"

সঞ্জীবের কথায় ঘরের মধ্যকার সবাই নির্বাক হয়ে রইলো। কথা কইলো রঞ্জিত, "আপনি ভারি চালাক সঞ্জীববাবু। কিন্তু আজ আর আপনাকে ছাড়ছি না। আপনার প্রলাপ থানায় গিয়ে বলবেন। কিন্তু আপাতত আমার সঙ্গে চলুন।"

এক মুহূর্তের মধ্যে সঞ্জীব কী যেন ভেবে নিলো। পরমুহূর্তেই একটি আশ্চর্য কাণ্ড করলো। সে যেখানে দাঁড়িয়েছিলো ঠিক তার পিছনেই ইলেকট্রিক আলোর সুইচ। রঞ্জিতের কথা শেষ হবার প্রায় সঙ্গে-সঙ্গেই আলোর সুইচটা নিভিয়ে এক লাফে ঘরের বাইরে এসে বাইরে থেকে সে শিকল তুলে দিলো। তারপর দ্রুত পায়ে নেমে এদিক-ওদিক চেয়ে অন্ধকারের ভিতর নানা অলি-গলির মধ্যে কোথায় যে অদৃশ্য হয়ে গেলো কেউ জানলো না।

সদলবলে বঞ্জিত যখন বাইরে এলো পনেরো মিনিট তখন কেটে গেছে। এই অন্ধকার বৃষ্টি-পড়া রাতে সঞ্জীবের খোঁজ করা প্রায় অসম্ভব। তবু ডিটেকটিভের হাতে এক লাইন লিখে সে থানায় পাঠালো।

ধনঞ্জয় কবিরাজ বঞ্জিতের সঙ্গে পথে নেমে এসে বললেন, "সত্যি এতো দিন গেলো, মানুষকে এখনো ঠিকমতো চিনতে পারলুম না। সঞ্জীবকে তো ছেলেবেলা থেকে দেখছি। কিন্তু তার ওপর এতোটুকু সন্দেহ কখনো আমার হয়নি।—কিন্তু চকচক করছে ওটা কী?" বলে মাধবের সদর দরজার পাশ থেকে নীচু হয়ে তিনি তুলে ধরলেন একটি জিনিস। পকেট থেকে টর্চ বার করে বঞ্জিত ভালো করে সেটা পরীক্ষা করলো—ইনজেকসন দেবার সিরিঞ্জ, তার উপরকার ছুঁচটা ভাঙা।

বঞ্জিত বিস্মিত দৃষ্টিতে ধনঞ্জয়ের মুখের দিকে চাইলো। ধনঞ্জয়ের শান্ত চোখের দৃষ্টি রাত্রির কালো অন্ধকারের সঙ্গে প্রায় মিশে গেছে

"একটা পরিষ্কার কাগজ দরকার এটা মুড়ে রাখার জন্যে," বঞ্জিত বললো।

"আমার বাড়িতে এক মিনিটের জন্যে আসুন বঞ্জিতবাবু। পরিষ্কার কাগজ ওখানে রয়েছে।" বলতে-বলতে প্রায় জোর করেই বঞ্জিতকে নিয়ে ধনঞ্জয় কবিরাজ রাস্তা পেরিয়ে নিজের বাড়িতে ঢুকলেন। সদর দরজাটা খোলাই রয়েছে, ভিতরে জ্বলছে বিদ্যুতের আলো।

"একি, দরজা খুলেই চলে এসেছিলেন?" রঞ্জিত প্রশ্ন করলো।

একটু হেসে ধনঞ্জয় বললেন, "হ্যাঁ, তাড়াতাড়িতে দরজা বন্ধ করার কথা মনেই ছিলো না।" তারপর ঘরের মাঝখানের ছোটো টেবিলটার কাছে এগিয়ে এসে আবাব তিনি বললেন, "কিন্তু দরজা খুলে যাওযাটা ঠিক হয়নি রঞ্জিতবাবু। সেই ভদ্রলোক ছ' পয়সার ডাক-খবচা বাঁচিয়েছেন! এবাবে ডাকে আব না পাঠিয়ে নিজে হাতেই রেখে গেছেন চাক্তিটা।"

রঞ্জিত উত্তেজনায় কোনো কথা বলতে পারলো না। তার সামনের ছোটো টেবিলের ঠিক মাঝখানে একটি গোল শাদা চাক্তি। তার উপব লাল কালিতে শুধু একটি সংখ্যা লেখা রয়েছে: চার।

নবম অধ্যায়

মনোতোষের বাড়ি

সেই ঝড়-বৃষ্টির রাতে পথে নেমে এসে প্রথমে সঞ্জীব কিছুই ঠিক করতে পারলো না : কোথায় এখন সে যাবে ? কিন্তু ভাববার সময় অত্যন্ত কম। যা করবার এখনি করতে হবে। একবার নিজের বাড়ির দিকে, একবার বৃষ্টি-ভেজা শঙ্কর মিত্র ষ্ট্রিটের দিকে চেয়ে মুহূর্তের জন্য সে কী যেন ভাবলো। তারপর আর কোনো দ্বিধা না করে দ্রুত হাঁটতে লাগলো আধো-আলো আধো-অন্ধকার পথ ধরে। মোড়ের উপরেই সে একটি ট্যাক্সি পেয়ে গেলো। ট্যাক্সিতে উঠে প্রথমে এলো সে এসপ্ল্যানেডে। সেখানে ট্যাক্সি বদল করে অন্য একটি ট্যাক্সি নিয়ে সোজা চলে এলো শ্যামবাজারে মনোতোষের বাড়ি। মনোতোষ তার সহপাঠি ও বিশেষ বন্ধু। তার বাবা নামকরা উকিল। মনোতোষই একমাত্র লোক যে তার বাবার সহায়তায় সঠিক খবর নিতে পারবে অনাদি, হৃদয়রঞ্জন, বিশ্বনাথ আর আসানুল সম্বন্ধে। মনোতোষের উপর সঞ্জীবের অগাধ বিশ্বাস। সে জানে তার এই বিপদে এখন একমাত্র মনোতোষই সাহায্য করতে পারবে।

মোড়ে নেমে ট্যাক্সির ভাড়া সঞ্জীব মিটিয়ে দিলো। ট্যাক্সি-টার পিছনের লাল আলো একেবারে মিলিয়ে যাবার পর সে

মনোতোষের বাড়ি পর্যন্ত হেঁটে এলো তারপর একতলার রাস্তার উপর যে-ঘরে মনোতোষ শোয় সে-ঘরের জানালায় ধীরে-ধীরে টোকা দিলো।

মনোতোষের ঘুম ভাঙতে বিশেষ দেরী হোলো না। বাইরে বেরিয়ে চোখ রগড়াতে-রগড়াতে প্রশ্ন করলো কী ব্যাপার?

ঘরে এসে সুস্থির বসে খানিক জিরিয়ে নিলো সঞ্জীব। এক গেলাস ঠাণ্ডা জল খাবার পর খানিকটা সুস্থ বোধ করলো। তারপর এ-কদিনকার সমস্ত ঘটনাই সংক্ষেপে তাকে জানালো।

কথা বলতে-বলতে সঞ্জীবের গলা থেকে উত্তেজনা কমে এলো। তার স্বর শান্ত অথচ দৃঢ়।

সে থামলে মনোতোষ উত্তেজিত হয়ে বললো, "বলিস কি! তোর বাবা আজ রাত্রে খুন হয়েছেন আর পুলিশে তোকে হত্যা-কারী বলে ধরতে চাইছে!"

সঞ্জীব কোনো কথা না বলে একেবারে স্তব্ধ হয়ে বসে রইলো। শুধু তার পাথরের মতো কঠিন মুখ বেয়ে ঝর-ঝর করে জল গড়িয়ে পড়ছে। বহুবার বহু বিষয় নিয়ে তার বাবার সঙ্গে নিজের মিল হয়নি সত্যি, কিন্তু আজ রাতে মনোতোষের বাড়িতে বসে সে যখন প্রথম আবিষ্কার করলো আর কখনো তার বাবার সঙ্গে দেখা হবে না তখন নিজেকে সামলানো তার পক্ষে বেশ কঠিন হয়ে পড়লো। তবু একটু সে নড়লো না। জোর করে নিশ্চল হয়ে বসে রইলো আর তার সমস্ত মুখেচোখে কেবল এই একটি প্রতিজ্ঞা দৃঢ় হয়ে

ফুটে উঠলো : তার বাবার হত্যাকারীকে যেমন করে হোক, যেখান থেকেই হোক খুঁজে সে বার করবেই আর বাঁচাবে অনাদি, হৃদয়-রঞ্জন, বিশ্বনাথ আর আসানুলকে।

আরো খানিক চুপচাপ কাটলো। তারপর মনোতোষই প্রথম কথা বললো। "তুই এখন কী করবি ?"

কী যে সে করবে ট্যাক্সিতে আসার সময় সে-কথা সঞ্জীব ভালো করে ভেবে রেখেছে। বললো, "সবচেয়ে আগে দরকার কলকাতার বাইরে দিন কয়েকের জন্যে গা ঢাকা দেওয়া। ভাবছি দেওঘরেই যাবো। সেখানে গিয়ে নিজে একবার পরীক্ষা করে দেখবো মৃত্যুঞ্জয় ডাক্তারের পোড়া বাড়িটা। সেখানকার লোকদের কাছেও খবর নেবার চেষ্টা করবো মৃত্যুঞ্জয় ডাক্তারের। সব প্রথম দরকার সঠিকভাবে জানা মৃত্যুঞ্জয় ডাক্তার এখনো বেঁচে আছে কিনা। কী ভাবে যে সে-খবর পাবো এখনো অবশ্য জানি না। কিন্তু মনোতোষ, কাল সকালেই তোর বাবার সাহায্যে অনাদি, হৃদয়রঞ্জন, বিশ্বনাথ আর আসানুলের খবর জোগাড় কর। তিনি উকিল, তাঁর পক্ষে তাই মৃত্যুঞ্জয় ডাক্তারের কেস্‌টা বার-লাইব্রেরি থেকে খুঁজে বার করতে অসুবিধে হবে না। কোর্টেও কোথাও না কোথাও মৃত্যুঞ্জয় ডাক্তারের বিচারের সময় যাঁরা জুরি হয়েছিলেন তাঁদের ঠিকানা পাওয়া যাবে। সেই ঠিকানা গুলো নিয়ে তুই নিজে ঐ চারজন ভদ্রলোককে সাবধান করে দিস। আর সবচেয়ে দরকার মৃত্যুঞ্জয় ডাক্তারের একটা ফটোর।

কোনো না কোনো খবরের কাগজের আপিসে নিশ্চয়ই পাবি।"

মনোতোষ ডাক্তারি পড়ে। সঞ্জীব মনোতোষের কোট-পেণ্টালুন পরে, গলায় স্টেথিস্কোপ ঝুলিয়ে, হাতে ডাক্তারি ব্যাগ নিয়ে চটপট যতটা ছদ্মবেশ ধরা যায় ধরলো। ছোটো একটা বিছানাও মনোতোষ তাকে বেঁধে দিলো আর দিলো শ দুই টাকা। তারপর মনোতোষ ডেকে আনলো একটা ট্যাক্সি। সেই ট্যাক্সিতে উঠে সে যখন বর্ধমান রওনা হোলো রাত তখন তিনটে। বর্ধমান থেকে সকালের ট্রেনে সে দেওঘর যাবে ঠিক করলো।

দশম অধ্যায়

দেওঘরে

আগের দিন সন্ধেয় দেওঘরে পৌঁছে এক পাণ্ডার সাহায্যে ছোটো একটি বাড়ি ভাড়া সে পেয়ে গেছে। সহরের প্রায় শেষ সীমায় এই ছোটো আর পুরনো বাড়ি। এর এমন জরাজীর্ণ চেহারা যে সচরাচর প্রায় ভাড়াই হয় না। বাড়ির মালিক এক বিধবা, তিনি কাশিতে থাকেন। বাড়িটা দেখাশুনো করা এবং ভাড়া দেওয়া ও ভাড়ার টাকা আদায় করা—সমস্তই করে এক বৃদ্ধ মালি। এ অঞ্চলেই সে থাকে।

তাকে পেয়ে সঞ্জীব যে-রকম খুসি, সঞ্জীবকে পেয়েও বুড়ো মালি তার চেয়ে কম খুসি নয়। সঞ্জীব তাকে অগ্রিম এক মাসের বাড়ি ভাড়া বাবদ ত্রিশ টাকা দিয়ে দিয়েছে। তার জন্যে খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থাও করেছে সেই মালি। সে-জন্যেও আরো কুড়ি টাকা সঞ্জীব তাকে আগাম দিয়েছে। এ-রকম ভালো ভাড়াটে এর আগে মালি কখনো পায়নি। সঞ্জীবের কাছে সে শুনেছে দু-চার দিন পরেই সঞ্জীব ফিরে গিয়ে তার পরিবারের সবাইকে নিয়ে আসবে।

দেওঘরে যে-রাতে সঞ্জীব পৌঁছলো তার পরের দিন দুপুরের কথা। বাজার থেকে মালি খবরের কাগজ কিনে এনেছে।

কলকাতার খবরের কাগজ এখানে একদিন পরে সকালে পাওয়া যায়। কাগজটার জন্যে সঞ্জীব অত্যন্ত ব্যগ্র হয়েই অপেক্ষা করছিলো। কাগজটা পেতেই তাড়াতাড়ি খুলে পড়তে বসলো।

প্রথম পাতাতেই বড়-বড় হরফে ছাপা হয়েছে গত পরশুর খবর। সঞ্জীবের চেহারার বর্ণনা এবং বি. এস্. সি. পাস করার পর কন্‌ভোকেশনে ডিগ্রি নিতে যাবার সময়কার টুপি ও গাউনপরা তার একটি ছবিও ছাপা হয়েছে। যে-বর্ণনা ছাপা হয়েছে সঞ্জীব ভেবে দেখলো সে-বর্ণনা অনুযায়ী তারই জানা অন্তত পাঁচ হাজার মানুষের সঙ্গে তা মিলে যায়। তা' ছাড়া ছবিটার ব্লক অত্যন্তই খারাপ, সেই ব্লক দেখে মানুষ চেনা এমনিতেই শক্ত। তার উপর পরনে গাউন এবং মাথায় টুপি থাকায় তাকে চেনে কার সাধ্যি। এই ছবিটা যে তার নিজের এ-কথা বিশ্বাস করতে তার নিজেরই বেশ কষ্ট হয়। এ অঞ্চলে হঠাৎ যে কেউ ঐ ছবি দেখে তাকে চিনতে পারবে এ-রকম ভয় তার হোলো না। মনে-মনে বেশ একটু সুস্থই সে বোধ করতে লাগলো।

তারপর ভালো করে কাগজটা সে পড়তে সুরু করলো—তার ছবি ছাপিয়েই পুলিশ থেকে ক্ষান্ত হয়নি, যে তার খবর দিতে পারবে তাকে বেশ একটা মোটা পুরস্কার দেবার কথাও কাগজে ছাপা হয়েছে। -- এ সব খবরের জন্যে মোটামুটি সে প্রস্তুতই ছিলো। তাই বিশেষ আশ্চর্য হোলো না। কিন্তু

সবচেয়ে সব সত্যিকারের বিস্মিত হোলো চার নম্বরের চাক্তির কথাটা পড়ে। ধনঞ্জয় কেন ঐ চাক্তিটা পেলেন? ধনঞ্জয় তো জুরিদের মধ্যে ছিলেন না! তবে কি তার সমস্ত ধারণাই ভুল? এই সব হত্যাকাণ্ড তবে কি অন্য কোনো হত্যাকারীর কাণ্ড যার সঙ্গে মৃত্যুঞ্জয় ডাক্তারের কোনো সম্পর্ক নেই?

ভাবনার তার শেষ নেই। গত ক'দিন ধরে সমস্তক্ষণ সে ভেবেছে, কেবল ভেবেছে। ভালো করে ঘুমুতে শুদ্ধু পারেনি। আজ দুপুরে কাগজটা হাতে নিয়ে আবার সে নতুন করে ভাবতে লাগলো। সঙ্গে-সঙ্গে পায়চারি করে চললো। সমস্তটা মিলেও শেষটা যেন মিলছে না। কোথায় যেন কী একটা জিনিস সে বারবার ছেড়ে যাচ্ছে। একটুর জন্যে যেন আসল সত্যের নাগাল সে পাচ্ছে না।

শেষে বাড়ির মালির সঙ্গে সে গল্প জুড়লো। মালিকে নানা প্রশ্ন করে মৃত্যুঞ্জয় ডাক্তার আর তার বাড়িটা সম্বন্ধে যে-সব খবর সে আবিষ্কার করলো তা এই: এখান থেকে মাঠের মধ্যে দিয়ে পায়ে-হাঁটা পথ ধরে সোজা মাইল-দুয়েক এগিয়ে গেলে একটা পোড়ো বাড়ির চিহ্ন এখনো দেখা যাবে। জায়গাটা ভারি নির্জন। কাছে-পিঠে জনমানব নেই। বহুকাল আগে, ঠিক কত বছর হবে মালি হিসেব করে বলতে পারলো না, এক অদ্ভুত বুড়ো লোক এসে ঐখানে একটি বাড়ি বানিয়ে একাই থাকতো। ওরা প্রথমে তার কিছুই জানতে পারেনি, কিন্তু মাঝেমাঝে পুলিশের,

লোককে সেই বাড়িতে যেতে দেখে এবং মাঝেমাঝে সেই বাড়ির মালিককে থানায় আসতে দেখে তাদের কেমন যেন সন্দেহ হয়। তারপর কাণাঘুষোয় সমস্ত ব্যাপারটা জানা যায়। সেই আধ-বুড়ো লোকটা নাকি এক খুনের আসামী ছিলো। অনেক বছর জেল খাটার পর সে খালাস পেয়েছে বটে কিন্তু এখনো পুলিশের কাছে নজরবন্দী হয়ে তাকে থাকতে হয়। তাই পুলিশের লোক তার খবর নিতে মাঝেমাঝে যায়, সেও মাঝেমাঝে থানায় আসে হাজিরা দিতে। এ-রকম লোকের সঙ্গে কে মিশবে? সবাই ভয়ে-ভয়ে তার কাছ থেকে দূরেই থাকতো। সে-ও যে কারুর সঙ্গে মেশবার আগ্রহ দেখাতো এমন নয়। চুপচাপ সর্বদা নিজের বাড়িতে সে কাটাতো। ভিতরে সর্বক্ষণ কী যে করতো ভগবান জানেন। তার বাড়িটা ছিলো ছোটো একটা দুর্গের মতো। চারদিকে খাড়া পাঁচিল। বাইরে বেরুবার একটিমাত্র দরজা ছিলো আর সেই দরজাটা ছিলো লোহার। ফলে একবার সেটা ভিতর থেকে বন্ধ করে দিলে কার সাধ্যি সেই বাড়ির মধ্যে ঢোকে। কোনো চোরের পক্ষে তো নয়, ডাকাতরাও দল বেঁধে সে-দরজা ভাঙতে পারতো না। লোকটা নিজের সব কাজ নিজেই করতো: রান্না থেকে, বাসনমাজা, জামাকাপড় কাচা, ঘরদোর পরিষ্কার করা, সমস্তই। দু-তিন দিন ছাড়া-ছাড়া একটা লোক শুধু তার জন্যে বাজার করে এনে দিতো আর পোস্টাপিস থেকে এনে দিতো নানা ছোটোবড় প্যাকেট আর কয়েকটা করে

চিঠি। সেই সব প্যাকেটে নাকি বই আসতো, মাঝেমাঝে নানা রকম ওষুধপত্তর আসতো। চিঠিপত্র কার কাছ থেকে আসতো ভগবান জানেন, কারণ তারা সবাই শুনেছিলো লোকটার আর কোনো আত্মীয় বেঁচে নেই।

তারা কাণাঘুষোয় শুনেছিলো যে ঐ খুনের আসামী খুব বড় ডাক্তার ছিলো। নিজের বাড়িতে বসে সে নাকি কেবলি বই পড়তো আর ওষুধ বানাতো। আসলে কী যে করতো কেউ তার জানে না। তারপর হঠাৎ এক রাতে তারা দেখলো আগুনের শিখায় সমস্ত আকাশটা লাল হয়ে গেছে। থানা থেকে বহু পুলিশ এবং সহর থেকে বহু লোক সে-রাত্রে ঐ ডাক্তারের বাড়ির সামনে হাজির হয়েছিলো। কিন্তু ততক্ষণে সমস্ত বাড়িটাই দাউ-দাউ করে ধরে গেছে। আগুনের সে কী তেজ! কাছে যায় কার সাধ্যি। তারা সেই রাত্রে ভয় আর বিস্ময় নিয়ে দূরে দাঁড়িয়ে আগুনের সেই ধ্বংসলীলা শুধু দেখেছিলো: জল ঢেলে আগুন নেভাবার প্রশ্নই ওঠে না। কাছে অত জল কোথায়? আর থাকলেই বা আগুনের সেই ঝলসে-দেওয়া তাপের মধ্যে বাড়ির কাছেই বা এগুবে কে? সেই ডাক্তার যে ভিতরে ছিলো তাতে সন্দেহ নেই, কারণ সেই বাড়ির মধ্যে থেকে মাংস পোড়ার বিশ্রী একটা গন্ধ সবাই তারা পেয়েছিলো। পুলিশের লোকেদের কাছে তারা সবাই শুনেছিলো যে সেই বাড়ির মধ্যে এমন সব ওষুধ ছিলো সহজেই নাকি যাতে আগুন ধরতে পারে আর তাতে একবার আগুন

লাগলে আর রক্ষে নেই। পুলিশের লোকেরা সন্দেহ করেছিলো রাত্রে দরজা বন্ধ করে শোবার পর ডাক্তারের অসাবধানতায় কোনো রকমে কোনো ওষুধের বোতলে প্রথমে আগুন লাগে, তারপর চক্ষের নিমেষে সেই আগুন বাড়িময় ছড়িয়ে পড়ে। ঘুম ভাঙার পর ডাক্তার উঠে দরজা খোলার সময় পর্যন্ত পায়নি।

ডাক্তারের যে সত্যিই মৃত্যু হয়েছিলো পরের দিন বিকেলে আরো স্পষ্ট করে সে কথা জানা গেলো। কারণ সেই দগ্ধস্তূপের মধ্যে কতকগুলো শুধু পোড়া-হাড় পাওয়া গিয়েছিলো আর পাওয়া গিয়েছিলো একটু সোনা। ডাক্তারের আঙুলে একটা সোনার আংটি ছিলো। আংটিটা গলে গিয়ে সেই সোনায় রূপান্তরিত হয়েছিলো।

একাদশ অধ্যায়

দগ্ধস্তূপে

সেই দগ্ধস্তূপ দেখবার জন্যে বিকেলে সঞ্জীব একাই বেরিয়ে পড়লো। কলকাতার কোলাহল, ভীড়, উত্তেজনা আর দুর্ভাবনার পর এখানকার শান্ত প্রকৃতি, খোলা মাঠ আর প্রশান্ত নীল আকাশের তলায় একা হাঁটতে-হাঁটতে সঞ্জীবের ভারাক্রান্ত মন ক্রমশ হালকা হয়ে এলো। যতই এগুতে লাগলো ততই চারদিক যেন গভীর নিস্তব্ধতায় ডুবে যেতে লাগলো। বাস্তবিক ভারি নির্জন জায়গা। বৃষ্টির জলে ঘাস-লতা-পাতা-গাছ সবকিছু ধুয়ে উজ্জ্বল সবুজ রঙের যেন হাট বসিয়েছে। দূরের পাহাড়গুলি নীল কুয়াশার মতো মনে হয়। মাথার উপর টলটলে নীল আকাশ। পশ্চিম দিগন্তের কাছে খুব পাতলা জালের মতো শাদা এক ফালি মেঘ পড়ে রয়েছে। মাঝেমাঝে এক-এক ঝাঁক বকের সারি তাদের লঘু পাখায় ভর দিয়ে চলেছে উড়ে। দেখতে-দেখতে দিনের আলো প্রায় মিলিয়ে এলো। সেই এক ফালি শাদা মেঘ প্রথমে উজ্জ্বল সোনালি হয়ে উঠলো। তারপর তার রঙ যেন ক্রমশ ঝরে যেতে লাগলো। সূর্য অস্ত গেলো।

পায়ে-হাঁটা পথটি শেষ পর্যন্ত কোনো গ্রামে গিয়ে হয়তো

থেমেছে। কিন্তু এর চেহারা দেখলে মনে হয় না খুব বেশি লোক এর উপর দিয়ে যাতায়াত করে। সঞ্জীবের কোনো তাড়া নেই। ধীরে-সুস্থে সেই দগ্ধস্তূপে পৌছতে সঞ্জীবের সোয়া ঘণ্টার উপর কেটে গেলো। সেটা দেখে চিনতে তার একটুও অসুবিধে হোলো না। বাড়িটার বিশেষ কিছুই অবশিষ্ট নেই। একপাশের দেয়াল সামান্য একটু উঁচু হয়ে রয়েছে। তার ইটের রঙ এখনো কালো, অতীতের অগ্নিকাণ্ডের সাক্ষী দেয়। ইটের ভিৎ-টার অধিকাংশ রোদে আর বৃষ্টিতে ফেটে গেছে। নানা আগাছা জন্মেছে তার উপর। কয়েকটা আতা-গাছও সেই পাঁচিল আর ভিৎ ফাটিয়ে গজিয়েছে। হাতের টর্চ জ্বালিয়ে সঞ্জীব ভালো করে সব জায়গাটা দেখে নিলো। দেখবার মতো অবশ্য বিশেষ কিছুই অবশিষ্ট নেই। যে-টুকু অবশিষ্ট আছে সেটুকু দেখে বাড়িটার আসল চেহারা যে কী রকম ছিলো তার কোনো ধারণাই হয় না।

দেখা শেষ করে সেই দগ্ধস্তূপ থেকে বেরিয়ে, পায়ে-হাঁটা পথটা অতিক্রম করে একটি পরিষ্কার পাথরের উপর সে গিয়ে যখন বসলো তখন বেশ অন্ধকার হয়ে গেছে। আকাশে কয়েকটা তারা ফুটেছে। সঞ্জীব হিসেব করে দেখলো একটু পরে ভাঙা চাঁদ উঠবে।

টর্চ জ্বালিয়ে ভালো করে চারদিক দেখে নিয়ে সেই পরিষ্কার পাথরের উপর চিৎ হয়ে শুয়ে সঞ্জীব বাস্তবিক আকাশ-পাতাল

ভাবতে লাগলো। অল্প পরেই চাঁদ উঠলো। মৃদু জ্যোৎস্না ক্রমশ উজ্জ্বল হোলো। বাতাস বেশ ঠাণ্ডা হয়ে গেছে। সমস্ত শরীর সিবসিব করে। চারদিকের দৃশ্য এই ভাঙা চাঁদের জ্যোৎস্নায় একেবারে যেন নতুন হয়ে গেছে।

শুয়ে-শুয়ে সঞ্জীব ভাবতে লাগলো এরপর সে কী করবে? এখানে অনির্দিষ্ট কাল ধরে তো তার থাকা সম্ভব নয়। কলকাতায় তাকে ফিরতেই হবে। কবে সে ফিরবে। মনোতোষ তাকে যে-টাকা দিয়েছিলো এবং তার নিজের কাছে যে-টাকা ছিলো তার অধিকাংশই তো ইতিমধ্যে খরচ হয়ে গেছে। খুব বেশিদিন এখানে থাকা তার পক্ষে সম্ভব হবে না। কলকাতায় ফিরে সে থাকবে কোথায়? কার কাছে সাহায্য নেবে? রঞ্জিত নিশ্চয়ই ইতিমধ্যে তার বন্ধু-বান্ধবের কাছে খোঁজ নিচ্ছে। মনোতোষ যে তার সবচেয়ে বড় বন্ধু এ-খবরটুকু আবিষ্কার করা পুলিশের পক্ষে খুব বেশি শক্ত বলে মনে হয় না। হয়তো ইতিমধ্যেই তার কাছে খোঁজ নিতে তারা গিয়েছে। মনোতোষ অবশ্যই কোনো খবর তাদের জানাবে না। কিন্তু তার সঙ্গে সঞ্জীব যে অদূর ভবিষ্যতে দেখা করার চেষ্টা করতে পারে এই সন্দেহ সহজেই তারা করবে এবং সে-জন্যে তার উপর গোপনে নিশ্চয়ই দৃষ্টি রাখবে। অতএব কলকাতায় ফিরলেও তার বাড়িতে ওঠা কিংবা তার সঙ্গে দেখা করার কোনো উপায়ই নেই। তারপরেই মনে হোলো ধনঞ্জয় কবিরাজের কথা।

সেখানে অবশ্য সে আশ্রয় পেতে পারে। বহুকাল থেকেই ধনঞ্জয় তাকে চেনেন। তিনি নিশ্চয়ই বিশ্বাস করছেন না এই সব হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে সঞ্জীবের কোনো সংশ্রব আছে। তাঁর সঙ্গে কোনো রকমে একবার দেখা করতে পারলে সব রকম সাহায্য নিশ্চয়ই পাওয়া যাবে। তাঁর বুদ্ধি এবং বিবেচনা শক্তির উপর সঞ্জীবের অসাধারণ আস্থা। সঞ্জীবের সমস্ত আবিষ্কারের কথা তাঁকে বললে তিনিও এই রহস্যভেদ সম্পর্কে অনেক সাহায্য করতে পারবেন বলে সঞ্জীব আশা করে।

ধনঞ্জয় কবিরাজের কথা মনে হতেই সেই চার নম্বরের চাক্তির খবর সঞ্জীবের মনে পড়ে গেলো। কে জানে, সেই সর্বনেশে শাদা চাক্তি পাবার পর এখনো তিনি জীবিত আছেন কিনা। কিন্তু উপর্যুপরি তিনটি দুর্ঘটনা ঘটে যাবার পর পুলিশ থেকে তাঁর উপর নিশ্চয়ই কড়া পাহারা বসিয়েছে যাতে দুর্বৃত্ত কোনো সুযোগেই তাঁকে না স্পর্শ করতে পারে। অতএব কলকাতায় ফেরার পরেও তাঁর সঙ্গে, পুলিশের চোখে ধূলো দিয়ে, দেখা করা বেশ দুরূহ হয়ে দাঁড়াবে। তবু দেখা তাকে করতেই হবে।

ধনঞ্জয়ের সম্বন্ধে ভাবতে-ভাবতে আবার তার মনে সেই প্রশ্ন ভেসে উঠলো: কিন্তু ধনঞ্জয় ঐ শাদা চাক্তি পেলেন কেন? এইখানটায় তার সমস্ত গোলমাল হয়ে যেতে লাগলো। ভেবে-ভেবে কোনো কূল-কিনারাই সে করতে পারলো না।

আর বেশি রাত করা ঠিক হবে না ভেবে সঞ্জীব যাত্রার

জন্যে প্রস্তুত হয়ে উঠে বসলো আর প্রায় সঙ্গে-সঙ্গেই সেই নির্জনতার মধ্যে একটি সাইকেলের ঘণ্টার শব্দ শুনতে পেলো। চাঁদের আলোয় দূরের জিনিস স্পষ্ট দেখা যায় না। তবু চেয়ে দেখে মনে হোলো সহর থেকে যে পায়ে-হাঁটা-পথ এসেছে তার উপর দিয়েই একটি সাইকেল এগিয়ে আসছে। সঞ্জীব পাথর থেকে নেমে ফিরে চললো। সেই সাইকেলের আরোহী সম্ভবত কাছাকাছির গ্রামের কোনো লোক। সহরে কাজ সেরে গ্রামে ফিরে চলেছে। কিন্তু ঘণ্টা বাজায় কেন? সম্ভবত কোনো কিছু না ভেবেই নিজের খেয়ালে বাজাচ্ছে।

দেখতে-দেখতে সাইকেলটা বেশ কাছাকাছি এসে পড়লো। পথটা ছেড়ে সঞ্জীব মাঠের উপর দিয়ে হাটতে লাগলো। কিন্তু সাইকেলের আরোহী তাকে পেরিয়ে গেলো না। তার কাছে এসে ঝুপ করে নেমে সাইকেলটাকে মাটির উপর শুইয়ে তার দিকে এগিয়ে আসতে-আসতে বললো, "শুভসন্ধ্যা, সঞ্জীববাবু। আশা করি সান্ধ্-ভ্রমণ বেশ উপভোগ করলেন!"

সঞ্জীবের দেহের সমস্ত রক্ত যেন তার বুকের উপর আছড়ে পড়লো। এই অতর্কিত ঘটনার জন্যে একেবারেই সে প্রস্তুত ছিলো না। দেখলো সেই দীর্ঘদেহী লোকটির মুখের উপর জ্যোৎস্না বেশ স্পষ্ট হয়ে পড়েছে। লোকটি আর কেউ নয়: একজন শিখ। এই জ্যোৎস্নাতেও তার চোখ দুটো যেন ধ্বক-ধ্বক করে জ্বলছে। তার দাড়ির রঙ লালচে আর একটা গালে গভীর ক্ষতের দাগ।

"আপনি, আপনি—কে—" কোনো রকমে বলতে পারলো সঞ্জীব।

বিকট জোরে হেসে উঠলো সেই শিখ। তারপর বলতে আরম্ভ করলো একটা অদ্ভুত খসখসে বিকৃত কণ্ঠে, "আপনার মতো চালাক ভদ্রলোক আমাকে চিনতে পারছেন না এ-কথা বিশ্বাস করাই যে কঠিন! আমি সেই শিখ!"

সঞ্জীব তার সাহস ফিরিয়ে আনবার প্রাণপণ চেষ্টা করে বললো, "যাক! আপনার সঙ্গে তা হলে শেষকালে দেখা হয়ে গেলো! সত্যি কথা বলতে কি এর আগের মুহূর্ত পর্যন্ত আপনার অস্তিত্বে আমি বিশ্বাস করিনি। মনে হয়েছে আপনার উল্লেখ করার সময় সবাই নিশ্চয়ই কোনো-না-কোনো ভুল করেছে।"

আবার হাসতে লাগলো সেই শিখ। বললো, "না সঞ্জীববাবু, ভুল তারা করেনি।"

"আপনি কি তা হলে এই শাদা চাক্তি পাঠাবার মূলে রয়েছেন? আপনি কি এই সব—"

"হ্যাঁ, আমিই। আমিই একটির পর একটি হত্যাকাণ্ড করে চলেছি। কেন করছি সে-কথা তো জানেনই। কিন্তু আমার কাজ প্রায় শেষ হয়ে এসেছে। কারণ আপনি যে-চারজন ভদ্রলোকের জন্যে দুর্ভাবনা করছেন ইতিপূর্বেই অত্যন্ত স্বাভাবিক ভাবে তাঁদের মৃত্যু হওয়ায় আমার হাত থেকে তাঁরা বেঁচে গেছেন।"

"তাঁরা আর বেঁচে নেই ?" অত্যন্ত বিস্মিত হয়ে সঞ্জীব প্রশ্ন করলো। এ সম্ভাবনার কথা তো কৈ ইতিপূর্বে তার মনে কখনো আসেনি !

"না।—যাক, সে পরের কথা। আমি আজ এসেছি আপনাকে অভিনন্দন জানাতে। আপনিই একমাত্র লোক যিনি এই সব হত্যাকাণ্ডের আসল কারণটা ধরতে পেরেছেন। সে-জন্যে আপনাকে আজ অভিনন্দন জানাতে আসাই আমার উদ্দেশ্য।"

"আপনি জানলেন কী করে আমি এখানে এসেছি ?"

হো-হো করে হেসে সেই শিখ বললো, "আমি সব জানতে পারি। কোনো খবরই আমার কাছে অজানা নয়। তবে ভয় পাবেন না, পুলিশে এ-খবর জানিয়ে আপনাকে আমি ধরিয়ে দেবো না। আপনি চালাক সঞ্জীববাবু, তাতে সন্দেহ নেই। কিন্তু বড্ড বেশি আপনি জেনে ফেলেছেন। এই শিখ কিন্তু বেশি জানাকে কখনো ক্ষমা করে না। তাই স্বশরীরে এসেছে আপনার মৃত্যুদণ্ডের কথা জানাতে। আজ থেকে এক সপ্তাহের মধ্যে যেখানেই আপনি থাকুন আপনার মৃত্যু সুনিশ্চিত। এই খবরটুকু শুধু দয়া করে মনে রাখবেন। আপনার জন্যে ভারি করুণা হচ্ছে এই ভেবে যে পুলিশের সাহায্য আপনি নিতে পারবেন না। পুলিশে ধরা দিয়েও আপনি যদি এই সব ঘটনার কথা বলেন তা হলেও তারা যে আপনাকে বিশ্বাস করে বসবে সে আশাও কম। হত্যাকারীকে বার করতে না পারলে তাদের মান-ইজ্জত আর

বজায় থাকছে না। তাই আপনাকে হাতে পেলে তারা ফাঁসি-কাঠে না ঝুলিয়ে যে ছেড়ে দেবে এ-রকম মনে হয় না।"

খানিক চুপ করে রইলো সঞ্জীব, তারপর প্রশ্ন করলো, "আপনিই তা হলে ডাক্তার মৃত্যুঞ্জয়!"

"এইখানে আপনার ভুল হচ্ছে। কিন্তু ভবিষ্যতে আপনার সঙ্গে আবার দেখা হবেই। তখন সমস্ত খবর পাবেন।"

"কিন্তু আর একটি কথা—ধনঞ্জয় কবিরাজ ওই চার নম্বরের চাক্তি কেন পেলেন?"

"তিনিও অনধিকারচর্চা করতে সুরু করেছিলেন সেইজন্যে। তাঁকে গতকাল ধরে নিয়ে গেছি। আশা করি আগামীকাল খবরের কাগজে তাঁর খবরটা পাবেন। কিন্তু ভয় নেই। এখন তাঁকে মারবো না। তাঁকেও সাবধান করে ছেড়ে দেবো। আমার হাতে আরো কয়েকটা জরুরি কাজ রয়েছে। সেই কাজগুলো চুকলেই আপনার এবং ধনঞ্জয় কবিরাজ সম্বন্ধে মন দেবো।—আচ্ছা, শুভ-সন্ধ্যা।" বলেই সেই শিখ সঞ্জীবের সামনে একটা শাদা গোল চাক্তি ছুঁড়ে দিয়ে মাটিতে পড়ে-থাকা সাইকেলটা তুলে নিয়ে যে-দিক দিয়ে এসেছিলো সেই দিকে চক্ষের নিমেষে যাত্রা করলো।

নীচু হয়ে সঞ্জীব সেই শাদা চাক্তিটা তুলে নিলো। চাঁদের আলোয় তার উপরকার লাল কালিতে লেখা পাঁচ—এই সংখ্যাটি পড়তে অসুবিধে হোলো না।

দ্বাদশ অধ্যায়

ধনঞ্জয় কবিরাজ গায়েব

পরের দিন মালি খবরের কাগজ কিনে আনলো। কাগজটার জন্য সঞ্জীব অত্যন্ত উৎসুক হয়ে ছিলো। ধনঞ্জয় কবিরাজকে চুরি করে নিয়ে যাবার কথা শোনা পর্যন্ত তার মন অত্যন্ত অস্থির ছিলো! কড়া পুলিশ পাহারার ভিতর থেকে ধনঞ্জয়ের মতো প্রকাণ্ড চেহারার মানুষ কী করে চুরি যেতে পারে সঞ্জীবের মাথায় কিছুতেই ঢুকছিলো না। কিন্তু খবরের কাগজে ঐ চুরির কথা যা লিখেছে তা পড়ে সঞ্জীবের বিস্ময়ের অবধি রইলো না।

কাগজে লিখেছে: "—শঙ্কর মিত্র স্ট্রিটের অদৃশ্য হত্যাকারীর সাহস ক্রমশই মারাত্মক রকম বাড়িয়া উঠিতেছে। পুলিশের চোখের উপরেই পূর্ব হইতে সাংকেতিক ভাবে খবর দিয়া একটির পর একটি করিয়া ক্রমান্বয়ে তিনটি হত্যাকাণ্ড অত্যন্ত দুঃসাহসের সহিতই সে সম্পন্ন করিয়াছে। পাঠকদের স্মরণ থাকিতে পারে যে-রাত্রে মাধব নিজ বাসভবনে নিহত হইলেন এবং তাঁহার পুত্র সঞ্জীব পুলিশকে বোকা বানাইয়া উধাও হইল সে-রাত্রেই ধনঞ্জয় কবিরাজ পুলিশ ইন্সপেক্টার বঙ্কিমের সহিত নিজ বাসভবনে প্রত্যাগমন করিয়া 'চার' নম্বরের শ্বেত-চক্রটি আবিষ্কার করেন। এই সংখ্যাযুক্ত শ্বেত-চক্র পাইবার অর্থ আজ

আর কাহারও অবিদিত নাই। ধনঞ্জয় কবিরাজের জীবন যে অত্যন্তই বিপন্ন পুলিশের কর্তৃপক্ষের সে-কথা বুঝিতে বিলম্ব হয় নাই। সে-কারণে ইন্সপেক্টার রঞ্জিতবাবু তৎক্ষণাৎ এক পিস্তলধাবী পাহারাওয়ালাকে ধনঞ্জয়েব বাড়িব সম্মুখেই মোতায়েন রাখেন। সেই পাহারাওয়ালার চোখে ধূলা ছড়াইতে এই অদৃশ্য হত্যাকারীর একটুও অসুবিধা যে হয় নাই তাহা পরবর্তী বিবরণ হইতেই প্রকাশ পাইবে।

"সমস্ত রাত্রি নিরুপদ্রবেই কাটিয়াছিল। ভোরের দিকে পাহারাওযালা ক্লান্ত হইয়া যখন ঢুলিতেছিল তখন অকস্মাৎ নিঃশব্দে ধনঞ্জয় কবিবাজের বহির্দ্বাব খুলিযা স্বয়ং কবিরাজমশাই বাহিরে আসেন এবং পাহারাওয়ালাকে ডাকিয়া উত্তেজিতভাবে আদেশ দেন এখনই রঞ্জিতবাবুকে সে যেন ডাকিয়া আনে, ভয়ঙ্কব কাণ্ড ঘটিয়াছে। পাহাবাওযালাব ঘুম ছুটিযা যায়। উত্তেজিত ভাবে মোড়ের দিকে গাড়িব আশায় সে দৌড়াইতে থাকে। যাইবাব সময় একবাব পিছন ফিবিয়া দেখে ধনঞ্জয় কবিরাজ আবাব নিজের বাড়ির ভিতর প্রবেশ কবিয়া দ্বার বন্ধ করিতেছেন। ধনঞ্জয় কবিরাজকে ওই শেষ দেখা গিয়াছিল।

"আধ ঘণ্টার মধ্যে রঞ্জিতবাবুকে লইয়া পাহারাওয়ালা ফিরিয়া আসে। ধনঞ্জয় কবিরাজেব বাড়িব বহির্দ্বার অর্গলরুদ্ধ আছে এই কল্পনায় করাঘাত করিতেই নিঃশব্দে সেই দ্বার খুলিয়া যায়। ঘরের ভিতরে ঢুকিয়া পুলিশের প্রতিনিধিদের চক্ষু স্থির

হইবার জোগাড়। ঘরের ভিতর জিনিসপত্র লণ্ডভণ্ড হইয়া পড়িয়া আছে, ধস্তাধস্তির একটি স্পষ্ট চিহ্ন চতুর্দিকেই বর্তমান। তাঁহারা ধনঞ্জয়ের নাম ধরিয়া উদ্বিগ্নভাবে বারবার হাঁকাহাঁকি করেন। কিন্তু কোনো উত্তর না পাইয়া সমস্ত বাড়ি তন্ন-তন্ন করিয়া খুঁজিতে সুরু করেন। কোথাও কবিরাজমহাশয়ের কিন্তু চিহ্নমাত্র পাওয়া যায় নাই। মানুষটা যেন বাতাসে মিলাইয়া গিয়াছে।

"কবিরাজমহাশয়ের জন্য অনুসন্ধান করিবার সময় টেবিলের উপর একটি টাইপকরা কাগজের প্রতি বঙ্কিতবাবুর দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়। সেই কাগজের উপর পরিষ্কার ইংরাজিতে যে কয় ছত্র লেখা ছিলো তাহার বাংলা অনুবাদ করিলে এইরূপ দাঁড়ায়: 'ধনঞ্জয় নিজের কাজ ছাড়িয়া অনধিকার চর্চা সুরু করিয়াছে। তাহাকে এবং পুলিশকে স্মরণ করাইয়া দিতে চাই যে আমার কোপানলে পড়িলে পৃথিবীতে এমন কোনো শক্তি নাই যে বাঁচাইতে পারে। ধনঞ্জয়কে আর বেশিদিন ইহ জগতে বিচরণ করিতে হইবে না, সে-কথা চার নম্বরের চাক্তি মারফৎ পাঠাইয়াছি। সম্ভবত এই সাবধানবাণী সে কিংবা পুলিশ গভীরভাবে বিশ্বাস করে নাই। আজ রাত্রেই অনায়াসে ধনঞ্জয় কবিরাজের ভবলীলা শেষ করিতে পারিতাম। কিন্তু আমার পঞ্জিকায় ধনঞ্জয়ের যে-তারিখে মৃত্যু হইবার কথা তাহার এখনো কয়েক দিন দেরী আছে। সে-জন্য তাহাকে ধরিয়া লইয়া চলিলাম। দু-তিন দিনের মধ্যে তাহাকে আবার ছাড়িয়া দিব। কিন্তু তাহার

মৃত্যুর দিন ঘনাইয়া আসিতেছে। সে-দিন আসিলেই পৃথিবীতে এমন কোনো স্থান নাই যেখানে সে নিরাপদে থাকিতে পারিবে।'

"ধনঞ্জয়কে খুঁজিয়া বাহির কবিবাব জন্য পুলিশ জোব তদন্ত করিতেছে। আমাদেব সংবাদদাতা জানিতে পারিয়াছেন এই হত্যাকাণ্ডের ব্যাপারে ধনঞ্জয় কবিরাজ পুলিশকে সর্বদাই প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে নানা সাহায্য করিয়া আসিতেছিলেন।"

ত্রয়োদশ অধ্যায়

মেধো'র বাড়ি

শঙ্কব মিত্র ষ্ট্রিটে পরের দিন সন্ধ্যাব অন্ধকারে এক ডাক্তাবকে দেখা গেলো। তাব মাথায় টুপি, পবনে স্যুট, গলায় স্টেথিস্কোপ। টুপিটা কপালেব উপর টেনে নামানো। তা ছাড়া লোকটি প্রায়ই মুখ নীচু করে হাঁটছিলো। তাই সন্ধ্যাব অস্পষ্ট আলোয় তাকে ভালো কবে চেনবার উপায় নেই।

শঙ্কব মিত্র ষ্ট্রিট ধরে খানিকটা হাঁটবার পব বাঁ দিকেব প্রথম গলিতে সে ঢুকলো। গলিটা সরু। দু'পাশেব বাড়িগুলি জীর্ণ ঝুরঝুরে। এই বকমই এক অতি পুবনো বাড়িব শিকল ধরে সে নাড়লো।

বাড়িটা মেধো'ব। মেধো আর তাব মা এখানে থাকে। তাদের অবস্থা বিশেষ ভালো নয়, তাই চাকব-বাকর একটিও নেই। অনেক ভেবে পরের দিন ভোবেব ট্রেনে সঞ্জীব এখানে এসে ওঠাই ঠিক করেছে। দেওঘর থেকে বর্ধমান পর্যন্ত ট্রেনে এবং বর্ধমান থেকে কলকাতা পর্যন্ত ট্যাক্সিতে সে এসেছে। ট্রেনে এলে হাওড়ার ইস্টিশানে হয়তো পুলিশেব সঙ্গে দেখা হয়ে যাবে এই ভয়েই সঞ্জীবের এই সতর্কতা। পুলিশ তাকে আর যেখানেই খুঁজুক এখানে খুঁজতে আসবে না।

মেধো'র মা'কে সঞ্জীব কাকিমা বলে। মেধোই তাঁর একমাত্র সন্তান। সংসারে তাঁর আর কেউ নেই। মেধো'র যে-রকম বুদ্ধি কম, তার মায়ের বুদ্ধি কিন্তু মোটেই সে-রকম নয়। বেশ চালাক বিধবা মহিলা। সঞ্জীবকে তিনি ভারি স্নেহ করেন। কয়েক বছর আগে মেধো'র যখন টাইফয়েড হয়েছিলো তখন সঞ্জীব দিন-রাত সেবা-শুশ্রূষা এবং ডাক্তার ও ওষুধ-পথ্যের ব্যবস্থা করে তাকে বাঁচায়। সে-কথা তিনি কোনো দিনও ভুলতে পারবেন না। সঞ্জীব না থাকলে তাঁর একমাত্র সন্তান যে আজ বেঁচে থাকতো না সে-কথা ভাবলেই তাঁর দু-চোখে জল এসে পড়ে।

দরজা খুলে মেধো'র মা বেরিয়ে আসতেই একরকম জোর করেই সঞ্জীব ভিতরে ঢুকলো তারপর চাপা গলায় বললো, "কাকিমা! ভারি বিপদে পড়েছি। সব খবর তো আপনি জানেনই। নানা জায়গায় পালিয়ে বেড়াচ্ছি। এখন কয়েক দিন এখানে আশ্রয় চাই। নইলে পুলিশের হাতে পড়তে হবে। —আমাকে বিশ্বাস করুন, আমি খুনী নই। আমার বিরুদ্ধে জোর একটা চক্রান্ত চলেছে। দিন কয়েক এখানে লুকিয়ে থাকতে দিন। এই খুনের অভিযোগ থেকে বাঁচতে হলে আসল হত্যাকারীকে খুঁজে বার করা দরকার। আমি অনেক খবর জেনেছি। হয়তো দিন কয়েকের মধ্যেই তাকে ধরতে পাববো। কিন্তু ইতিমধ্যে পুলিশের হাতে পড়লে আমাকে তারা তো

বিশ্বাস করবেই না, উপরন্তু আসল অপরাধী পালাবে। আমাকে কি এখানে লুকিয়ে থাকতে দেবেন কাকিমা ?”

ভদ্রমহিলা প্রথমটায় হকচকিয়ে গেলেন। পরের মুহূর্তে সঞ্জীবের হাত ধরে ঘরের ভিতরে টেনে এনে বললেন, “নিশ্চয়ই বাবা! কিন্তু বাইরের দরজা আর খোলা রাখা নয়। কে জানে কোথা থেকে কে দেখে ফেলবে। যতদিন খুসি এখানে তুমি থাকো। তুমি যে কোনো অন্যায় কাজ করতে পারো না এ-বিশ্বাস আমার আছে। আমাদের দুর্দিনে প্রাণপাত করে তুমি সাহায্য করেছিলে, আর আজ তোমার বিপদে আমি কি সরে দাঁড়াতে পারি ?”

মেধো’র মা ভিতর দিকের একটি ঘরে সঞ্জীবের বিছানা করে দিলেন তারপর এনে দিলেন এক বাটি গরম দুধ। খাবার প্রবৃত্তি তার বিশেষ ছিলো না। এক রকম জোর করেই খেলো। সমস্ত দিনের পরিশ্রম এবং অসুস্থ উত্তেজনার পর গরম দুধ খেয়ে সঞ্জীব অনেকটা সুস্থ বোধ করলো।

তারপর মেধোকে বললো গতকাল এবং আজকের কাগজ কিনে আনতে। সঞ্জীবকে দেখে পর্যন্ত দারুণ ভয়ে মেধোর মুখচোখ শুকিয়ে গিয়েছিলো। এই সব খুন-খারাপি সঞ্জীব করেছিলো বলেই তারও এক রকম বিশ্বাস জন্মে গিয়েছিলো। কিন্তু সঞ্জীবকে সশরীরে সামনে দেখে আর তার গলার স্বর শুনে সঞ্জীবের উপর থেকে তার ভয় অনেকটা কমে আসছিলো। খবরের কাগজের কথা শুনে হেসে সে জানালো কাগজ বাড়িতেই

আছে। পাড়ার সবাইকে এই খুনের পর থেকে প্রত্যহ কাগজ কিনতে দেখে সে-ও একটা করে কাগজ কেনে, গম্ভীর হয়ে পড়ে তারপর সযত্নে ভাঁজ করে তুলে রেখে দেয়। তার মা'কে পর্যন্ত সে-কাগজে হাত দিতে দেয় না।

ছদিনের কাগজই মেধো তাকে এনে দিলো।

গতকালের কাগজ খুলেই সঞ্জীব দেখলো প্রথম পাতায় যে খবরটি ছাপা হয়েছে সংক্ষেপে তা এই :

গতকাল সন্ধ্যায় ধনঞ্জয় কবিরাজ ফিরে এসেছেন। দু'দিনের মধ্যেই তাঁর চেহারা একেবারে বদলে গেছে। তাঁর মুখে ঘটনার যে-বিবরণ পাওয়া গেছে তা এই—চার নম্বরের চাক্তি পাবার পর থেকেই ভয় না পেলেও তিনি মনে-মনে খুব নিশ্চিন্ত ছিলেন না। কিন্তু তৎক্ষণাৎ তাঁর বাড়ির সামনে পিস্তলধারী পাহারাওয়ালা নিযুক্ত করার পর থেকে তিনি খানিকটা নিশ্চিন্ত হন এবং ঘুমোতে যান। ভোরের দিকে তাঁর বাইরের ঘরে কিসের যেন শব্দে তাঁর ঘুম ভাঙে এবং কেউ বাড়িতে ঢুকেছে কিনা পরীক্ষা করার জন্যে তিনি নীচে নেমে আসেন। তন্নতন্ন করে পরীক্ষা করার পরেও বাড়িতে তিনি কাউকে দেখতে পাননি। কিন্তু একটি টাইপ-করা চিঠি তাঁর নজরে পড়ে। চিঠিটি তাঁর টেবিলের উপরেই ছিলো। সেই চিঠিতে তাঁকে ধরে নিয়ে যাবার কথা পড়ে তিনি বেশ ভয় পান এবং তৎক্ষণাৎ বাইরে এসে পাহারাওলাকে বলেন রঞ্জিতকে যেন তখনি গিয়ে ডেকে আনে।

বাইরে থেকে ফিরে নিজের বাড়িতে ঢোকবার প্রায় সঙ্গে-সঙ্গেই একটি কঠিন হাত তাঁর মুখের উপর ক্লোরোফর্ম-ভেজা রুমাল চেপে ধরে। খানিক তিনি ধস্তাধস্তি করেন কিন্তু অল্পক্ষণের মধ্যে জ্ঞান হারান। জ্ঞান ফিরে আসার পর তিনি দেখেন একটি ঘরের মেঝেয় হাত-পা বাঁধা অবস্থায় পড়ে রয়েছেন এবং তাঁরই সামনের চেয়ারে পিছন ফিরে বসে টেবিল-ল্যাম্প জ্বালিয়ে একটি লোক কী যেন লিখে চলেছে। তাঁর জ্ঞান হবার পর তাঁর দিকে না-ফিরেই সেই লোকটি বিকৃত খসখসে গলায় বলে সে-ই আসল হত্যাকারী। ধনঞ্জয়কে ধরে এনে পুলিশকে সে জানাতে চায় তার শক্তির পরিমাণ। জানায় ধনঞ্জয়ের নিস্তার নেই, যদিও এখন সে মারবে না। কয়েকটি জরুরি কাজ শেষ করার পর কয়েকদিনের মধ্যেই ধনঞ্জয়কে সে হত্যা করবে; কারণ ধনঞ্জয় নাকি অনাবশ্যক অনধিকার চর্চা করেছে। এই বলে লোকটি টেবিল-ল্যাম্প নিভিয়ে একটি টর্চ জ্বালিয়ে এগিয়ে আসে। টেবিল-ল্যাম্প নেভাবার পর সমস্ত ঘর অন্ধকার হয়ে যায় এবং টর্চের আলো শুধু ধনঞ্জয়ের মুখে পড়ে। ফলে হত্যা-কারীর মুখটা তিনি একেবারেই দেখতে পাননি। হত্যাকারী তারপর আবার একটি ক্লোরোফর্ম-ভেজানো রুমাল তাঁর মুখে চেপে ধরে ধনঞ্জয়কে অজ্ঞান করে ফেলে। তারপর যখন ধনঞ্জয়ের জ্ঞান হয় তিনি দেখেন সন্ধে হয়ে গেছে, হাতে-পায়ে কোনো বাঁধন নেই, দক্ষিণ কলকাতার এক নির্জন পার্কে তিনি শুয়ে রয়েছেন। বলা বাহুল্য হত্যাকারী যে কলকাতার কোন রাস্তার উপর কোন বাড়িতে তাঁকে নিয়ে গিয়েছিলো এ-সম্বন্ধে কোনো ধারণাই ধনঞ্জয়ের নেই।

চতুর্দশ অধ্যায়

ঘুম ভাঙাব পর

সমস্ত রাত সঞ্জীব ঘুমোতে পারলো না। ক্রমাগত পায়চারি করে ঘুরেছে। মাঝেমাঝে জানালাব সামনে দাঁড়িয়ে সিগারেট টেনেছে, মাঝেমাঝে চেয়ারে বসেছে। কিন্তু কোনো অবস্থাতেই যেন স্বস্তি পায়নি।

গত কয়েক দিনকার ঘটনাস্রোত এমন বিভিন্ন নতুন খালে বয়েছে যে একসঙ্গে গুছিয়ে ভাবাই কঠিন। তাব মাথায় ঐ সব ঘটনাগুলি টুকরো-টুকরো হয়ে ক্রমাগত ঘুরপাক খাচ্ছে। এক-একবাব তাব মনে হয়েছে সে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে আর তার চারিদিকে অসংখ্য কাগজের কুচি ঝরে-ঝরে পড়ছে। সেই সব কাগজগুলো একত্র করে সাজিয়ে নিতে পারলেই একটা পুরো বই হয়ে যায়। কিন্তু অত ছেঁড়া কাগজ জোড়া দেওয়া তো সহজ কথা নয়। সে যেন দিশেহারা হয়ে গেছে।

তাব বাবা মাধবের খুন হয়ে যাওয়া পর্যন্ত বেশ বোঝা যায়। তাব বাবাকে নিয়ে পরপর যে তিনটি হত্যাকাণ্ড ঘটলো তাদের মধ্যে একদিক দিয়ে একটি মিল সে আবিষ্কার করেছে। কিন্তু তারপর থেকেই সমস্ত কিছু উলট-পালট হয়ে গেলো।— হত্যাকারী বলে তাকে রঞ্জিতের সন্দেহ, ধনঞ্জয় কবিরাজের চার

নম্বরের চাক্তি পাওয়া, দেওঘরে সেই শিখের সঙ্গে দেখা, তার পাঁচ নম্বরের চাক্তি পাওয়া, এদিকে ধনঞ্জয়কে চুরি করে নিয়ে পালানো, ধনঞ্জয় চুরি যাবার আগে সেই চিঠি পাওয়া, পাহারা সত্ত্বেও ধনঞ্জয়ের বাড়িতে হত্যাকারীর প্রবেশ, ধনঞ্জয়ের মুক্তি - কোনো ঘটনার সঙ্গে কোনোটির যেন মিল নেই।

ভালো করে সে অনেকবার ভাবতে চেষ্টা করেছে। মাধব যে-রাত্রে খুন হোলো সে-রাত্রেই সঞ্জীব কলকাতা ছাড়ে। তার পরের দিন পৌঁছয় দেওঘর এবং তার পরের দিন—অর্থাৎ কলকাতা ছাড়ার পর দ্বিতীয় দিন রাত্রে সেই শিখের সঙ্গে তার দেখা হয়। এদিকে যে-রাত্রে সঞ্জীব কলকাতা ছাড়লো তার-পরের দিন ভোর বেলাতেই ধনঞ্জয় চুরি গেলেন। তারপর ছাড়া পেলেন সঞ্জীব যে-সন্ধ্যেয় কলকাতায় এসে পৌঁছলো তার আগের সন্ধ্যেয়। ধনঞ্জয় বলেছেন হত্যাকারীর মুখ তিনি দেখতে পাননি। কিন্তু হত্যাকারী যে সেই শিখবেশী লোকটি তাতে কোনো সন্দেহ নেই। যদি তাই হয় তা হলে মাত্র এই কয়েক দিনের মধ্যেই সেই লোকটিকে কলকাতায় ধনঞ্জয়কে চুরি করতে হয়েছে এবং তারপরেই দেওঘরে এসে সঞ্জীবকে শাসাতে হয়েছে। সঞ্জীবকে শাসিয়ে কলকাতায় ফিরেই বন্দী ধনঞ্জয়কে ভয় দেখিয়ে তারপর তাকে অজ্ঞান করে পার্কে দিয়ে গেছে নামিয়ে। অর্থাৎ যেদিন ভোরে সঞ্জীব দেওঘর থেকে কলকাতায় যাত্রা করলো তার আগের দিন ভোরে সেই হত্যাকারী ফিরে এসেছে

কলকাতায়। -এই ঘটনাগুলির খবরই শুধু সঞ্জীব জানে। কিন্তু এগুলিকে গুছিয়ে, সব ঘটনাগুলিকে খাপ খাইয়ে সে কোনো একটি অনুমানও সমস্ত রাত ধরে ভেবে দাঁড় করাতে পারলো না। যতই ভাবতে লাগলো সমস্ত ব্যাপারটা ততই যেন গুলিয়ে যেতে লাগলো। শেষরাতে তার অবসন্ন মন আর ক্লান্ত দেহ আর যেন সক্রিয় রইলো না। বিছানায় সে গা ঢেলে দিলো আর পরের মুহূর্তেই গভীর নিদ্রায় হয়ে গেলো আচ্ছন্ন।

ঘুম যখন ভাঙলো প্রথমে সে কিছুই ভালো করে বুঝতে পারলো না। সে কোথায় রয়েছে, কেনই বা রয়েছে, কিছুই তার মনে নেই। কী ঘুমটাই না সে ঘুমিয়েছে! এতো ঘুম যে কোথাও আছে সে-খবর তার জানা ছিলো না।

ঘড়িতে দেখলো বিকেল চারটে বাজে। এতোক্ষণ বিশ্রামের পর তার মাথার মধ্যেটা অদ্ভুত পরিষ্কার হয়ে গেছে। ধীরে-ধীরে আগেকার সব কথাগুলো তার মনে পড়তে লাগলো আর খানিক পরে একটি সম্ভাবনা বিদ্যুতের মতো যেন বয়ে গেলো তার মাথার মধ্যে! উত্তেজিত হয়ে সে উঠে বসলো। —ঠিক, ঠিক তাই। এতোক্ষণে হত্যাকারীর সন্ধান সে পেয়েছে। হত্যাকারীকে চিনেছে সে! হত্যাকারী ভারি চালাক সন্দেহ নেই। কিন্তু অতিরিক্ত চালাকি করতে গিয়েই সে ধরা পড়ে গেছে! ধনঞ্জয়ের নামে শাদা চাক্তিটা পাঠানো খুবই চালাকি হয়েছে সন্দেহ নেই—কিন্তু একটু বেশি চালাকি করে সে ফেলেছে!

আজ সন্ধেতেই ধনঞ্জয়ের কাছে সে যাবে। যেমন করেই হোক, ধরা পড়ার যত সম্ভাবনাই থাকুক না কেন সে যাবেই। এ ছাড়া অন্য পথ নেই।

মেধোকে বাড়ি থেকে তার মা বেরুতে দেন নি। কী জানি হাবা ছেলে বাইরে কারুর কাছে যদি সঞ্জীবের কথাটা ফাঁস করে দেয়। মুখ চুণ করে সমস্তক্ষণ তাই সে বাড়িতেই বসে আছে। তাকে ডেকে সঞ্জীব বললো, "একটা চিঠি দিলে সেটা নিয়ে তুই শ্যামবাজারের একটা বাড়িতে যেতে পারবি ?"

শ্যামবাজারে বহুবার মেধো গেছে। বেরুতে পারার আশায় সে জানালো নিশ্চয়ই পারবে।

সঞ্জীব আর কোনো কথা বললো না। কাগজ আর কলম নিয়ে খসখস করে দ্রুত হাতে সে দীর্ঘ চিঠি লিখলো। চিঠিটা খামে ভরে তার উপর স্পষ্ট করে লিখলো মনোতোষের নাম আর ঠিকানা। তারপর বাড়িটা ঠিক কোনখানে মেধোকে বুঝিয়ে দিয়ে যখন রওনা করে দিলো তখন ছটা বেজে গেছে। মেধো যাবার আগে সঞ্জীব আর একবার তাকে সাবধান করে দিলো, "দেখিস, চিঠিটা যেন আর কারুর হাতে না পড়ে। অন্য কারুর হাতে পড়লেই পুলিশে তোকে ধরে নিয়ে গিয়ে ফাঁসি দেবে।"

মেধো চলে যাবার পর মাধবের মা'র তৈরি সিঙাড়া আর গরম দু পেয়ালা চা খেয়ে বেরুবার জন্যে সঞ্জীব যখন তৈরি হয়ে নিলো তখন আবার আকাশ কালো হয়ে এসেছে। প্রায় সাতটা বাজে। দিনের আলো মিলিয়ে গেছে। রাত হতে আর বৃষ্টি নামতে বিশেষ দেরি নেই। পথে-পথে গ্যাসের আলোগুলো একে-একে জ্বলে উঠলো।

পঞ্চদশ অধ্যায়

অতি-বুদ্ধির গলায় দড়ি

বেশ অন্ধকার হয়ে গেছে।

বৃষ্টি-ভেজা শঙ্কর মিত্র স্ট্রিটের এখানে-সেখানে গ্যাসের আলো জ্বলে উঠেছে। কিন্তু সেই অল্প আলোয় খুব ভালো করে কিছু নজরে পড়ে না। পথে লোকজন যথাসম্ভব কম চলছে। সমস্ত আবহাওয়া অস্বাভাবিক রকম ঠাণ্ডা।

ধনঞ্জয় কবিরাজের ঘরে আলো জ্বলছে। দূর থেকে সেই আলো একটি চাদর-ঢাকা মূর্তি লক্ষ্য করলো।—যাক, কবিরাজকে ঘরের মধ্যেই পাওয়া যাবে। নিশ্চিন্ত হোলো সেই মূর্তি. সেই মূর্তি আর কেউ নয়: সঞ্জীব। বৃষ্টি-ভেজা এই রাত্রের অস্পষ্ট আলোয় তাকে একেবারেই চেনবার উপায় নেই।

ধনঞ্জয়ের বাড়ির কাছে শুধু একটি লোক ঘোরাঘুরি করছে। সঞ্জীব বুঝলো সে আর কেউ নয়—পুলিশের লোক, নিশ্চয় ধনঞ্জয়কে পাহারা দেবার জন্য সে মোতায়েন হয়েছে। তাকে এড়িয়ে কোনো রকমে কবিরাজের বাড়ি ঢুকতে হবে।

অল্পক্ষণের মধ্যেই সুযোগ এলো। লোকটি অল্প দূরের পানের দোকানে গিয়ে ধনঞ্জয়ের বাড়ির দিকে পিঠ করে দাঁড়িয়ে জ্বলন্ত দড়ির আগুন থেকে সিগারেট ধরাতে লাগলো। বেশিক্ষণ

অবশ্য সে পিছন ফিরে ছিলো না। কিন্তু সেই সময়টুকুই সঞ্জীবের পক্ষে যথেষ্ট। দরজাটা খোলাই ছিলো। ঠেলে ভিতরে ঢুকে ভিতর থেকে নিজে হাতেই বন্ধ করে দিলো সঞ্জীব। কিন্তু ভালো করে লক্ষ্য করলে দেখা যেতো সঞ্জীবের অসাবধানতায় ছিটকিটা ঠিক লাগেনি। বাইরে থেকে ঠেলা দিলেই খুলে যাবে।

ধনঞ্জয় নিজের ঘরেই ছিলেন। একটি চেয়ারে বসে গভীর মনোযোগ দিয়ে বই পড়ছিলেন। সঞ্জীবের পায়ের শব্দে এবং দরজার ছিটকি তোলার আওয়াজে তিনি চোখ তুললেন। চাদর খুলতে সঞ্জীবকে চিনতে পেরে তিনি বিস্মিত হলেন, কিন্তু চমকে উঠলেন না।

উঠে দাঁড়িয়ে শান্ত গলায় বললেন, "সঞ্জীব নাকি? এসো এসো! কেউ দেখতে পায়নি তো?"

সঞ্জীব বললো, "না।"

"এঃ, এ কী চেহারা হয়েছে তোমার? কোথায় লুকিয়ে ছিলে? আমি জানতুম তুমি বুদ্ধিমান, অন্তত আমার কাছে লুকিয়ে আসবেই আসবে। আরো আগে আসা উচিত ছিলো।"

"সে-কথা জানি কবিরাজমশাই। কিন্তু হঠাৎ যেন মাথা গোলমাল হয়ে গেলো। আমাকে ধরবার ভয় দেখাতে পালাতে বাধ্য হলুম। নিজের জন্যে নয়, অন্য চার জন ভদ্রলোককে বাঁচাবার কথাই ছিলো আমার মনের মধ্যে সবচেয়ে আগে।

আমি অনেক কথা জেনেছি কবিরাজমশাই। আপনার সঙ্গে পরামর্শ করতে চাই। তাই বিপদ মাথায় করেই এলুম। যে চারজনকে বাঁচাবো ভেবেছিলুম খবর নিয়ে জেনেছি আগেই তাঁদের মৃত্যু হয়েছে।"

ধনঞ্জয় কবিরাজ বললেন, "সেদিনও তুমি যেন কাদের নাম বলেছিলে। কোন ডাক্তারের কথাও যেন বলছিলে। কিন্তু গোড়া থেকে সবটা না শুনলে আমি তো কিছুই বুঝতে পারবো না। একে-একে সব কথা আমাকে খুলে বল। কিন্তু তার আগে আমরা এ-ঘর থেকে উঠে দোতালার ঘরে যাই। তুমি আমার সব বিপদের কথাও বোধ হয় জানো। আমি বুড়ো হয়েছি, মরতে কোনো ভয় নেই। কিন্তু আমার চেয়ে দেখছি পুলিশের ভয়টাই বেশি। একজন পাহারাদার তারা ঠিক করেছে আর আমি ঠিক বেঁচে আছি কিনা জানবার জন্যে মাঝেমাঝে সেই ভদ্রলোক খবর নিয়ে যাচ্ছেন। খবর নিতে এসে তোমাকে দেখলে বোধ হয় ফল ভালো হবে না। তাই ওপরের ঘরে যাওয়াই ভালো।"

সঞ্জীব বললো, "বেশ তো। ওপরে চলুন।"

তারা উপরে এলো। একটি চেয়ারে সঞ্জীবকে বসিয়ে ধনঞ্জয় কবিরাজ বললেন, "কিন্তু আগে তুমি কিছু খাও। হয় গরম এক পেয়ালা কোকো কিংবা চা।"

সঞ্জীব দোতালার ঘরে বসে রইলো। সিঁড়িতে ধীরে-ধীরে

মিলিয়ে গেলো ধনঞ্জয় কবিরাজের পায়েব শব্দ। পাশেব জানালাব কাঁচেব ভিতব দিয়ে তাদেব বাড়ির দোতালাব ঘরটা দেখা যায়। ওই ঘবে তাব বাবা থাকতো, ওই ঘবেই সেই রাত্রে সে খুন হয়েছে।

ভাবতে-ভাবতে কেমন যেন অস্বস্তি হতে লাগলো সঞ্জীবেব। সে চোখ ফিবিযে নিলো। ঘবেব ভিতব জানালাটাব ঠিক পাশে দেয়ালেব উপব একটা এয়াব-গান টাঙানো রয়েছে। আগেও অনেকবাব সেটা সঞ্জীব দেখেছে। পাখী তাড়াবাব জন্যে ধনঞ্জয় ওটা কিনেছিলেন। বাইরে থেকে চোখ ফিবিযে সেটার দিকে নজব পড়তে সঞ্জীব আজ যেন নতুন করে সেটা আবিষ্কাব কবলো। দেযাল থেকে সেটা পেড়ে নেড়েচেড়ে দেখাব আগ্রহও তাব হোলো। কিন্তু এই ছেলেমানুষী কৌতুহল দমন করলো। তাবপব সিঁড়িতে আবাব শোনা গেলো পাযেব শব্দ। দবজাব কাছে এসে থামলো সেই শব্দ এক মুহূর্তের জন্যে তাবপর ঘরে ঢুকলো।

আচমকা উত্তেজনায় সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে উঠলো সঞ্জীব। কোথায় ধনঞ্জয় কবিরাজ? তার সামনে দাঁড়িয়ে বয়েছে এক দীর্ঘ-দেহী শিখ! তার লাল দাড়ি, তাব মাথায় ইয়া বড় পাগড়ি, তার গালে মস্ত বড় কাটার একটি দাগ! তার চোখ দুটো যেন জ্বলন্ত দু'টুকরো কয়লা ধ্বকধ্বক করছে!

এই শিখেব সঙ্গেই যে দেওঘবে তার দেখা হয়েছিলো তাতে আব ভুল নেই।

"শুভ সন্ধ্যা সঞ্জীববাবু", কর্কশ তীক্ষ্ণ অথচ চাপা গলায় সেই শিখ বললো, বললো পরিষ্কার বাংলাতেই! "দাঁড়িয়ে উঠলেন কেন? বসুন! আবার তা হলে দেখা হয়ে গেলো!" তারপর সঞ্জীবের সামনে চেয়ার টেনে নিয়ে বসে পকেট থেকে শাদা গোল একটি জিনিস বার করে শূন্যে ছুঁড়েই আবার লুফে নিলো। বললো, "এটা কিছু নয়, সামান্য একটা হাতবোমা। নিজে হাতে বানিয়েছি। হাত ফস্কে মাটিতে পড়লেই আপনার আমার আর এই বাড়িটার কোনো চিহ্ন খুঁজে পাওয়া যাবে না! নিতান্ত নিরীহ চেহারা বটে, ন্যাকড়ার পুঁটলির মতোই দেখতে—কিন্তু ভেতরটা সাঙ্ঘাতিক! অনেকটা আমারই মতো।" বলে লোকটা হেসে উঠলো। তার হাসি শুনলে যে-কোনো লোকের সর্বাঙ্গ শিউরে ওঠে।

খুব ভালো করে সঞ্জীব সেই শাদা হাত-বোমাটাকে লক্ষ্য করছিলো। লোকটির কথা বলা শেষ হলে নিঃশব্দে সে চেয়ারে বসে পড়লো তারপর অত্যন্ত সংযত গলায় বললো, "ধন্যবাদ! বসছি। কিন্তু আপনার হাতে বোমাই বা কেন আর ধনঞ্জয় কবিরাজেরই বা কী হোলো?"

"বোমা বোমার জন্যে! পিস্তলের চেয়ে অনেক বেশি আমি পছন্দ করি, বিশেষ করে নিজের জীবনের কোনো পরোয়া যখন আমি করি না! আর ধনঞ্জয় কবিরাজ? তাঁর দেহটা নীচে পড়ে আছে বটে কিন্তু তিনি অনেক দূরে চলে গেছেন।" বলে সেই

শিখ আকাশের দিকে আঙুল তুলে বোঝাবার চেষ্টা করলো ধনঞ্জয় কবিরাজ কোথায় গেছেন।

"কিন্তু কবিরাজমশাইকে হত্যা করলেন কেন?"

"কারণ তিনি চার নম্বর লেখা শাদা চাক্তি পেয়েছিলেন?"

"আমিও তো পাঁচ নম্বর লেখা চাক্তি পেয়েছি। আশাকরি এবার আমার পালা।"

"ঠিক ধরেছেন। আমার পাঁজিতে আজ আপনাদের দু'জনেরই একত্রে মৃত্যুর সংবাদ ছাপা হয়ে আছে। তাই ইতিপূর্বে আপনাদের দু'জনকে হাতে পেয়েও হত্যা করিনি। আজ এক ঢিলে দু'টো পাখী মারবো। আপনি যে ধনঞ্জয় কবিরাজের সঙ্গে আজ দেখা করতে আসবেন সে-খবর জানতুমই। তাই অপেক্ষা করছিলুম। আপনাদের দু'জনকে একই জায়গায় হত্যা করার অন্যান্য কারণের মধ্যে একটি জেনে রাখুন: আসলে আপনাদের দু'জনেরই অপরাধ প্রায় এক জাতের—দু'জনেই কিছু বেশি জেনে ফেলেছিলেন। ধনঞ্জয় কবিরাজ আপনার কিছু আগে যাত্রা করলেও আশাকরি পথেই তাঁকে ধরে ফেলতে পারবেন।"

সঞ্জীব বললো, "আমাকে যখন হাতের মুঠোয় সম্পূর্ণ নিরস্ত্রভাবেই পেয়েছেন তখন আশাকরি আমার কয়েকটি প্রশ্নের উত্তর দেবেন—আপনিই তা হলে সেই মৃত্যুঞ্জয় ডাক্তার?"

শিখ আবার হেসে উঠলো। "আপনার বুদ্ধির তারিফ

করছি সঞ্জীববাবু। যাক, পৃথিবীতে অন্তত একজন চালাক লোক আছে যে আমার সঙ্গে পাল্লা দিতে পারবে! কিন্তু এইখানে আপনার একটু ভুল হয়েছে। অবশ্য তার জন্যে আপনাকে আমি দোষ দিই না। কিন্তু আমি মৃত্যুঞ্জয় ডাক্তার নই। তাঁর মৃত্যু হয়েছে—"

"কিন্তু আপনি যে-ই হোন, কোনো শিখ ভদ্রলোক নন! এটা আপনার ছদ্মবেশ।"

"ঠিক ধরেছেন। এটা আমার ছদ্মবেশ বৈকি। আমি সেই মৃত্যুঞ্জয় ডাক্তারের একজন নিকট বন্ধু। আমার হাতেই প্রতিশোধ নেবার ভার দিয়ে মৃত্যুঞ্জয় গিয়েছেন। আমি শিখও নই, ভদ্রলোকও নই। ভদ্রলোক আজকের পৃথিবীতে কেউ আছে নাকি? সভ্যতাই বা আছে কি? সুবিচারই বা আছে কি? থাকলে মৃত্যুঞ্জয়ের জীবন কি এ ভাবে আজ ছারখার হয়ে যায়? অনর্থক একটি আশ্চর্য প্রতিভাবান ডাক্তারকে নির্মমভাবে জেল খাটানো হয় আর জেলের বাইরে তার স্ত্রী, তার ছেলেমেয়েদের একে-একে মৃত্যু হয় অভাব-অনটন আর অর্থাভাবে? যতবারই এই সভ্য সমাজের বিচারের কথা ভাবি ততবারই আমার মাথায় আগুন ধরে যায়। মনে হয় একে-একে সবাইকে শেষ করি, এই সভ্যতার পরিহাসকে ধুলোয় লুটিয়ে দিই!"

লোকটি যতক্ষণ কথা কইছিলো খুব মনোযোগ দিয়ে সঞ্জীব শুনতে লাগলো তার কথা। আর ভাবতে লাগলো কী করে এই

পাগলের হাত থেকে উদ্ধার পাওয়া যায়। একবার মেধো'র হাতে-পাঠানো চিঠির কথাটা ভাবলো। একবার মনে হোলো যদি সেই চিঠির উপদেশ মতো কাজ না হয়, তা হলে? কিন্তু সব-চেয়ে আগে দরকার এই লোকটিকে থামতে না দেওয়া। কথা বলতে-বলতে সে ভয়ানক উত্তেজিত হয়ে পড়ে। যতক্ষণ তার ঐ কথা বলবার নেশা থাকবে ততক্ষণ সে নিরাপদ।

"আপনার কথা বুঝলুম। কিন্তু এখনো কয়েকটা ব্যাপারে আমার একটু খটকা আছে। জয়কৃষ্ণবাবুর হত্যাকাণ্ডটা আমার কাছে পরিষ্কার। আপনিই শিখ সেজে বাড়ির চাবি নিয়ে সেই চোরা-কুঠরিতে বিষাক্ত বোমা রেখে এসেছিলেন, তারপর টেলি-ফোনে পরিতোষবাবুকে বলেছিলেন আপনি আনন্দমোহন কথা কইছেন, চাবিটা যেন জয়কৃষ্ণবাবুকে দেওয়া হয়। তারপর জয়-কৃষ্ণবাবুর মৃত্যুটা খুব আশ্চর্য লাগে না। কিন্তু রমেনবাবুকে কী করে হত্যা করলেন? তাঁর পিঠে যে ছুরি বিঁধেছিলো সেটার তো কোনো হাতল ছিলো না!"

"ওঃ, এই ব্যাপার? এই সামান্য বিষয়টা বুঝতে পারছেন না?" বলে আবার হেসে সেই লোকটি পকেট থেকে কাঠের একটা হাতল বার করলো। "এই হাতলে একটা ফুটো আছে। সেই ফুটোয় ছোরার ফলার উল্টো দিকের স্টিলের ছুঁচলো অংশটা ঢুকিয়ে পিঠে বিঁধিয়েছিলুম। ছোরাটা শরীরে গেঁথে রইলো, তুলে আনবার সময় সেই হাতলটাই শুধু উঠে এলো।"

যতক্ষণ সে কথা বলছিলো তার মধ্যে বার দুয়েক সঞ্জীব তার মাথার উপর দিয়ে পিছনে চকিত দেখে নিলো। কথা শেষ হবার পর বললো, "বুঝলুম! কিন্তু অনেকক্ষণ সিগারেট খাইনি। একটা খেতে পারি কি?"

"স্বচ্ছন্দে," সেই লোকটি উত্তর দিলো, "কিন্তু পকেট থেকে সিগারেট আর দেশলাই শুধু বার করবেন, আর কোনো চালাকি করবেন না। হাত-বোমাটার কথা স্মরণ রাখবেন। ভারি সুবিধের এই জিনিসটা। টিপ করতে হয় না। হাত থেকে একবার মেঝেয় ফেলে দিলেই কাজ শেষ হয়।"

পকেট থেকে সিগারেট ধরিয়া সঞ্জীব দীর্ঘ একটি টান দিলো। তারপর প্রশ্ন করলো, "কিন্তু আমাকে কী ভাবে হত্যা করবেন তা তো বললেন না।"

আবার হোহো করে হেসে উঠলো সেই লোকটি। "আমার কাজ শেষ হয়েছে। মৃত্যুঞ্জয় ডাক্তারের অনুরোধ অক্ষরে-অক্ষরে পালন করেছি। আবার আমি হাওয়ায় মিলিয়ে যাবো। আমি কে, কোথা থেকে এসেছি, কোথায় বা গেলুম সে-কথা আর কেউ জানবে না। কিন্তু যাবার আগে আপনাকে হাত-পা বেঁধে এই ঘরে ফেলে রেখে যাবো। আপনার মাথার কাছে থাকবে এই বোমা। নীচের তলায় গিয়ে পেট্রোল দিয়ে আগুন ধরিয়ে দেবো। মিনিট দশেকের মধ্যে আপনার আর কোনো চিহ্ন থাকবে না।—আপনিই একমাত্র চালাক লোক ঠিক আ

করেছিলেন। তাই আপনার পক্ষে পৃথিবীতে আর না থাকাই মঙ্গল। কারণ মাঝেমাঝে আমি হাওয়ায় মিলিয়ে যাবো, কিন্তু মাঝেমাঝে আবার আত্মপ্রকাশ করবো। দেখি বুদ্ধির লড়াইতে পৃথিবীর সমস্ত পুলিশ আর তুমি আমার চুলের ডগা স্পর্শ করতে পারে কিনা!"

সঞ্জীব আরো দুয়েকবার সিগারেটে জোরে টান দিলো, তারপর হঠাৎ একটু উঁচু স্বরে বললো, "আসুন রঞ্জিতবাবু। আর অপেক্ষা করার দরকার নেই।"

চমকে ফিরে দাঁড়ালো সেই শিখ বেশী লোক। কিন্তু ততক্ষণে দরজার পিছন থেকে রঞ্জিত তার হাতে হাতকড়া পরিয়ে দিয়েছে। তার সঙ্গে আরো কয়েকজন পুলিশের লোক। পিছনে মনোতোষ।

সঞ্জীব বললো, "যাক! চিঠিটা ঠিক সময়েই পেয়েছিলেন আর আমাকে বিশ্বাস করে এসেছিলেন! বাইরের দরজাটা খোলাই ছিলো, ঢুকতে আশাকরি অসুবিধে হয়নি। দরজাটা বন্ধ করার অভিনয় করেছিলুম মাত্র, আসলে ছিটকিনি লাগাইনি। কবিরাজমশাই আমাকে দেখে এতোই চমকে গিয়েছিলেন যে এই সামান্য তুচ্ছ ব্যাপারটা লক্ষ্যই করেননি।"

রঞ্জিত বললো, "কিন্তু বোমাটা আগে সরিয়ে ফেলা দরকার।"

হেসে সঞ্জীব বললো, "কিছু ভয় পাবেন না! আসলে ওটা ন্যাকড়ার পুঁটলি, বোমা নয়। ভালো করে লক্ষ্য করে আমি

দেখেছি। আসল বোমার বাইরেটা যথেষ্ট নিরীহ হয় সত্যি তবে ওরকম হয় না। এই শিখ ভদ্রলোককে সবাই আপনারা চেনেন, ইনি আর কেউ নন, স্বয়ং কবিরাজমশাই। একটা স্পঞ্জ জলে ভিজিয়ে এঁর মুখ আর দাড়ির ওপর ঘসলেই অসল চেহারাটা বেরিয়ে পড়বে। দাড়িগুলো তবে ধনঞ্জয় কবিরাজের শাদা দাড়ি আর মুখের কাটা দাগের কোনো চিহ্নই থাকবে না। সত্যিই তারিফ করতে হয়! এতো অল্প সময়ের মধ্যে এতো সুন্দর ছদ্মবেশ ধরা ভারি আশ্চর্য কাণ্ড, কোনো সন্দেহ নেই। কবিরাজ-মশাইকে বসতে দিন। অনর্থক দাঁড় করিয়ে রাখবেন না। কিন্তু এঁর আসল পরিচয় আপনারা বোধ হয় জানেন না। ইনিই হচ্ছেন আসল মৃত্যুঞ্জয় ডাক্তার। দশ বছর আগে দেওঘরে নিজের বাড়িতে আগুন দিয়ে ইনি পালিয়ে গিয়েছিলেন। মৃত্যুঞ্জয়বাবু, আমার কোথাও ভুল হলে শুধরে দেবেন। সেই বাড়ির মধ্যে তিনি নিজে ছিলেন না। ছিলো এক তাল কাঁচা মাংস আর হাড় আর তাঁর হাতের সোনার আংটিটা। ফলে আগুন নেভাবার পর পোড়া-হাড় আর গলা-সোনা দেখে কারুরই সন্দেহ রইলো না মৃত্যুঞ্জয় ডাক্তারের মৃত্যু হয়েছে বলে। তারপর দুবছর যে কোথায় তাঁর কেটেছে কেউ জানেনা। ভেবে নেওয়া কঠিন নয় সেই দুবছরের মধ্যে তাঁর দাড়ি গজালো। চুলগুলোও তিনি বড়-বড় করে রাখলেন। ফলে চেহারাটা একেবারেই বদলে গেলো। —মনোতোষ, তোমাকে যে মৃত্যুঞ্জয় ডাক্তারের

একটি ছবি জোগাড় করতে বলেছিলুম সেটি কি পাওয়া গেছে?'

মনোতোষ বললো, "এই যে!" বলে পকেট থেকে একটি ফটো বার করে রঞ্জিতের হাতে দিলো।

ছবিটা ভালো করে দেখে সঞ্জীব বললো, "এই দেখুন রঞ্জিতবাবু, মিলিয়ে দেখুন। দাড়ি-গোঁফ বাদ দিলে ধনঞ্জয় আর মৃত্যুঞ্জয় যে একই লোক সে-কথা বুঝতে কষ্ট হয় না। তারপর আট বছর আগে এই শঙ্কর মিত্র স্ট্রিটে আবির্ভাব হোলো কবিরাজ ধনঞ্জয় শর্মার।—জয়কৃষ্ণবাবুকে খুন করার ব্যাপারটা সবাই জানেন। সেই শিখ ভদ্রলোক আর কেউ নন, ধনঞ্জয় শর্মা নিজে। তারপর রমেনবাবুর হত্যাকাণ্ডও ঘটান ইনি নিজের হাতে। তার প্রমাণ এঁর পকেটে রয়েছে সেই তোবার হাতলটা। তারপর এলো বাবার পালা।

"এই জানলা দিয়ে আপনারা চেয়ে দেখুন—বাবার শোবার ঘরটা সম্পূর্ণ দেখা যায়। আর দেয়ালের গায়ে এই ছোট্ট এয়ার-গানটা লক্ষ্য করুন। অনুমান করা খুব কঠিন নয় যে ঐ বন্দুকের নলের ওপর ইনজেকসন দেবার ছুঁচে মারাত্মক বিষ লাগিয়ে এখান থেকে বাবার পিঠে টিপ করে ছোঁড়া খুব সহজ একটি ঘটনা। তারপর ভাঙা একটি সিরিঞ্জ আমাদের বাড়ির ফুটপাথে ছুঁড়ে ফেলাও শক্ত নয়। এতোদূর পর্যন্ত ইনি আশ্চর্য চালাকি দেখিয়েছেন আমাদের সঙ্গে

বহুদিনকার পরিচয়ের সুযোগ নিয়ে আমাদেরই টাইপ রাইটারে চিঠি ছাপা এবং আমাদেরই কলম এবং কালিতে শাদা চাক্তির ওপর নম্বর লেখা একমাত্র এঁর পক্ষেই সম্ভব। ফলে বরাবর সন্দেহটা এসে পড়েছে আমারই ওপর। কিন্তু তারপরেই মৃত্যুঞ্জয় ডাক্তার অত্যন্ত চালাকি করতে গিয়ে মস্ত ভুল করলেন আমার ওপর সন্দেহ যাতে পুলিশের আরো দৃঢ় হয় সে জন্যে নিজেই নিজের ঘরের টেবিলের ওপর রেখেছিলেন এই চার নম্বর লেখা চাক্তিটা। উনি যখন বাবাকে দেখতে আসার জন্যে আমার সঙ্গে তাঁর বাড়ি থেকে বেরোন সেই সময় চাক্তিটা তিনি রেখে গিয়েছিলেন। আর ওই ব্যাপারেই কবিরাজমশাইয়ের ওপর সন্দেহ আমার প্রথম হোলো। তাঁকে কেউ হত্যা করতে চাইবে কেন? তিনি তো ঐ জুরিদের মধ্যে কেউ ছিলেন না। তবে। এর একমাত্র কারণ হতে পারে আমাকে ধোঁকা দেওয়া এবং আমার ওপর পুলিশের সন্দেহ যাতে আরো দৃঢ় হয় তার ব্যবস্থা করা।

"তারপর মৃত্যুঞ্জয় ডাক্তার আবার কতকগুলি চালাকি করলেন। আমি গা ঢাকা দিয়ে যে কলকাতার বাইরে পালাবার চেষ্টা করবো আর কলকাতার বাইরে বলতেই প্রথমেই যে আমার মনে দেওঘরের কথা আসবে সে-কথা অনুমান করা তাঁর মতো বুদ্ধিমান লোকের পক্ষে মোটেই দুরূহ নয়। দেওঘরে পৌঁছলে প্রথম সুযোগেই যে আমি সেই পোড়া বাড়িটা দেখতে যাবো এটা

অনুমান করাও তো অত্যন্ত স্বাভাবিক ঘটনা। তিনি ঠিক করলেন আমার সঙ্গে দেওঘরে সেই দগ্ধস্তূপে দেখা করবেন। সম্ভবত তাঁর প্রধান কারন এই : তিনি জানতেন মৃত্যুঞ্জয় ডাক্তারের চালাকির কথা আমি জেনে ফেলেছি। তাই ধনঞ্জয় কবিরাজের নামে চার নম্বরের চাক্তির খোঁজটা পেয়েই আমার মনে হয়তো ধনঞ্জয় সম্বন্ধে একটা সন্দেহ জেগে উঠবে। যদি আমি তাঁর হাত থেকে কোনো রকমে পুলিশকে সে-সন্দেহের কথাটা একবার জানাই এবং সমস্ত ঘটনার কথাটা তাদের বুঝিয়ে বলি পুলিশ হয়তো ধনঞ্জয় কবিরাজকে বন্দী করে খোঁজ খবর নেবে। এবং খোঁজ নিলে আসল কথাটা যে বেরিয়ে পড়বে তাতে সন্দেহ কী? তাই আমার সঙ্গে দেখা করে আমার মন থেকে এই সন্দেহটা দূর করতে চেষ্টা করাই ছিলো তাঁর প্রধান উদ্দেশ্য। অথচ আমার ওপর পুলিশের সন্দেহ যাতে আরো গভীর হয় সে-জন্যে নিজেই তিনি নিজের ঘরের টেবিলে ওই চার নম্বর লেখা চাক্তিটা রেখে গিয়েছিলেন। চাক্তিটা রাখা খুবই বুদ্ধির পরিচয় হয়েছিলো সন্দেহ নেই। এক ঢিলে দুটি পাখীই তাতে মরেছিলো · প্রথমত আমার ওপর পুলিশের সন্দেহ দৃঢ় হওয়া এবং দ্বিতীয়ত ধনঞ্জয়কে পুলিশ যদি কখনো কোনো সন্দেহ করে থাকে ঐ চাক্তি দেখে সেটা দূর করা।

"কিন্তু এই বেশি চালাকিই তাঁর কাল হোলো। ঐ চাক্তিটা রাখার সময় তাঁর মনে এ-সম্ভাবনার কথাটা একবারও ওঠেনি যে

যে-হেতু এই সব হত্যাকাণ্ডের আসল কারণটা জেনে ফেলেছি সে-হেতু আমার কাছে ধনঞ্জয়ের চাক্তি পাবার ব্যাপারটা খুব বেশি আশ্চর্যজনক ঠেকবে এবং একটু ভাবলেই আমার মনে এই সন্দেহটা হওয়াই স্বাভাবিক হবে যে ঐ চাক্তি যাঁর কাছে এসেছে, তিনি জুরিদের ভেতর যদি কেউ না হন তা হলে তিনি কে ? তিনিই কি আসল হত্যাকারী নন এবং তিনিই কি চাইছেন না নিজের ওপর থেকে সবাইকার সন্দেহ দূর করতে ?

“যে-রাতে বাবার মৃত্যু হোলো সেটা সোমবারের রাত। সেই সোমবার রাতে বিছানায় শুয়ে-শুয়ে ধনঞ্জয় কবিরাজ এই সব কথাগুলিই চিন্তা করতে লাগলেন। তিনি হিসেব করে দেখলেন মঙ্গলবার সকালে যদি আমি দেওঘরে যাই তা হলে মঙ্গলবার রাত্রেই সেখানে আমি পৌঁছবো। তারপর বুধবার। বুধবার সকালেই দেওঘরে কলকাতার মঙ্গলবারের খবরের কাগজ বিলি হয়। মঙ্গলবারের কাগজেই সোমবার রাত্রে আমার বাবার মৃত্যু-সংবাদ এবং ধনঞ্জয় কবিরাজের চার নম্বরের চাক্তি পাবার খবরটা ছাপা হবে। সে-খবর দেওঘরে বসে আমি তা হলে বুধবার সকালে পাবো। চার নম্বরের চাক্তি পাবার খবরটা পেয়েই যদি ধনঞ্জয়কে আমি সন্দেহ করি এবং টেলিগ্রামে বঙ্কিমবাবুকে সব কথা জানাই তা হলে বুধবার দুপুরের মধ্যেই হয়তো বঙ্কিমবাবু কবিরাজমশাইকে বন্দী করবেন। অতএব বুধবারের আগেই কবিরাজমশাই-এর গা ঢাকা দেওয়া দরকার। এদিকে বুধবারের

মধ্যে আমার সঙ্গে দেখা করে তিনি যদি শিখের ছদ্মবেশে আমাকে আবার ভুল পথে চালাতে পারেন তা হলে হয়তো আমার মনেও ধনঞ্জয়ের ওপর কোনো সন্দেহ থাকবে না। বিশেষ করে আমি যখন শুনবো ধনঞ্জয় কবিরাজ নিখোঁজ হয়েছেন এবং সেই শিখবেশী হত্যাকারীই তাঁকে ধরে রেখেছেন তখন আমার পক্ষে ধনঞ্জয়কে সোজাসুজি সন্দেহ করা বেশ কঠিন হয়ে পড়বে। তাই তিনি ঠিক করলেন মঙ্গলবার ভোরের ট্রেনে তিনিও দেওঘরে যাত্রা করবেন। কিন্তু নিজের ফাঁদে নিজেই তখন তিনি পড়েছেন। তার বাড়ির সামনে পুলিশের পাহারা। সেই পাহারা এড়িয়ে কী করে বাড়ির বাইরে তিনি আসতে পারেন? ভাবতে-ভাবতে বুদ্ধিটা খুলতে মোটেই তাঁর দেরি হোলো না। নিজে হাতেই টাইপ করে ঐ চিঠিটা তিনি নিজের টেবিলে রাখলেন তারপর বাইরে গিয়ে পাহারাওলাকে বললেন শিগগীর রঞ্জিতবাবুকে ডেকে আনতে--ভয়ঙ্কর কাণ্ড ঘটেছে। লোকটি কোনো রকম সন্দেহ না করে গেলো রঞ্জিতবাবুকে ডেকে আনতে আর সেই সুযোগে ছোটো একটি স্যুটকেস হাতে নিয়ে শেষ রাতের ঘুমন্ত সহরের মধ্যে তিনি বিনা বাধায় সরে পড়লেন এবং যথাসময়ে সকালের ট্রেনে উঠে বসলেন।'

"এই দিনগুলো এবং ঘটনাগুলোর কথা ভালো করে চিন্তা করলেই কবিরাজমশাই-এর ওপর সন্দেহটা পড়ে কিনা দেখুন। সোমবার রাতে বাবার মৃত্যু হয় এবং আমি পালাই। মঙ্গলবার

সকালেই কবিরাজমশাই নিখোঁজ হন। মঙ্গলবার রাত্রে আমি দেওঘরে পৌঁছই, বুধবার সকালে খবরের কাগজে খবরটা পড়ি এবং সন্ধেয় সেই দগ্ধস্তূপে গিয়ে শিখের দেখা পাই। মঙ্গলবার কবিরাজমশাই নিখোঁজ থাকেন, বুধবারও নিখোঁজ থাকেন। অনুমান করা যেতে পারে মঙ্গলবার কলকাতা থেকে তিনিও দেওঘরে যাত্রা করেন, মঙ্গলবার সন্ধেয় পৌঁছন, বুধবার সকালেই আমার খোঁজ করেন এবং আমার ওপর নজর রাখেন, বুধবার সন্ধেবেলায় শিখ সেজে আমার সঙ্গে দেখা করেন। বৃহস্পতিবার সকালে আমি কলকাতার বুধবারের খবরের কাগজ পাই এবং ধনঞ্জয় কবিরাজের চুরি যাবার খবরটা পড়ি। এদিকে বুধবার সকালেই ধনঞ্জয় কবিরাজ কলকাতায় যাত্রা করেন এবং সন্ধেয় কলকাতায় পৌঁছে বাড়ি ফেরেন এবং ঐ কাল্পনিক গল্পটি পুলিশকে জানান।—"

এইখানে রঞ্জিত প্রশ্ন করলো, "কিন্তু আপনাকে যদি শেষ পর্যন্ত হত্যা করারই কবিরাজমশাই-এর—এখন থেকে মৃত্যুঞ্জয়ই বলবো—ইচ্ছে ছিলো তা হলে দেওঘরে অমন নির্জন জায়গায় পেয়েও হত্যা করলেন না কেন?"

চেয়ারের উপর সোজা হয়ে বসেছিলো মৃত্যুঞ্জয় ডাক্তার। রঞ্জিতের প্রশ্ন শুনে একটু হেসে বললো, "এ প্রশ্নের উত্তর আমিই দেবো। ভেবেছিলুম তিনটি হত্যাকাণ্ড যখন শঙ্কর মিত্র স্ট্রিটেই হোলো চতুর্থটিও হোক এই রাস্তারই ওপর। তা হলে সমস্ত

ঘটনার মধ্যে চমৎকাব একটি সঙ্গতি থাকে। আমি জানতুম সঞ্জীব এ-বাড়িতে আমার সঙ্গে দেখা কবতে আসবেই। তখন তাকে হত্যা করে ধনঞ্জয় কবিরাজের ছদ্মবেশ ছেড়ে চলে যাবো। ধনঞ্জয় কবিরাজেব খবব আব কেউই পাবে না।—কিন্তু শেষটায় দেখছি হারতেই হলো। কিন্তু এ হাবে আমার দুঃখ নেই। নিজেব হাতে নিজেই আমি প্রতিহিংসা নিতে পেরেছি। এবার কিন্তু আমাকে কেউ আর ধরতে পারবে না, আবাব ঐ বিচার আর জুরির প্রহসন ঘটতে আমি দোবো না।"

চেয়ারের উপর থেকে এক মুহূর্তের জন্যেও সে নড়লো না। শুধু তাব মুখেব ভিতব কুট কবে কিসেব যেন একটি শব্দ হোলো আর কয়েক মুহূর্তের মধেই নিস্পন্দ হয়ে ঢলে পড়লো মৃত্যুঞ্জয় ডাক্তাবেব দেহ। সে যে ছোট্ট শিশি করে মুখের মধ্যে মারাত্মক বিষ লুকিয়ে বেখেছিলো এ-সন্দেহ আগে কেউ করতে পাবেনি!

এই সিরিজের অন্য বই

প্রবোধ ঘোষ

এখানে মৃত্যুর হাওয়া

প্রাসাদ উপাধ্যায়

প্রেতের আহ্বান

কালপুরুষ

বাস্তববাদ আমাদের কল্পনাকে এতোই পঙ্গু করেছে যে ইস্কুল কলেজ আপিস দোকান কাছারি বস্তি ফ্যাক্টরি আর পাড়াগাঁর বাইরে আমাদের দৃষ্টি চলে না। কিন্তু বহির্জগতের জীবন-অভিযান রোমাঞ্চে ভরপুর। মানুষের পৃথিবীতে এক অদৃশ্য শক্তি আছে, কখন যে তার আঘাত নামে, কখন যে কালপুরুষের অভিশাপ আসে তা আমাদের বুদ্ধির অগোচর। অসাধারণ মুহূর্তে তখন ঘটে নিষ্ঠুর মৃত্যু, নির্মম অপরাধ। সেই কালপুরুষের অভিশাপই এই সিরিজের বইগুলির বিষয়বস্তু।

বর্তমান য়ুরোপে অপরাধ রহস্য ও রোমাঞ্চ অপূর্ব সাহিত্যে পরিণত হয়েছে। বিজ্ঞানের অগ্রগতির সঙ্গে এসেছে বিস্ময়কর কৌশল। শেক্সপীয়র থেকে আরম্ভ করে চেষ্টারটন্ পর্যন্ত অনেক নামাকরা ইংরেজী সাহিত্যিকই কালপুরুষের ছায়ায় তাঁদের শ্রেষ্ঠ রচনা সৃষ্টি করেছেন; রাশিয়ায় ডস্টয়েভস্কি, আমেরিকায় অ্যালান্ পো। বাংলায় খাঁটি রোমাঞ্চ-সাহিত্য গড়ে তোলাই হচ্ছে কালপুরুষ সিরিজের উদ্দেশ্য।

প্রেতের আহ্বান

নাচু মোড়ায তোলা। কাধের তলায পাতলা বালিস, চোখদুটো খোলা না বোজা বোঝবার জো নেই। সামান্য ডেকচেয়ারে কতখানি আরাম করে শোয়া যায় তার যেন একটা চরম দৃষ্টান্ত! গরম পাতলা চাদরটা কোমর পর্যন্ত টানা, তার উপর শীতের রোদ পোয়া কুকুরের মতো লুটোচ্ছে। পাশে ছোট্ট টি-পয়, তার উপর একগাদা দেশী-বিলিতি পত্রিকা। কিন্তু তনুর ভাবগতিক দেখলে মনে হয় না যে পত্রিকাগুলো তোলবার বা পাতা উলটে পড়বার উৎসাহ আছে। ছোট্ট দালান। তারপর বাগান। শীতের বাহারি ফুল। তারপর পিচের পথ; তারপর এবড়ো-খেবড়ো কালো পাথর আর তারপর সমুদ্র। যতদূর চোখ যায় নীল জলে সোনালি রোদ চকচক করছে। যেন ইস্পাত।

দালানের অন্য প্রান্তে হালকা বেতের চেয়ারে বসে অশোক। ছিপছিপে লম্বা শরীর, চোখদুটো এমনিতেই জ্বলজ্বল করে। চওড়া কপাল; হালকা চুল; চুলগুলো উল্টোদিকে ঠেলে দেওয়া।

সমস্ত চেহারায় নির্মল বুদ্ধির ছাপ। তার সামনে বেতের টেবিল, তার উপর চামড়ার একটা ছোট বাক্স। ইস্পাতের কুঁচোকাঁচা যন্ত্রপাতি আর ওষুধের ছোট বড় শিশিতে বাক্সটা বোঝাই। টেবিলের ওপর নুয়ে পড়ে অশোক সেগুলো পরিষ্কার করছিল। দু-একটা যন্ত্রপাতি বের করে শ্যাময় চামড়া দিয়ে ঘসছিল, ওষুধের দু-একটা শিশি বের করে আলোয় তুলে দেখছিল। কুনুর কথা শুনে অশোক অত্যন্ত শান্তভাবে মুখ তুলল, কুনুর দিকে স্থিরভাবে রইল চেয়ে। কুনু আবার বলল, এবার একটু বেপরোয়া ভাবেই, "ছুটি মানে একদম ছুটি।"

অশোকের চোখমুখে হাসির হালকা ছায়া খেলে গেল। "আর একদম ছুটি মানে?"

কিন্তু কুনুর শরীরে একটুও চাঞ্চল্য দেখা গেল না। তেমনি আধবোজা চোখ; তেমনি নিস্পৃহ গলা, "একদম ছুটি মানে একদম ছুটি! চিৎ হয়ে হাই তুলব, যখন খুশি ঘুমোবো, যখন খুশি খাবো। আবার চোখ বন্ধ করব, আবার ঘুমোবো, আবার হাই তুলবো।"

"তার মানে ঘুমোতে ঘুমোতে হাই তুলবি না হাই তুলে তারপর ঘুমুবি?"

"তা ইচ্ছে হলে ঘুমুতে-ঘুমুতেও হাই তুলবো বইকি!"

"আর ইচ্ছে না হলে?"

"না হলে তুলবো না।"

"বেশ, বেশ। তার মানে এক কথায়, সুখে থাকতে চাস! কী বল?"

"তা চাই। কিন্তু সুখ কি সইবে?"

"কেন? কী হল?"

"তোর ওই ব্যাগটা? ও বিভীষিকাটাকে সঙ্গে না আনলেই পারতিস।"

"কেন, ব্যাগটা আবার তোর পাকাধানে কী মই দিল? তুই যদি ঘুমোতে-ঘুমোতে হাই তুলিস তা হলে ব্যাগটা নিশ্চয়ই আপত্তি করবে না।"

"ব্যাগ ছেড়ে ব্যাগের মালিকও আপত্তি করলে শুনছি না।"

"তা হলে?"

"তবু তোর ওই ব্যাগটা দেখলে আতঙ্ক হয়, ঘুমুতে ঘুমুতে হাই তোলা দূরের কথা, ঘুমই চটে যায়। এখুনি হয়ত কোনো দুর্মুখ এসে খবর দেবে কোথায় চুরি হয়েছে বা কার দামী জহরৎ উধাও হয়েছে আর অমনি তোর চেহারাটা বদলে যাবে, ওই ব্যাগ বগলে পুরে বলবি, 'কুনু, দশ মিনিটের মধ্যে প্রস্তুত হয়ে নে'।"

"তা ব্যাগটা কী অপরাধ করল?"

"ওটাই ত তোর মাথার পোকা, তোকে নাচিয়ে বেড়াচ্ছে! সময় নেই অসময় নেই, নাওয়া নেই খাওয়া নেই, এখানে ওখানে যেখানে সেখানে তোকে ঘোড়দৌড় করাচ্ছে। আর, তোর অনিবার্য ল্যাঙ-বোট হিসেবে আমাকেও হচ্ছে ছুটতে।"

অশোক হাসতে লাগল। "এ কথা অবশ্য ঠিকই যে ব্যাগটা না থাকলে তদন্তের কাজ আমার পক্ষে অসম্ভব হয়ে পড়ত। বহুদিন ধরে বহু চেষ্টা করে একটা ছোট্ট চামড়ার ব্যাগে তদন্তের পক্ষে প্রায় সমস্ত দরকারী জিনিসপত্তর গুছিয়ে নিতে পেরেছি। কিন্তু তবু, তদন্তের জন্যেই ব্যাগ, ব্যাগের জন্যে ত আর তদন্ত নয়! মিছিমিছি ব্যাগ-বেচারার ওপর চটে লাভ কি বল?"

"সেই দৈত্যের গল্পটা মনে আছে?—সেই একটা লোক একটা দৈত্য তৈরি করেছিলো। তারপর, তৈরি করবার পর, দৈত্যটা চাইল সেই লোকটাকেই জলযোগ করে সেরে ফেলতে। তোরও হয়েছে তাই, ব্যাগটাই এখন তোর মাথা খাচ্ছে। ওটা দেখলেই তোর মনের মধ্যেটা চুলকোতে থাকে, শান্তিতে এক মুহূর্ত ছুটি ভোগ করতে পারিস নে। কোথায় চোর, কোথায় ছ্যাঁচোড়—তাদের জন্যে মন কেমন সুরু করে। আরে বাবা…"

কুনু হয়ত বক্তৃতাটা আরও খানিকক্ষণ চালাতো। কিন্তু অশোকের দিদি, যাঁর বোম্বাই-এর বাড়িতে ওরা দুজন বেড়াতে এসেছে, দালানে উপস্থিত হলেন, এবং তাঁর পেছন-পেছন ভৃত্য; ভৃত্যের হাতে প্রকাণ্ড ট্রে, নানারকম খাবার, চায়ের সরঞ্জাম এবং খবরের কাগজ ট্রের ওপর। খাবার-দাবার দেখে কুনুর মধ্যে এতক্ষণ পরে সত্যিকারের উৎসাহ দেখা দিল। ডেক-চেয়ারের উপর সোজা হয়ে বসল, পাশের টি-পয় থেকে ধপাস

করে মাসিক-পত্রিকাগুলো মেঝেয় ফেলে দিল। চাকর ট্রে-টা নামিয়ে রাখল টি-পয়েব উপর, দিদি একটা বেতের চেয়ার টেনে হাসতে হাসতে বসে পড়লেন। চাকব চলে যাচ্ছিল, কুনুর ডাকে ফিবে দাঁড়াল। গম্ভীরভাবে খবরের কাগজটা তাব হাতে তুলে দিতে দিতে কুনু বলল, "এটা নিয়ে যাও।"

চাকব অবাক হয়ে বলল, "আজ্ঞে, এ নিয়ে আমি কী করব?"

কুনু বলল, "উনুন ধরাবে।"

চাকব আবও অবাক হয়ে বলল, "আজ্ঞে এ যে আজকের কাগজ!"

দিদি কুনুকে চেনেন, কিন্তু তার এ ধবনেব ব্যাপাব দেখে একটু বিচলিত হয়ে পড়লেন, "কাগজটার ওপর হঠাৎ এত বাগ হল কেন?"

কুনু বলল, "ও এক অতি সর্বনেশে ব্যাপার। কোথায় এক কোনায় হয়ত কী খুন খারাপির খবব থাকবে, আর আপনাব ভাইটি বলে বসবে—কুনু, দশ মিনিটের মধ্যে প্রস্তুত হয়ে বেরুতে হবে। বুঝছেন না দিদি, এই যে ছুটি, এত কষ্ট কবে বোম্বাই আসা, সব একেবারে মাঠে মারা যাবে। ছুটোছুটিই সার হবে।"

অশোক অনুনয়ের সুরে বলল, "দোহাই তোমার কুনু, ঘুমুতে ঘুমুতে তুমি যত খুশি হাই তোলো, আমাব একটুও আপত্তি নেই। কিন্তু সকালে চায়েব সঙ্গে কাগজ পড়তে না দিলে সত্যি আমার হজম হবে না।"

কুনু মাতব্বরী চালে বলল, "ও সব বদ নেশা ছাড়াই ভালো, কী বলেন দিদি ?"

দিদি হাসতে লাগলেন। দুই বন্ধুর মধ্যে কার দিক যে নেওয়া যায় ঠিক করতে পারছিলেন না। চাকর ভ্যাবা-চ্যাকা-খাওয়া ভাবে দাঁড়িয়ে রইল। অশোক এবার প্রায় কাকুতি মিনতি সুরু করল। অগত্যা কাগজটা তাকে দিতেই হল; চাকর স্বস্তির নিশ্বেস ফেলে চলে গেল।

অশোক ডুবল খবরের কাগজে। কুনু আর দিদি খাবার দাবারে মন দিল এবং অল্পক্ষণের মধ্যেই তাদের মধ্যে গল্প গুজব খুব জমে উঠলো। অশোকের ভগ্নীপতি ভবতোষবাবু বোম্বাইতে ওকালতি করেন। আপাতত একটা মামলার ব্যাপারে পুনা গিয়েছেন দিনকতকের জন্যে। দিদি যতবার বোম্বাই দেখতে বেরুবার কথা বলেন কুনু ততবারই আপত্তি করে জানায় ভবতোষবাবু ফিরলে একসঙ্গে সব বেরুনো যাবে। এটা যে তার আলস্যের ওজুহাত দিদি তা বোঝেন। কিন্তু কুনুর মতো চঞ্চল ছেলেকে আলসেমি করতে দেখে তাঁর বেশ মজাই লাগে। তাই রোজ সকালে ইচ্ছে করে কথাটা তোলেন।

আজকেও সেই কথা হচ্ছিল। দিদি বলছিলেন, "না ভাই, তোমার চেয়ে অশোকই দেখছি ছেলে ভালো। এ কদিন ত তুমি শুধু আলসেমি করেই কাটালে, কিন্তু অশোক ইতিমধ্যেই সমস্ত সহরটা চষে ফেলেছে।"

কুনু আড়চোখে অশোকের দিকে চাইল, প্রশংসা শুনে মুখের ভাবটা কী রকম হয়েছে দেখবার জন্যে। কিন্তু চেয়েই কুনু চমকে উঠল। যা ভয় পেয়েছিলো ঠিক তাই! কাগজ পড়তে পড়তে অশোকের চেহারা একেবারে বদলে গিয়েছে, চোখ মুখ একটু গম্ভীর, একটু থমথমে। অশোকের এ-চেহারার মানে কনু বোঝে, তাই ঘাঁটাতে সাহস করে না। দিদিও অশোকের দিকে একবার দেখলেন। চোখে চোখে দিদির সঙ্গে কুনুর কী যেন কথা হয়ে গেল। তারপর দুজনেই আবার অন্য কথা পাড়ল।

চায়ের পেয়ালাটা টেবিলে নিঃশব্দে নামিয়ে রেখে অশোক আস্তে আস্তে সোজা হয়ে দাঁড়ালো। কোন এক রহস্যের সন্ধান পেয়ে ওর দেহমন যেন উত্তেজনায় টান-টান হয়ে উঠেছে: তারপর দালানের একোণ থেকে ওকোণ পর্যন্ত পায়চারি করতে সুরু করল। কুনু বলল, "দিদি, লক্ষণ বড় খারাপ মনে হচ্ছে।"

যত উত্তেজিতই হোক না কেন, অশোকের কান সজাগ থাকে। কনুর কথা শুনে পায়চারি থামিয়ে দাঁড়াল, তারপর হোহো করে হাসতে হাসতে একটা বেতের চেয়ার কাছে টেনে বসে পড়ল। কুনু বলল, "তোর ভাবগতিক ত ভালো বলে মনে হচ্ছে না! দশ মিনিটের মধ্যে প্রস্তুত হতে হবে নাকি?"

অশোক হাসতে হাসতে বলল, "না না। আমাদের এখন বেরুতে হবে না। তবে ভবতোষদা খানিকক্ষণের মধ্যেই এসে পড়বেন বলে মনে হয়।"

"তার মানে ?" দিদি অবাক হয়ে বললেন, "ওঁর ত ফেরবার কথা দিন সাতেক পরে! তাছাড়া, উনি ত আর এমন একটা কেউকেটা লোক নন যে তাঁর বম্বে ফেরার কথা কাগজে বেরুবে!"

অশোক বলল "তা অবশ্য বেরোয় নি।"

"তবে ?" দিদি অবাক হয়ে প্রশ্ন করলেন।

অশোক নির্লিপ্ত ভাবে বলল, "কাগজে একটা ভূতের গল্প বেরিয়েছে।"

"ভূতের গল্প ?"

"হুঁ।"

"আর তার থেকেই তোমার মনে হল উনি আজই ফিরে আসবেন ?"

অশোক খুব জোর গলায় বলল, "নিশ্চয়ই।"

কুনু এবার প্রায় অধৈর্য হয়ে উঠল, "হেঁয়ালী রাখ। মনে হচ্ছে ছুটিটা মাঠে মারা গেল, ছুটোছুটি আবার করতেই হবে। কিন্তু ব্যাপারটা কী খুলে বল।"

অশোক বলল, "বিশেষ কিছু নয়। এখানে 'উদয়-ভিলা' বলে একটা প্রকাণ্ড প্রাসাদ আছে দেখেছিস ?"

"দেখবো কেমন করে ?" কুনু বলল, "একদিনও ত হাঁটতে বেরুইনি।"

দিদি বললেন, "ও অবশ্য দেখেনি, কিন্তু আমি দেখেছি। সান্টা ক্রুস-এ। সমুদ্রের ঠিক ওপরে।"

"হুঁ," অশোক বলল, "সে বাড়ির মালিক প্রতাপচন্দ্র বাটলি-ওয়ালা। কাগজে বেরিয়েছে যে উদয়-ভিলায় ভূতের উৎপাত সুরু হয়েছে এবং প্রতাপচন্দ্র বাব কতক ভূতের সাক্ষাৎ পেয়ে এত ঘাবড়ে পড়েছেন যে তাঁর প্রায় মস্তিষ্ক বিকৃতিব লক্ষণ দেখা দিয়েছে।"

কুনু হো হো ক'বে হেসে উঠল, "খববটা বোধহয় উল্টো ছাপা হয়েছে। ভূত দেখে মাথা খারাপ হয়নি, মাথা খারপ হয়েছে বলেই ভূত দেখেছে! যাই হোক ভবতোষদা ত উকিল, ওঝা নন! ভূত তাডাতে এখানে ছুটে আসবেন কেন?"

অশোককে এ কথাব জবাব দিতে হল না। কেন না, কুনুব কথা শেষ হতে না হতেই একটা গাড়ি এসে দাঁড়াল ফটকেব বাইবে—ধুলোয় বোঝাই গাড়ি। দেখলেই বোঝা যায় অনেক দূর থেকে আসছে। তবে মধ্যে থেকে নামলেন ভবতোষবাবু; নাদুস-নুদুস মাঝবয়সী ভদ্রলোক।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

মাথা খারাপ আর মাথা ব্যথা

নাদুস-নাদুস ভুলো ভোলানাথের মতো চেহারা, ভবতোষ নামটা খুব খাপ খায়। হন্তদন্ত ভাবে হাতে হালকা ব্যাগ নিয়ে বাগান পেরিয়ে তরতর করে উঠে এলেন। অশোক আর কুনুকে একেবারে দালানে দেখতে পেয়ে মহা খুসি—"যাক, তোমরা বাড়িতেই আছ! বাঁচলুম। একটা ভয়ানক জরুরী কাজ পড়েছে। হঠাৎ তাই আমায় ফিরতে হল--"এক নিঃশ্বেসে বললেন এত-গুলো কথা, তারপর ধপাস করে একটা চেয়ারে পড়লেন বসে।

অশোকের দিদি এক পেয়ালা চা ঢালতে ঢালতে বললেন—"ওরা ত তোমার জন্যেই অপেক্ষা করছিলো। অশোক বলছিলো খানিকক্ষণের মধ্যেই তুমি ফিরবে।"

ভবতোষবাবু একেবারে অবাক হয়ে গেলেন—"কী আশ্চর্য! আমি ফিরব জানলো কেমন করে! আমার ত ফেরবার কথা দিন কতক পরে!"

অশোক হাসতে হাসতে বলল, "অবাক হবেন না। এর মধ্যে এমন কিছু বুদ্ধির কসরৎ নেই। উদয়-ভিলায় প্রতাপচন্দ্রের যদি মাথা খারাপ হয় তা হলে তা নিয়ে আপনারই ত সবচেয়ে

বেশি মাথা ব্যথা হবার কথা। তিনি যে আপনাব একজন প্রধান মক্কেল সে কথা ত আগেই একদিন বলেছিলেন।”

ভবতোষবাবুর চোখ এবার সত্যিই কপালে উঠল !

“কী আশ্চর্য ! প্রতাপচন্দ্রেব মাথা খাবাপের খববটা তোমরাও জেনে গেছ !”

এবাব অবাক হবার পালা অশোকের। বলল, “খববেব কগেজেই যখন খববটা বেবিয়েছে তখন আর আমাদেব পক্ষে জানাটা এমন কী বিস্ময়ের ?”

একেবাবে চমকে উঠলেন ভবতোষবাবু। স্ত্রীব হাত থেকে চায়েব পেযালা নিতে যাচ্ছিলেন, পেয়ালা থেকে চা উপচে পড়ল পিবিচে। বললেন—“খববেব কাগজে ছাপা হয়েছে !” ভবতোষ-বাবু বুঝি নিজেই ভূত দেখলেন। তাবপব হতাশ ভাবে চেয়ারে হেলান দিয়ে বললেন, “যাঃ, সব মাটি হয়ে গেল !”

অশোকেব দিদি প্রশ্ন করলেন, “কেন, মাটি কী হল ?”

“মাটি নয় ?”—ভবতোষবাবু একটু উত্তেজিতভাবেই বললেন, “পাছে বেশি লোক-জানাজানি হয় সেই ভয়েই ত টেলিগ্রাম পেয়েই আমি ছুটে এসেছি।”

অশোকেব কপাল একটু কুঁচকে উঠল, “কেন ? বেশি লোক-জানাজানি হলে মুস্কিলটা কী ?”

এতক্ষণ পরে কুনু কথা বলল, “ভারি গোয়েন্দা হয়েছিস ! মুস্কিলটা কি তাও বুঝিয়ে দিতে হবে ? তুই যদি আজ পাগলা

হয়ে যাস আর সবাই যদি তা জেনে ফেলে তা হলে তোর দুর্নাম হবে না? মক্কেলের দুর্নামটা মুস্কিলের নয়?"—খুব মাতব্বরী চালে বলল কুনু এবং অশোককে বুদ্ধিতে পরাস্ত করার বীরদর্পে একবার দিদির মুখেব দিকে চেয়ে দেখল।

"না হে না!" ভবতোষবাবু যেন এক কথায় কুনুর সমস্ত উৎসাহ দুমড়ে দিলেন, "ব্যাপারটা অত সোজা নয়। আসল কথা হল আইনের একটা হাঙ্গামা: প্রতাপচন্দ্রের মাথা খারাপ হয়ে গেছে একথা সর্বত্র প্রমাণিত হলে ওই বিবাট সম্পত্তি থেকে তিনি বঞ্চিত হবেন। কেননা, সম্পত্তিটা তাঁর কাকা উদয়চন্দ্র তাঁকে উইল করে দিয়ে গেছেন এবং উইলে এই একটি-মাত্র সর্ত।"

"এ আবার কোন ধরনের উইল?' দ বললেন, "ভাইপোর যে মাথা খারাপ হতে পারে তাই বা কাকা অত আগে আঁচ করলেন কেমন করে?"

"সে একটা ভারি হাঙ্গামার ব্যাপাব," ভবতোষবাবু বললেন, "ওঁদের বংশ সম্বন্ধে বরাবর একটা প্রবাদ আছে যে ওঁদের রক্তে রয়েছে পাগলের বিষ, যে কেউ যে কোনদিন পাগল হযে যেতে পারে।"

অশোকের মুখ গাম্ভীর্য্যে থমথম করছে, অত্যন্ত শান্ত গলায় সে প্রশ্ন করল, "কিন্তু এর আগে সত্যি-সত্যি কি কেউ পাগল হয়েছেন বলে জানা আছে?"

ভবতোষবাবু বললেন, "না। আমি খোঁজ করেছিলুম। কিন্তু সে রকম কারুর কথা শুনিনি। প্রবাদটা কেন যে আছে তা বলতে পারিনে ; তবে আছে যে এ কথা ঠিক। মরুক গে যাক প্রবাদ। কিন্তু কথা হল খবরের কাগজওয়ালারা ব্যাপারটা এমনভাবে টের পেলো কী করে!"

অশোক বললো, "হুঁ। সেটা সত্যিই ভালো করে ভেবে দেখতে হবে"—তারপর একটু হেসে, "হয়ত বোম্বাইএর কাগজ-ওয়ালারা খুব বেশি করিৎকর্মা লোক। সে যাই হোক, আপনি এখন চা-টা খেয়ে হাতমুখ ধুয়ে আসুন। তারপর সমস্ত ব্যাপারটা আপনার কাছ থেকে আগাগোড়া শোনা যাবে।"

ভবতোষবাবু অত্যন্ত ব্যগ্র গলায় বললেন, "কিন্তু ভাই অশোক আর কুনু, এসব ব্যাপারের মধ্যে সত্যিই একটা কিছু গোলমাল আছে। আমার কপাল অত্যন্ত ভালো যে ঠিক এই সময়েই তোমরা এখানে এসে পড়েছো। ব্যাপারটার সমস্ত দায়িত্ব তোমাদের নিতেই হবে।"

কুনু হতাশভাবে দীর্ঘ নিশ্বেস ফেলে বললো, "ওকে আর অনুরোধ করছেন কি! ক্যাঙলা ভাত খাবি না পাত পাব কোথায়?—ওর সেই অবস্থা হয়েছে। মঘা যোগে চেপেছিলুম ট্রেনে, ছুটিটা শেষ পর্যন্ত ছুটোছুটিই হয়ে দাঁড়াবে। যাই হোক ভবতোষদা, আপনি হাতমুখ ধুয়ে আসুন। শোনা যাক সব কথা। আমি যাব বঙ্গে আমার কপাল যাবে সঙ্গে।"

হাতমুখ ধুয়ে ভবতোষবাবু এসে বসলেন। অশোক বলল, "সমস্ত ব্যাপারটা বেশ খুঁটিয়ে আগাগোড়া বলে যান—" বলে চোখ বন্ধ করে একটা ডেকচেয়ারে নিজেকে ঢেলে দিল। ভবতোষবাবু বলে চললেন :

"প্রতাপচন্দ্র সম্বন্ধে গোড়ায় দু'চারটে কথা বলি। ক্রোড়পতি উদয়চন্দ্র বাটলিওয়ালার ভাইপো, উদয়চন্দ্রের ছেলেমেয়ে না থাকায় প্রতাপচন্দ্রই এখন তাঁর সমস্ত সম্পত্তির মালিক। উইলে কেবল একটা সর্ত আছে, সে কথা ত আগেই বলেছি। প্রতাপচন্দ্র বহুদিন বিদেশে থেকে লেখাপড়া করেছেন, বিদ্বান লোক, শুধু বিদ্বান বললে কমিয়ে বলা হয়। কেন না লাইব্রেরিটা ছাড়া তাঁর জীবনে যেন আর কোন আকর্ষণ নেই। শান্ত স্থির বুদ্ধি, আর তেমনি মিষ্টি স্বভাব। যদিও তাঁদের বংশে পাগল হওয়া সম্বন্ধে একটা অস্পষ্ট প্রবাদ চলতি আছে তবুও প্রতাপচন্দ্র সম্বন্ধে আমার এ দুর্ভাবনা কোনদিন ছিল না। কিন্তু হালে সেই দুর্ভাবনাই আমার সবচেয়ে প্রবল হয়ে উঠেছে কেননা সত্যিই আমি নিজের চোখে দেখছি প্রতাপচন্দ্রের মাথাটা খারাপ হয়ে যাচ্ছে। ভারি আশ্চর্য ব্যাপার। এমনিতে তাঁর সঙ্গে কথা বলো, কিছু টেরই পাবে না। যে কোনো বিষয় নিয়ে কথা বলো, ঘণ্টার পর ঘণ্টা তাঁর পাণ্ডিত্য উজোড় করেও তিনি ক্লান্ত হবেন না। কিন্তু ঠেকে যাবে একটা বিষয়ের কথা উঠলে : প্রেতলোকের কথা। দেখবে তিনি কী রকম গম্ভীর হয়ে যান এবং অত্যন্ত শান্ত গম্ভীর ভাবেই

তিনি এলোমেলো যা তা বকতে সুরু করবেন। এমন সব আজগুবি কথা যে শুনলে হাসি পায়, কিন্তু হাসা যায় না, কেন না তখন তাঁর সমস্ত চোখেমুখে ফুটে ওঠে একটা দুর্বল অসহায় আতঙ্ক। তখন মায়া হয়, দুঃখু হয়।"

"কী ধরনেব কথা?"—অশোক প্রশ্ন করল।

"সে সব ভারি আজগুবি কথা, একেবারে আষাঢে গল্প। প্রেতলোক সম্বন্ধে নানান তথ্য বলে যাবেন, এমন কি বলতে সুরু কববেন গভীর রাতে তিনি নিজে প্রেতলোকের দর্শন পেয়েছেন। তিনি নিজে নাকি দেখেছেন একটা কাটা মুণ্ডু অন্ধকাব ঘবে ভাসছে, উল্‌টো হয়ে ভাসছে এবং নরকেব নীলচে আলো ঠিকবে বেরুচ্ছে সেই মুণ্ডু থেকে। কিম্বা, তিনি নাকি স্বচক্ষে দেখেছেন নবকের বিদ্‌ঘুটে পাখি মাথার ওপর ঘুরপাক খাচ্ছে এবং তাব গা থেকে নাকি ঠিকরে বেরুচ্ছে প্রেতলোকের অদ্ভুত আলো!"

অশোক শান্তভাবে বলল, "কিন্তু এতে হাসি পাবাব কী আছে? ভদ্রলোক ত সত্যিসত্যিই এসব দেখে থাকতে পারেন!"

"কী রকম!"—উত্তেজিতভাবে সোজা হয়ে বসল কুন্তু, "সত্যি দেখেছেন মানে? তোর বংশেও মাঝেমাঝে উন্মাদের উদয় হয় নাকি?"

"ঠিক জানিনা," অশোক বলল, "সে রকম কোনো প্রবাদ থাকলেও অন্তত আমি কখনো শুনিনি। কিন্তু আসলে যা

শুনলুম তাতে পাগলামির কোনো নিশ্চিত প্রমাণ নেই। অবশ্য মাথা খারাপ হলেও এসব জিনিস মানুষ দেখতে পাবে ; কিন্তু প্রতাপচন্দ্র দেখেছেন বলেই যে তাঁর মাথা খারাপ হয়েছে তা প্রমাণ হয় না।"

"প্রমাণ হয় না মানে ? সুস্থ মাথায় মানুষ এসব দেখবে কেমন করে ?"—কুনুর যেন বণং দেহি ভাব।

"ও সব জিনিস চোখে পড়লেই দেখতে পাবে।"—অশোকের গলা নির্লিপ্ত, সহজ। "ধর, বাড়িটার সত্যিই ভূত আছে।"

"তা যদি থাকে ত বেঁচে যাই। একবার বাড়িটায় গিয়ে ভূতের সঙ্গে কোলাকুলি করে আসি"—বলে হোহো করে হেসে উঠল কুনু।

কিন্তু কুনুর হাসি ডুবে গেল অশোকের হাসিতে—"ঠিক হয়েছে"—অশোক বলল—"মানে ভূত আছে কিনা একবার গিয়ে দেখতে তোর আপত্তি নেই। বরং উৎসাহই আছে। এই কথাটাই তোর মুখ দিয়ে বার করতে চাইছিলুম। কুনু, ঘুমুতে ঘুমুতে হাই তোলা সত্যি তোর কপালে নেই, মেজাজেও নেই। ছুটি মানে একদম ছুটি আর হল না!"

কুনু বেচারা একেবারে অপ্রস্তুত হয়ে পড়ল। ওর দুর্ভোগ দেখে দিদিও আর না হেসে থাকতে পারলেন না। কুনু আমতা-আমতা করে বলল, "কিন্তু সত্যিই কি তুই বলতে চাস বাড়িটায় ভূত থাকতে পারে!"

"তা এক্ষুনি কেমন করে বলি, বল। ওখানে গিয়ে ভাল করে সব খোঁজ-খবর করতে হবে, তাছাড়া, ভবতোষদার কাছ থেকে এখনো ত সমস্ত কথাই শোনা হয়নি। যাই হোক, তুই যখন আমার সঙ্গে স্বেচ্ছায় একাজে নামতে রাজি হয়েছিস তখন আর ভাবনা নেই।" তারপর ভবতোষবাবুর দিকে চেয়ে বলল, "বলুন এবার প্রতাপচন্দ্রের আগাগোড়া ইতিহাস।"

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

পুরনো পুঁথি

অদ্ভুত ছেলে এই অশোক! বাস্তবিকই অদ্ভুত! এখন তার চেহারা দেখে কে অনুমান করবে মাত্র কয়েক মুহূর্ত আগে বন্ধুকে বুদ্ধির খেলায় পরাস্ত কবাবব ছেলেমানুষি অনন্দে ও অমন উচ্ছল হয়ে উঠেছিল। ভবতোষবাবুর কথা শোনবার সময় ওব চোখ-মুখের ভাব অতি-প্রবীণ, অতি-গম্ভীর মানুষের মতন; হালকা হাসির ধারকাছ দিয়েও যেন যেতে চায় না। বেতেব টেব্‌লটার ওপর দুটো কনুই রেখেছে, বাঁ হাতের চেটোটা বন্ধ দুচোখের ওপর চাপা, ডান হাতেব সরু-সরু দুটো অঙুল দিয়ে মাথার একগোছা চুল টেনে-টেনে ক্রমাগতই কপালের ওপর নামাচ্ছে। শবীরে আর কোথাও বিন্দুমাত্র কোন রকম চাঞ্চল্যের লক্ষণ নেই।

প্রতাপচন্দ্রের ইতিহাস ভবতোষবাবু আগাগোড়া বলে চললেন:

"উদয়চন্দ্রের যখন মৃত্যু হয় তখন প্রতাপচন্দ্র বিদেশে। কি একটা দর্শনিক বিষয় নিয়ে ফ্রান্সে গবেষণা করছেন 'ডাক্তার' উপাধির জন্যে। তাঁর কাকার মৃত্যু-সংবাদ আমিই তাঁকে কেবল্ কবে জানাই এবং সেই সঙ্গে উদয়চন্দ্রের এ্যাটর্নি হিসেবে জানাই উইলের কথা। উদয়চন্দ্রের অগাধ বিষয় সম্পত্তি; নিজে এসে

প্রতাপচন্দ্রকে অনুরোধ করি সঙ্গেসঙ্গে দেশে ফিরতে। কিন্তু লোকটি যাকে বলে একেবারে বৈরাগী ; সম্পত্তি সম্বন্ধে অমন উদাসীন ভাব তোমরা ভাবতেও পার না। তাঁর লেখাপড়ার কাজ বিষয়-আশয়ের কাজের চেয়ে ঢের বেশি গুরুতর, ফলে তিনি অনুরোধ করলেন লক্ষ্ণৌতে তাঁর দূর সম্পর্কের ভাই ধীরবিক্রমকে আপাতত বিষয়টিষয় দেখতে বলতে। অনেক হাঙ্গামা করে ধীরবিক্রমকে আবিষ্কার করলুম বটে, কিন্তু এক বৈরাগীর পাল্লা থেকে আর এক বৈরাগীর পাল্লায় পড়া গেল। সম্পত্তি নিয়ে এমন সাধাসাধি করার কথা আমি গল্পেও পড়ি নি। ধীরবিক্রম লক্ষ্ণৌ-এ থেকে লেখাপড়া করত, অর্থাৎ খেলাধুলো করত। কেন না, সহরে ওর নাম ছিলো পয়লা নম্বর হকি খেলোয়াড় বলে এবং কলেজের খাতায় ওর নাম ছিল নিছক খেলার খাতিরে। বাপের অবস্থা মন্দ নয়। ফলে, আজীবন ধীর ভাবে বসে কাটালেও পৈত্রিক টাকার কিছু বাকি থাকবে, তাই দিয়ে ঘটা করে শ্রাদ্ধ-শান্তি করা চলবে! তা হলে আর সুস্থ শরীরকে ব্যস্ত করা কেন? তা ছাড়া, পরের টাকায় যখ হয়ে বসে পাহারা দেবার মতো বিড়ম্বনা আর নেই ; কোথায় পান থেকে একটু চুণ খসবে আর তার জবাবদিহির হাত থেকে ইহলোকে যদিই বা পরিত্রাণ পাওয়া যায় পরলোকে কোনমতেই পাওয়া যাবে না। মহা বিপদ। রাজি কিছুতেই করাতে পারি নে। লিখলুম প্রতাপ-

চন্দ্রকে। তিনি আবার লিখলেন ধীরবিক্রমকে। আমি আবার দেখা করলুম ধীরবিক্রমের সঙ্গে। এই রকম ভাবে কাটল মাস কতক। মনে হল দুটি একেবারে খাস পাগলের পাল্লায় পড়া গিয়েছে!"

"তা হলে," কুন্তু হাসতে-হাসতে বলল, "বংশে পাগলামির প্রবাদটা নেহাৎ বাজে কথা নয়।"

"হুঁ; পাগলামিই বই কি," ভবতোষবাবু বললেন, "এক ধরনের পাগলামি ছাড়া আর কি? তবে একটা জিনিস লক্ষ্য করলুম, সম্পর্ক দুজনের মধ্যে যত দূরই হোক না কেন, মনের ঘনিষ্ঠতা একেবারে নিরেট।"

"তারপর কী হল?"--দিদি একটু অধৈর্যভাবেই প্রশ্ন করলেন।

"তারপর," ভবতোষবাবু আবার বলে চললেন, "সেই দূর সম্পর্কের ভাইটিকেই নিকটে আসতে হল। অর্থাৎ, ধীরবিক্রম শেষ পর্যন্ত অত্যন্ত অনিচ্ছাসত্ত্বেও উদয়-ভবনে কিছুদিনের জন্যে এসে থাকতে রাজি হল। সর্ত হল প্রতাপচন্দ্র বিদেশ থেকে ফিরলেই ধীরবিক্রম ছুটি পাবে।

"প্রথমটায় ধীরবিক্রম যেমন ভয় পেয়েছিল এসে দেখল সে রকম কিছু নয়। বোম্বাইতেও রীতিমত হকি খেলার আদর আছে এবং জাঁকালো খেলোয়াড়েরও অভাব নেই। উদয়-ভবনের পথেই দিনকতকের মধ্যে দেখা গেল ধীরবিক্রম এক ডাকসাইটে

হকি-টিম তৈরি করে নিয়েছে ; সান্তা ক্রস্ অঞ্চলের যত ডানপিটে গোয়ানিস ছোকরা জুটেছে তার দলে আর ধীরবিক্রমের দক্ষতায় এক একটি তুখোড় খেলোয়াড় হয়ে উঠছে। মাঝে-মাঝে আমি বৈষয়িক ব্যাপার নিয়ে দেখা করতে যেতুম, কিন্তু এ সব কথা উঠলেই সে হাই তুলতে সুরু করত, হাত জোড় করে মিনতি করত ও-সব ব্যাপার থেকে রেহাই দিতে। তবুও, মনেমনে আমি খুব খুশিই ছিলুম, হাজার হোক, উদয়-ভবনে তবু একজন ত রয়েছে।"

অশোক এতক্ষণ পরে প্রশ্ন করল, "কিন্তু একটা কথা বুঝতে পারছি না ভবতোষদা। প্রতাপচন্দ্রের আত্মীয়স্বজন বলতে কি দুনিয়ায় আর কেউ নেই যে ধীরবিক্রমকে ছাড়া আর আপনাদের চলছিল না ?"

ভবতোষবাবু বললেন, "ঠিক বলেছ! ধীরবিক্রমও হলে বড় সংবেধন নীলমণি।"

"ও! তারপর ?"—অশোক আর কথা বাড়াতে চাইল না।

"তারপর কিছুদিন কাটল নির্বিঘ্নে। প্রতাপচন্দ্র পড়াশুনো শেষ করে ফিরে এলেন এবং ধীরবিক্রম স্বস্তির নিশ্বেস ফেলে পালাতে চাইল। প্রতাপচন্দ্র অনেক ভাবে আবেদন-নিবেদন করতে লাগলেন। কিন্তু ধীরবিক্রম একেবারে অবুঝ। এই অগাধ টাকার মধ্যে বেশি দিন থাকা তার মতে মোটেই উচিত নয়, কেননা ছোঁয়াচ লাগতে পারে, নেশা ধরতে পারে—টাকার নেশা।"

"যাকে বলে একেবারে বৈরাগী!"—দিদি বললেন।

"হুঁ; একেবারে পাকা বৈরাগী," ভবতোষবাবু বলে চললেন, "যাই হোক, ধীরবিক্রম দিনকতকের মধ্যেই বিদায় নিল এবং প্রতাপচন্দ্র ডুবলেন উদয়-ভবনের বিরাট লাইব্রেরির মধ্যে। মাস-কতক বেশ নির্বিঘ্নেই কাটল, আমিও যার সম্পত্তি তার হাতে তুলে দিতে পেরে এক রকম নিশ্চিন্তই ছিলুম। কিন্তু সুখ সইল না বেশি দিন। মাস কতক বাদেই দারুণ দুর্যোগ সুরু হল।"

"কী ধরণের দুর্যোগ?"—অশোক প্রশ্ন করল।

"প্রথম লক্ষ্য করলুম প্রতাপচন্দ্রের মধ্যে একটা অদ্ভুত পরিবর্তন। এমনিতেই একটু ভাবুক ধরনের লোক, দিনরাত পুঁথিপত্তর নিয়ে পড়ে থাকেন। অল্প বয়েসেই প্রকাণ্ড পণ্ডিত হিসেবে নাম করেছেন। বিষয়কর্মের কাজ নিয়ে তাঁর কাছে মাঝেমাঝে যেতেই হত এবং তাঁর লাইব্রেরিতেই বসে কথাবার্তা সব হত। নানান বিষয়ের দুর্বোধ্য পুঁথির স্তূপে তিনি যেন সব সময় চাপা থাকতেন। বৈষয়িক কথা যত কমের মধ্যে হয় সেরে নিয়ে বিদায় নিতুম। কিন্তু, সেদিন গিয়ে দেখি তাঁর চেহারা একেবারে অন্য রকম—"

"কতদিন আগেকার কথা বলছেন?" অশোক প্রশ্ন করল।

"তা মাস আষ্টেক হবে বোধ হয়। দেখলুম তাঁর অবস্থা অত্যন্ত উত্তেজিত। আমায় চটপট বিদায় দেবারও কোন উৎসাহ

যেতে। সরঞ্জাম এনে নিজেই চা তৈরি করতে লাগলেন। কিন্তু চুপচাপ। কি যেন একটা কথা বলি-বলি করেও বলতে পারছেন না। অত্যন্ত অস্বস্তিকর অবস্থা। আমি নিরুপায় ভাবে পাশের থেকে একটা বই তুলে নিলুম এবং চমকে উঠলুম। আজকাল বাজারে প্রেতলোক সম্বন্ধে যে রকম উদ্ভুট্টে গাঁজাখুরি বই ছড়ানো থাকে সেই জাতের একখানা বই! অতবড় গম্ভীর পণ্ডিত এ ধরনের কুসংস্কারাচ্ছন্ন বই নিয়ে ঘাটাঘাঁটি করতে পারেন তা যেন বিশ্বাসই হতে চায় না। তারপর ভাবলুম, কোনমতে আর পাঁচটা বই-এর সঙ্গে এ বইটা হয়ত দৈবাৎ ছিটকে এসেছে। সেটা রেখে দিয়ে আর একটা বই তুলে নিলুম। দেখলুম একই জাতের বই। তারপর আর একটা, তারপর আর একটা। দেশি বিলিতি শত সব আজগুবি বই-এ তাঁর পড়ার টেবল্ বোঝাই হয়ে রয়েছে দেখলুম! বিস্ময়ে আমার দম প্রায় বন্ধ হয়ে যাবার জোগাড়! এত বড় পণ্ডিত কি না প্রেতলোক এবং পরলোক নিয়ে এই সব অপাঠ্য পুঁথিতে ঘর বোঝাই করেছেন এবং মনে হচ্ছে শুধু এই সব বই-ই আজকাল তিনি পড়ছেন। চমক ভাঙল প্রতাপচন্দ্রের কথায়, চায়ের পেয়ালা এগিয়ে দিতে-দিতে তিনি বলছেন—'চা নিন!' নিলুম চা। অবাক হয়ে চাইলুম তাঁর দিকে। দেখি এক অদ্ভুত ভীরু দুর্বল হাসি তাঁর ফ্যাকাশে ঠোঁটের পাশে।—'আজকাল শুধু এই সব বইই পড়ছি'—প্রতাপচন্দ্র যেন জোর

লাগছে। না?'

" 'তা অবাক লাগবার ত কথাই', আমি বললুম,—'আপনার মতো পণ্ডিত ব্যক্তিও যদি'—

"প্রতাপচন্দ্র বাধা দিলেন—'হুঁ ; ব্যাপারটা একটু খাপছাড়া লাগবার কথা বই কি। কিন্তু কি জানেন! আমি শেষ পর্যন্ত তলিয়ে দেখতে চাই। জীবনে যখনই যা জানতে চেয়েছি শেষ পর্যন্ত জানবার চেষ্টা করেছি। অনেক কিছুই জেনেছি, অনেক কিছুই পড়েছি। কেবল প্রেতলোকের ব্যাপারটাই এতদিন অগ্রাহ্য করে এসেছি'

" 'কিন্তু অগ্রাহ্য করবার মতোই নয় কি?'

" 'তাই ত মনে করতুম। এখন দেখছি প্রকাণ্ড ভুল করতুম।' প্রতাপচন্দ্র একটু থামলেন, চা দিয়ে গলা ভিজিয়ে নিলেন। তারপর প্রায় খাপছাড়া ভাবেই বললেন—'আমাদের বংশে একটা পাগল হয়ে যাবার প্রবাদ আছে জানেন নিশ্চয়ই।'

" 'হুঁ। শুনেছি বই কি। কিন্তু সে ত প্রবাদমাত্র, তার বেশি কিছু নয়।'

" 'আমারও তাই ধারণা ছিল কিন্তু আসল ব্যাপারটা এতদিনে আবিষ্কার করেছি।' আমি অবাক হয়ে চেয়ে রইলুম। প্রতাপচন্দ্র বলে চললেন—'আসল ব্যাপারটা হল আমাদের বংশে এক বিষাক্ত অভিশাপ আছে। এক সূর্যপূজারী ব্রাহ্মণের অভিশাপ। এই অভিশাপের দরুণ এক-পুরুষ অন্তর আমাদের বংশে উন্মাদের উদয় হয়। আমার ঠাকুরদাদা অবশ্য অল্প বয়সে

মারা গিয়েছিলেন, তাই তিনি এ অভিশাপের হাত থেকে বেঁচে গিয়েছিলেন।'

" 'কিন্তু তাঁর ঠাকুর্দা?'---আমি প্রশ্ন করলুম। প্রতাপচন্দ্র বললেন-- 'তাঁর ঠাকুর্দা সম্বন্ধে আমি বিশেষ কিছু শুনিনি; কার কাছেই বা শুনব বলুন? জ্ঞান হবার পর দুজন আত্মীয়কে মাত্র দেখেছি, ধীরবিক্রম এ সব কিছু জানে না, জানতে চায়ও না। আর কাকা এ সব কথা নিশ্চয়ই জানতেন কিন্তু ও নিয়ে আলোচনা করতে কখনো রাজি ছিলেন না। আপনি ত জানেন কী অসম্ভব গম্ভীর ছিলেন তিনি!'

" 'তা অবশ্য জানি। কিন্তু কথা হল হঠাৎ আপনি এতদিন পরে এ সব তথ্য আবিষ্কার করলেন কেমন করে?'

"প্রতাপচন্দ্র বললেন—'হঠাৎই! কিছুদিন আগে লাইব্রেরির পুরনো পুঁথি ঘাটতে ঘাঁটতে একটা খাতা আবিষ্কার করেছি। অতি পুরনো ঝুরঝুরে খাতা সেই খাতাটায় আমাদের বংশের অভিশাপ সম্বন্ধে পরিষ্কার বিবরণ লেখা আছে। লেখা আমার কোনো পূর্বপুরুষের, কার যে তা ঠিক জানি না। তবে অনেক পুরুষ আগেকার কেউ বলে মনে হচ্ছে।'" '

ভবতোষবাবু বলে চললেন, "তারপর প্রতাপচন্দ্র অত্যন্ত শান্ত স্থির গলায় এমন সব অসম্ভব আজগুবি কথাবার্তা বলে যেতে লাগলেন যে বিস্ময়ে আমার হাতের চায়ে চুমুক দিতে একদম ভুলে গেলুম, চা ঠাণ্ডা কনকনে হয়ে গেল। কথাগুলো

বিশ্বাস কবেছিলুম বলে অবাক হই নি, অবাক হলুম এমন সব অদ্ভুত কথায় তিনি বিশ্বাস কবতে পারলেন দেখে! মনে হল ছাই-পাঁশ কতকগুলো বই পড়ে-পড়ে তাঁব মাথা গোলমাল হয়ে গিয়েছে। তবু যে খাতাটা অত হাঙ্গামাব মূলে সেটা আসলে কি তা জানতে চাইলুম। তিনি সেটা বেব করে দিলেন। সত্যিই বহুকালেব পবনো খাতা এবং তাতে যে-ঘটনাব কথা লেখা বয়েছে তা পড়তে-পড়তে সুস্থ মানুষেব মাথাও গোলমাল হয়ে যায় বই কি।"

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

সূর্যপূজারীর অভিশাপ

অশোক বলল, "খাতাটা আপনার কাছে আছে না কি?"

"হুঁ আছে", ভবতোষবাবু বললেন, "যত্ন করে লোহার সিন্দুকে তুলে রেখেছি। কিন্তু সে ত গুজরাটি ভাষায় লেখা বহু পুরনো ঝুরঝুরে একটা খাতা। সেটা দেখে কিছু বুঝতে পারা কঠিন। তবে আমি একজন গুজরাটি ভদ্রলোককে দিয়ে ইংরিজিতে হুবহু তর্জমা করিয়েছি; তর্জমাটা পড়ে মনে হয় শ দেড়েক বছর আগে উদয়চন্দ্রের কোনো পূর্বপুরুষ-এর লেখা।"

অশোক বলল, "তা হলে খাতাটা পরে দেবেন, একটু দেখব। আপাতত মোটামুটি বলুন তাতে কী ঘটনার কথা লেখা আছে।"

"বলছি", ভবতোষবাবু বললেন, "কিন্তু তার আগে বাটলি-ওয়ালা বংশের আদি বাড়ি সম্বন্ধে দু-একটা কথা বলে নেওয়া দরকার। কেননা, খাতায় যে কথা লেখা আছে তার ঘটনাস্থল হল সেই পুরনো বাড়ি। সান্তা ক্রুসে সমুদ্রের ধারে উদয়-ভবন বলে একটা বাড়ি আছে দেখেছ বোধ হয়। সেটা কিন্তু ওঁদের আদি বাড়ি নয়। উদয়চন্দ্র সেটা তৈরি করেছেন। এই

এগিয়ে গেলে—অনেকদূর এগিয়ে গেলে—একেবারে ফাঁকা জায়গায় গিয়ে পড়বে। সেখানে চোখে পড়বে একটা ভাঙা বিরাট প্রাসাদ, সেটাই ছিল ওদেব আদি বাড়ি। সমুদ্রের ঠিক কোলেই একটা ছোট পাহাড়মতো, এবং তাব ওপব সেই বিরাট পোড়ো বাড়িটা ওদের বংশের অতীত ঐশ্বর্যের প্রেতের মতো আজও দাঁড়িয়ে আছে। ওই বাড়িটাতেই গত পঁচিশ বছব ওঁরা বংশ পবম্পরায় জীবন কাটিয়েছেন। মাত্র বছব পঁচিশ আগে উদয়ানন্দ সেটা ছেড়ে দিয়ে সান্তা ক্রস-এর লোকালয়ে তাঁর উদয়-ভবন তৈরি করে উঠে এসেছেন।”

“সে বাড়িটা ছাড়লেন কেন কিছু জানেন?”—অশোক প্রশ্ন করল।

“হুঁ। শুনেছি সমুদ্রে জোয়ার এলে পাহাড়টার চাবদিক জলে ভবে যায়, তখন নৌকোয় ছাড়া জমিতে আসবার আর কোনো উপায় থাকে না। তাই উদয়ানন্দ ওটা ছেড়ে এসেছেন।”

“ও!”—অশোক বলল, “যাই হোক, আপনি তা হলে এবার সেই খাতায় লেখা ঘটনার কথা বলুন।”

“ববং এক কাজ করি,” ভবতোষবাবু বললেন, “খাতাব তর্জমাটা নিয়ে এসে পড়ে শোনাই। হাবিজাবি অনেক কথাই তাতে লেখা আছে, তবে তার মধ্যে যতটুকু দরকারি ততটুকু বলছি, তুমি না হয় পরে পুরো তর্জমাটা ভালো করে পোড়ো।”

ভবতোষবাবু উঠে গেলেন এবং ঘরের মধ্যে থেকে একটা

ঝুরঝুরে পুরনো নোট-বই আব কতকগুলো টাইপ-কবা কাগজ নিয়ে এলেন। "খাতাটা কার লেখা," চেয়ারে বসতে-বসতে তিনি বললেন, "তা জানা নেই। তবে উদয়ানন্দেব যে পূর্ব-পুরুষ সম্বন্ধে লেখা তাঁব নাম কাওযাসজি বাটলিওয়ালা।" তাবপব নোট-বইটা অশোকেব হাতে দিযে টাইপ-করা কাগজগুলো পড়ে চললেন। সেই ইংবিজিব বাংলা কবলে দাঁড়ায :

কাওযাসজিব শরীবে ছিল পশুব মতো শক্তি, তাঁব মন ছিল পশুর মতই নির্মম আব তাঁব ছিলো অতুল ঐশ্চর্য! লোকে আড়ালে বলত জল-ডাকাতিব গুপ্ত দল আছে, কিন্তু সামনা-সামনি কেউ একটা কথাও বলতে সাহস পেত না। আব তাঁব ছিলো ভাবি অদ্ভুত একটা নেশা দাবা! পৃথিবী যদি ধ্বংসও হযে যায তাহলেও কাওযাসজি দাবার ছক ছেড়ে কিছুতে উঠবেন না! আব এই সর্বনাশী নেশাব সঙ্গে তাঁব মিশেছিলো সীমাহীন দম্ভ : দাবায় কেউ তাঁকে হাবিযে দেবে এ কথা তিনি কোনোমতেই ববদাস্ত কবতে পারতেন না, তিনি বরদাস্ত কবতে পাবতেন না দুনিয়ায় এমন কেউ থাকবে যার নাম খেলোয়াড় হিসেবে তাঁব চেয়ে বড়। অদ্ভুত খেয়াল। কিন্তু সেকালের বড়লোকদেব কথাই আলাদা! কাওয়াসজির মাইনে-করা লোক দেশ-বিদেশে ঘুরত নামজাদা খেলোযাড় ডেকে আনবার জন্যে, আর সেই খেলোরাড়কে পবাস্ত করার

উদ্ধত অট্টহাসিতে।

সেবার কাশী থেকে এল নাম-করা পণ্ডিত। শোনা গেল এমন খেলোয়াড় নাকি তুনিয়ায় নেই। কেউ বললে লোকটা তান্ত্রিক, কেউ বললে পিশাচ-সিদ্ধ, কেউবা বললে মন্ত্রসিদ্ধ! শোনা গেল এঁর তিনটে চাল টেঁকতে পাবে এমন লোক নাকি পৃথিবীতে এ পর্যন্ত জন্মায়নি। টলমল কবে উঠল কাওয়াসজির মন, ছক পেতে ডাকলেন পণ্ডিতজীকে। কিন্তু অত তাড়া কিসের? পণ্ডিতজী বললেন—আজ সন্ধেয় থাক, কাল সকালে বসা যাবে। পরের দিন সূর্যোদয়ের আগে আবছা নরম আলোয় দেখা গেল সমুদ্রের ধারে পণ্ডিতজী স্নান করছেন। স্নান শেষ হল, সমুদ্রের ওপাবে উঠল টকটকে সূর্য। পণ্ডিতজী পাড়ে দাঁড়িয়ে সূর্যের দিকে মুখ করে মন্ত্র আবৃত্তি করতে লাগলেন। প্রাসাদে যখন ফিরলেন তখন তাঁব মুখ যেন থমথম কবছে! অত্যন্ত গম্ভীর গলায় বললেন· পাতো ছক। দাবা খেলতে বসে কাওয়াসজিব কোনদিন ভয় হয় নি, খেলোয়াড হিসেবে তিনিও কম যান না। কিন্তু এই সূর্যপূজারী ব্রাহ্মণ পণ্ডিতেব সামনে বসে সেদিন তাঁব বুকটা কেমন যেন তুবতুর কবে উঠল। সত্যিই কি মন্ত্রসিদ্ধ? হয়ত তাই। কাওয়াসজির মনে কি রকম সব এলোমেলো হয়ে যেতে লাগল—তিন চাল যেতে না যেতেই তিনি দেখলেন কিস্তিব মুখে পড়েছেন এবং সে কিস্তি থেকে

তাঁর অট্টহাসির প্রতিধ্বনি ঘুরতে লাগল বিরাট প্রাসাদটায়, কাওয়াসজির মনে হল প্রাসাদের প্রত্যেক ঘর থেকে বিদ্রূপ ঠিকরে আসছে। একি সত্যি মন্ত্রসিদ্ধি? লোকটা কি সত্যি যাদুকর? লজ্জায়, রাগে, অপমানে কাওয়াসজির সমস্ত শরীর মন ঝাঁঝাঁ করতে লাগলো। বললেন— বোস, আর এক বাজি খেলা যাক। কিন্তু দম্ভের দিক থেকেও ব্রাহ্মণ কাওয়াসজির চেয়ে কম নন, বললেন—তাড়া কি! দুপুরে ঘুমিয়ে নাও, মাথা ঠাণ্ডা হবে। বিকেলে আবার বসা যাবে। পারো ত ইতিমধ্যে খানিকটা গাওয়া ঘি খেয়ে নাও, মাথা খুলতে পারে। কাওয়াসজিকে বোবা আক্রোশ চেপেই রাখতে হল; তখনো তাঁর সামনে মাৎ-হয়ে-যাওয়া ছক!

লোকটা সত্যিই কিন্তু যাদুকর। সত্যিই কিন্তু মন্ত্রসিদ্ধ! নইলে, বিকেলে আবার খেলতে বসার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই কাওয়াসজির সামনে সবকিছুই অমন এলোমেলো হয়ে গেল কেন? কিস্তি পড়ল, এবার ঘোড়ের কিস্তি, সবচেয়ে অপমানজনক কিস্তি! আরও অপমানজনক হল ব্রাহ্মণের হাবভাব — কিস্তি দিয়েই উঠে দাঁড়ালেন, যেন তাঁর দেওয়া কিস্তি থেকে পরিত্রাণ পাওয়া মানুষের সাধ্যের অতীত। বললেন: তুমি চাল ভাবো। সমুদ্রের ধারে ততক্ষণ হাওয়া খেয়ে আসি।

তখন সূর্য অস্ত যাচ্ছিল, সমুদ্রের জল যেন রক্ত করবীর

মতো লাল। পণ্ডিতজী গিয়ে দাঁড়ালেন চকচকে বালির ওপর, আর সূর্যের দিকে মুখ করে স্তব্ধ তন্ময় হয়ে রইলেন। তাঁর হুঁস ভাঙল কাওয়াসজির উত্তেজিত ডাকে। কাওয়াসজির চেহারায় যেন ঝড় আসবার আগেকার স্তব্ধতা। বললেন— "খেলা ছেড়ে উঠে এলে যে!" পণ্ডিতজী অবাক হয়ে বললেন—"খেলা? খেলা ত শেষ হয়ে গিয়েছে।" "কী রকম? আমি চাল দিয়েছি। চলো।" পণ্ডিতজী হো-হো করে হেসে উঠলেন "অসম্ভব। আমার কিস্তির পরেও চাল? পৃথিবীতে আজ পর্যন্ত কেউ তা পারেনি।" কাওয়াসজি যেন কথা বাড়াতে চান না, ছোট করে বললেন "দেখবেই চলো না।" "বেশ।" পণ্ডিতজীও এগুলেন। কিন্তু ঘরে ফিরে দাবার দিকে একটু চেয়ে পণ্ডিতজী হঠাৎ চীৎকার করে উঠলেন, "জোচ্চর! ঘুঁটি নিশ্চয়ই এদিক-ওদিক করেছো! ছক এ রকম ছিলো না।" "মুখ সামলে কথা বলো," কাওয়াসজিও চীৎকার করে উঠলেন। সন্ত্রস্ত হয়ে উঠল বাড়ির সমস্ত লোকজন। দুজনের বচসা প্রায় চরমে পৌঁছলো। শেষ পর্যন্ত কাওয়াসজি বললেন, "বেশ। আবার শুরু কর গোড়া থেকে।" কিন্তু না। পণ্ডিতজী কিছুতে রাজি নন। সূর্য ডুবে গিয়েছে। আকাশে সূর্য নেই। পৃথিবীতে অন্ধকার। এ সময় দাবার ছকে তিনি কোনোমতে বসতে রাজি নন। তাঁর খেলার সাক্ষী সূর্যদেব! খেলার প্রেরণা সূর্যদেব!

এবার হাসবার পালা কাওয়াসজির। "যা ভেবেছিলুম ঠিক তাই! বুজরুক! মস্ত বড় বুজরুক! খেলতে শিখে তুমি হারাও না, তুমি হারাও দৈবের কৃপায়, সূর্য-সিদ্ধির জোরে।"

কিন্তু ব্যাপারটা শুধু হাসাহাসিতেই শেষ হল না। দম্ভের সীমা নেই পণ্ডিতজীর! দম্ভের শেষ নেই কাওয়াসজির। প্রকাশ্যে দুটো দম্ভের ঢেউ উলটো মুখে এসে যেন ধাক্কা খেল আর সেই ধাক্কায় সবই একেবারে রসাতল হয়ে গেল! ব্যাপারটা গড়ালো হাতাহাতিতে এবং তারপর আরও জঘন্য অবস্থায়—খুনোখুনীতে! পণ্ডিতজীর কোমর থেকে বেরিয়ে এল চকচকে তীক্ষ্ণ ছোরা, কাওয়াসজির শরীরের প্রত্যেকটি পেশী ফুলে উঠল। বাড়িতে আর কোথাও টুঁ শব্দটি নেই; টুঁ শব্দ করবার সাহসও নেই কারুর। কাওয়াসজির রাগ সবাই জানে, সবাই জানে কী ভয়াবহ এর পরিণাম। সেই পরিণাম মেনে নিতে হল পণ্ডিতজীকে। বিরাট সবল একহাতে কাওয়াসজি ব্রাহ্মণের ছোরা-শুদ্ধ হাত চেপে ধরলেন আর এক হাতে টিপে ধরলেন তাঁর টুঁটি। তারপর টানতে-টানতে নিয়ে চললেন তাঁর দেহটা বাড়ির পেছনের চোরা সিঁড়ি দিয়ে নীচের দিকে। চোরা সুড়ঙ্গটা শেষ হয়েছে একেবারে সমুদ্রের ওপরে গিয়ে। রুক্ষ পাথুরে মেঝের ওপর সমুদ্রের জল ছলাৎ-ছলাৎ করছে। লোকে বলত এটা জলপথে ডাকাতি করার জন্যে লুকিয়ে আনা-গোনার পথ। মাথার ওপর লোহার বিম-বর্গা, তাতে

আংঠা পরানো, দড়ি বাঁধা। জোয়ারের সময় জল যখন মেঝে ছাড়িয়ে ফেঁপে ওঠে তখন সেই আংঠায় নৌকো বাঁধা হত।

পণ্ডিতজীর হাত থেকে ছোরাটা ছিনিয়ে নিয়ে কাওয়াসজি টান মেরে সমুদ্রের দিকে ফেলে দিলেন। তারপর এক হাতে তাঁর ঘাড়টা টিপে ধরে আর এক হাতে কড়িকাঠ থেকে দড়ি খুললেন। পণ্ডিতজীর পা দুটো শক্ত করে বাঁধলেন সেই দড়িতে আর তারপর সেই দড়ি দিয়ে বাঁধা পা দুটো আটকে দিলেন কড়িকাঠের আংঠায়। হেঁটমুণ্ড অবস্থায় ঝুলতে লাগল পণ্ডিতজীর দেহটা। তারপর সুড়ঙ্গ ছেড়ে উঠে এলেন কাওয়াসজি। সেদিন ছিল অমাবস্যা।

কাওয়াসজির চোখে ঘুম নেই, দালানে উত্তেজিত ভাবে পায়চারি করে চললেন। সুড়ঙ্গের ভেতর থেকে কাতর মিনতি আর গোঙানি ভেসে আসতে লাগলো। তারপর সমুদ্রে জোয়ার এলো, নোনা জল ফেঁপে উঠল আর সেই নোনা জলে ডুবে পণ্ডিতজীর গোঙানি বন্ধ হয়ে গেল।

সকাল বেলায় কাওয়াসজি সুড়ঙ্গ বেয়ে নামলেন। দেখলেন জোয়ারের নোনা জলে ডুবে পণ্ডিতজীর মৃত মুখটা একেবারে ফ্যাকাশে লালচে হয়ে গিয়েছে আর তাঁর মাথার ওপর একটা বাদুড় ঘুরপাক খাচ্ছে। বীরদর্পে কাওয়াসজি একবার পণ্ডিতজীর মুখের দিকে চেয়ে দেখলেন; তিনি হয়তো এক পৈশাচিক অট্টহাসি হেসে উঠতেন কিন্তু হাসতে পারলেন না।

তাঁর বিরাট সবল শরীর শিউরে উঠল এক অদ্ভুত আতঙ্কে: তিনি দেখলেন, স্পষ্ট দেখতে পেলেন পণ্ডিতজীর ফ্যাকাশে মুখে ফুটে উঠছে একটা ক্ষীণ অস্পষ্ট হাসি—সে হাসি বরফের মতো ঠাণ্ডা, বরফের মতো জমাট। উল্টো করে ঝোলানো ফ্যাকাশে নীলচে মুখে স্পষ্ট প্রতিশোধের হাসি! চেয়ে থাকতে-থাকতে কাওয়াসজির মাথার মধ্যেটা কী রকম ঝিমঝিম করতে লাগল, আর সেই বাদুড়টা—যেটা ঘুরপাক খাচ্ছিল পণ্ডিতজীর মৃতদেহের ওপর, সেটা সরে এসে ঘুরপাক খেতে লাগল কাওয়াসজির মাথার ওপর। কাওয়াসজি সেটার দিকে চাইলেন আর একেবারে চমকে উঠলেন সমুদ্র থেকে ঠিকরে-আসা সকালের কোমল আলোয় মনে হল বাদুড়টাও কী রকম যেন অবাস্তব, কী রকম নীলচে যেন তার মুখটাও—আর যেটা সবচেয়ে বীভৎস—বাদুড়টার মুখেও অস্পষ্ট ঠাণ্ডা একটা হাসি!

কাওয়াসজির পক্ষে আর দাঁড়িয়ে থাকা সম্ভব নয় সুড়ঙ্গ দিয়ে দৌড়ে বেরিয়ে এলেন। তাঁর শরীরটা তখন থরথর করে কাঁপছে! একটা চাপা আতঙ্কের চীৎকার বেরিয়ে এল তাঁর মুখ থেকে। বাদুড়টাও সুড়ঙ্গ দিয়ে তাঁর সঙ্গে-সঙ্গে উঠে এসেছে এবং মাথার ওপর ঘুরপাক খাচ্ছে। দৌড়ে এল লোকজন, চাকরবাকর। কাওয়াসজি প্রায় উন্মাদের মতো চীৎকার করতে লাগলেন—'আমার শনি, আমার শয়তান! মেরে ফেল ওটাকে!' কিন্তু আশ্চর্য: তখন আর বাদুড়টার কোনো চিহ্ন নেই!

তারপর কিছুদিন কাটল একরকম নির্বিঘ্নেই। কাওয়াসজি অনেকটা যেন সামলে নিলেন। কিন্তু, ঠিক এক মাস পরে, আবার যেদিন অমাবস্যা ঘুরে এল, সেদিন সুরু হল সেই বিপদ। রাতে খাওয়া-দাওয়ার পর কাওয়াসজি শুয়ে-শুয়ে তামাক টানছিলেন, হঠাৎ মনে হল ঘরের মধ্যে একটা অস্পষ্ট শব্দ। তিনি চমকে উঠে বসলেন। সামনের দিকে চাইলেন—কিছু নেই। ঘাড় ফেরালেন—পেছুনেও কিছু নেই! অথচ শব্দ। কাওয়াসজি ওপরের দিকে চাইলেন আর সঙ্গে-সঙ্গে চীৎকার করে উঠলেন। একটা বাদুড—সেই বাদুড়টাই! মনে হল নরকের আগুন থেকে সবেমাত্র উঠে এসেছে, তার গায়ে নরকের নীলচে আভা আর সবচেয়ে বীভৎস, সবচেয়ে সাংঘাতিক ব্যাপার হল তার ফ্যাকাশে মুখে একটা অদ্ভুত হাসি,—পণ্ডিতজীর মৃত মুখের মতো। এল লোকজন, এল আলো। কিন্তু তখন আর বাদুড়টার চিহ্ন নেই।

তারপর আবার এক মাস কাটল প্রায় শান্ত ভাবেই। আবার অমাবস্যার রাত এল আর এল প্রেতলোকের সেই প্রতিনিধি। সেদিনও রাতে খাওয়াদাওয়ার পর তিনি শুয়েছিলেন। হঠাৎ খেয়াল হল পাশের ছোট ড্রেসিং-রুমটায় তিনি দামী হীরে-বসানো রিস্টওয়াচটা ফেলে এসেছেন।

রিস্টওয়াচটার কথা মনে পড়ার সঙ্গে-সঙ্গে কাওয়াসজি বিছানা ছেড়ে উঠলেন, ড্রেসিং-রুমে গেলেন। পাশের ঘরটায়

প্রকাণ্ড এক ড্রেসিং টেবিল আর কাপড়ের আলনা ছাড়া কিছু ছিল না। কাওয়াসজি ঘরে ঢুকেই কিন্তু একেবারে পাথরের মতো স্তব্ধ হয়ে গেলেন : ঠিক সামনে, ড্রেসিং-টেবিলটার কাছে, হাওয়ায় ভাসছে একটা মানুষের মুখ, সোজা ভাবে নয় উলটো ভাবে ! কার মুখ চিনতে দেরি হয় না। কাওয়াসজির অচেতন শরীরটা মাটিতে লুটিয়ে পড়ল।

তারপর একটা অদ্ভুত ভয় তাঁকে পেয়ে বসল। দিন নেই রাত নেই—একটা অস্পষ্ট আতঙ্কে তিনি শিউরে ওঠেন। বিড়বিড় করে শুধু বলেন : অভিশাপ, সেই সূর্যপূজারীর অভিশাপ। আমি বেশ বুঝছি আমার সময় ফুরিয়ে আসছে। আমি শুনতে পাচ্ছি প্রেতলোকের ডাক, আমায় যেতে হবে। সেখানে আমার সঙ্গে সূর্যপূজারীর বোঝাপাড়া।

অদ্ভুত ভয়। আর এই ভয়ের হাত থেকে নিষ্কৃতি পাবার জন্যে অদ্ভুত উপায়। কাওয়াসজি আফিম ধরলেন। কিন্তু আফিমের পরিমাণ দিনকের দিন যতই বেড়ে চলুক অভিশাপের হাত থেকে নিষ্কৃতি নেই, মুক্তি নেই প্রেতের আহ্বান থেকে। প্রতি অমাবস্যার রাতে সেই প্রেত দেখা দিতে সুরু করল আর মনে করিয়ে দিতে লাগল বিচারের দিন ঘনিয়ে আসছে। এইভাবে কাটল পুরো ন'মাস। তখন কাওয়াজির অবস্থা একেবারে পাগলের মতো! আফিমের মাত্রাও প্রায় সম্ভবের সীমা পেরিয়ে গিয়েছে!

সেদিনও ছিল অমাবস্যার রাত। কাওয়াসজি প্রেতের আহ্বানকে আর ঠেকিয়ে রাখতে পারলেন না। স্বপ্নচালিতের মতো নিঃশব্দে চললেন সেই সুড়ঙ্গের দিকে। আর পরদিন সকালে তাঁর মৃতদেহ আবিষ্কৃত হল সুড়ঙ্গের মধ্যে। পাশে পড়ে রয়েছে আফিমের আধখালি একটা বড় কৌটো। ভয়ে না আফিমের বিষে—কিসে মৃত্যু হয়েছে বোঝা গেল না।

সূর্যপূজারীর অভিশাপ কিন্তু তাঁর মৃত্যুতেই শেষ হয়নি। তার বংশে এ অভিশাপ ঘুরে ফিরে দেখা দিতে লাগল। কিন্তু দেখা দিতে লাগল এক ভারি আশ্চর্য ভাবে—ঠিক এক পুরুষ অন্তর। তাঁর ছেলের কোনো বিপদ ঘটেনি, কিন্তু সেই ছেলের আর ছেলে ছিল না বলে তার মৃত্যুর পর সমস্ত সম্পত্তি যায় তার ভাইপোর হাতে। এবং এই অভিশপ্ত সম্পত্তি পাবার পর সে-ও পায় প্রেতের আহ্বান। সে আহ্বান প্রথম এল অমাবস্যার রাতে এবং আটটা অমাবস্যা কাটবার আগেই আফিমের নেশায় আর প্রেতের আতঙ্কে তার মাথা একেবারে খারাপ হয়ে যায়। নবম অমাবস্যার পরদিন তারও মৃতদেহ পাওয়া যায় ওই সুড়ঙ্গের মধ্যে। এবারও বোঝা যায় নি, ভয়ে না আফিমের বিষে—কিসে হল তার মৃত্যু। এক পুরুষ অন্তর এই বংশে সূর্যপূজারী ব্রাহ্মণের অভিশাপ ঘুরে ফিরে দেখা দিচ্ছে। এর শেষ কোথায়?

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

ইতিহাসের সংস্কার

ভবতোষবাবু কাগজগুলো গুছিয়ে টেবিলে রাখলেন।

চুপচাপ। কারুর মুখে কোনো কথা নেই। অশোক সমুদ্রের দিকে অলস ভাবে চেয়ে কী যেন ভাবছে। কুঁচকে উঠেছে তার বাঁ কপালের শিরা, তার ডান হাত বেতের চেয়ারের হাতলে, বাঁ হাতের আঙুল দিয়ে সম্পূর্ণ অর্থহীন ভাবে টেবিলের ওপর টোকা দিচ্ছে।

সকলের চোখ অশোকের মুখের ওপর, অশোকের চোখ সমুদ্রের ওপর কী যেন খুঁজে বেড়াচ্ছে।

স্তব্ধতা ভাঙলেন দিদি, "কী ভাবছ অশোক ?"

অশোকের মুখে খুব পাতলা, খুব ঠাণ্ডা এক রকম হাসি ফুটে উঠল। বাঁ-দিকের কপালটা সহজ সরল হয়ে এলো। "ভাবছি," সমুদ্রের দিকে চেয়ে থাকতে-থাকতেই অশোক বলল, "শাস্ত্রে আছে মুনি-ঋষিদেরও মাঝেমাঝে ভুলচুক হয়।"

"কিন্তু হঠাৎ এ-কথার মানে ?"

"মানে কিছুই নেই। এমনি বললাম।"

"উঁহু। এমনি বলবার ছেলে ত তুমি নও।"

অশোকের মুখের ফিকে পাতলা হাসি আস্তে-আস্তে যেন

জমাট বাঁধতে লাগলো। আপন মনেই বলল, "মুনি-ঋষিদেরই যখন ভুলচুক হয় তখন সামান্য প্রেতের ত হতেই পারে। তবে এ প্রেত খুব সাধারণ প্রেত নয়, ধুরন্ধর প্রেত।"

"প্রেতের ভুলচুক?"

"হুঁ। তবে অনেকখানি নির্ভর করছে ভবতোষদা যে অনুবাদটা পড়লেন সেটা কতখানি খাঁটি অনুবাদ তার ওপর।"

"কিছুই বুঝছি না বাপু," ভবতোষবাবু বিব্রতভাবে বললেন, "হেঁয়ালী রেখে সোজা কথা বল।"

"এখন কিছু বোঝবার দরকার নেই," অশোক বলল, "আপনি উঠে স্নান-খাওয়া করতে যান। খাতাটা আর টাইপ-করা কাগজগুলো আমায় দিয়ে যান। আমি ততক্ষণ কুনুকে নিয়ে সমুদ্রের ধারে খানিকটা ঘুরে আসি।"

কুনু কী যেন বলতে যাচ্ছিল, কিন্তু অশোকের মুখের দিকে চেয়ে থেমে গেল। একটা কী রকম আদেশের ভঙ্গী অশোকের মুখে। কুনু বুঝল বেড়াতেই যাক আর বেড়াতে যাবার নাম করে নরকেই যাক, এখন তর্ক করবার উপায় নেই। মানতে হবে। আদেশের স্পষ্ট ছায়া অশোকের মুখে। ফলে, কোমর থেকে চাদরটা নামিয়ে কুনু উঠে পড়ল!

পুরনো ঝুরঝুরে খাতা আর টাইপ-করা কাগজগুলো গুছিয়ে নিতে-নিতে অশোকও উঠে দাঁড়াল। টেবিলের ওপরকার চামড়ার ছোট বাক্সটার দিকে চেয়ে দিদিকে বলল, "ওটা খুব

সাবধানে আমার ঘরে রেখে দিও। প্রেতের সঙ্গে লড়াই করতে হলে পদে-পদে ওটার দরকার পড়তে পারে।"

তারপর অশোক আর কিছু বলল না। সোজা হাঁটতে সুরু করল ফটকের দিকে। কুনু বেচারা নিরুপায় ভিজে বেড়ালটির মত চলল তার পেছুপেছু।

ফটক পেরিয়ে অশোক বলল, "ত্রিবেদীকে চিনিস ?"

কুনু অবাক হয়ে বলল, "কে ত্রিবেদী ?"

"এখানের বাসকুইয়া কলেজের অধ্যাপক। ভারি পণ্ডিত লোক।"

"কিন্তু আমি চিনব কেমন করে ?"

"তাই ত ভাবছি। চ আমার সঙ্গে। আলাপ করে তৃপ্তি পাবি। গোটাকতক বাড়ির পরেই থাকেন। মারাঠি লোক, বিজ্ঞানের অধ্যাপক। কিন্তু জানেন না হেন বিষয় নেই। বিশেষ করে এ অঞ্চলের ইতিহাস ও এদিকে প্রচলিত প্রত্যেকটি ভাষা সম্বন্ধে সত্যি অগাধ জ্ঞান। সমুদ্রের ধারে বেড়াতে-বেড়াতে সেদিন আমার সঙ্গে আলাপ হয়েছে। দুদণ্ড কথা বললেই বুঝবি কী অসাধারণ পণ্ডিত।"

"দেখ অশোক," হাঁটতে-হাঁটতে গেঁয়ার ঘোড়ার মতো কুনু হঠাৎ থমকে দাঁড়াল, "দেখ অশোক, তুই ত জানিসই ছেলেবেলা থেকে কোনদিনই আমার পণ্ডিতদের সঙ্গে বনে না। ইস্কুলে হেডপণ্ডিতমশাই আমাকে কোনদিন ক্লাসে বসতে দিতেন না,

আমিও কোনদিন তাঁকে নির্বিঘ্নে পড়াতে দিতুম না। পণ্ডিতেরা আমায় পছন্দ করেন না, আমিও পণ্ডিতদের—"

কুনুর বক্তৃতায় বাধা দিয়ে অশোক হঠাৎ বলে উঠল, "এই বাঁ দিকের বাড়িটাই। চ তোকে মানুষ করে আনি।"

অধ্যাপক ত্রিবেদী অত্যন্ত সৌম্য প্রকৃতির ভদ্রলোক। কম কথা বলেন, কিন্তু যে কটি কথা বলেন তার প্রত্যেকটিই ওজন করা, শুনলেই বোঝা যায় অনেকখানি তলিয়ে, হিসেব করে, তবে বলছেন।

"আসুন মিঃ রায়," ত্রিবেদী অশোককে দেখে আনন্দে যেন ভরে উঠলেন।

অশোক কুনুর সঙ্গে তার পরিচয় করিয়ে দিল।

"আপনিও কি আপনার বন্ধুর মতো সমাজতত্ত্ব নিয়েই গবেষণা করেন ?" ত্রিবেদী প্রশ্ন করলেন কুনুকে। কুনু ত অবাক! এই ত্রিবেদী বলে পণ্ডিতটি যদি পাগল না হয় তাহলে তার কথার একমাত্র মানে দাঁড়ায় এই যে অশোক সমাজতত্ত্ব নিয়ে গবেষণা করে। অথচ, নেহাৎ পাগল ছাড়া এমন কথা আর কে বলতে পারে ? গোয়েন্দাকে সমাজতত্ত্বের গবেষক বলে মনে করা ত সুস্থ মাথার লক্ষণ নয়। হতভম্ব হয়ে কুনু অশোকের দিকে চাইল ; কিন্তু অশোকের মুখে সেই অদ্ভুত হাসি, সে হাসির মানে কুনু আজ পর্যন্ত আঁচ করতে পারল না।

"কিন্তু মিঃ রায়," অধ্যাপক ত্রিবেদী বলে চললেন, "সেদিন আপনার সঙ্গে আলোচনা হবার পর ব্যাপারটা নিয়ে আমি অনেক ভেবেছি, নিজের সঙ্গে অনেক তর্ক করেছি। আপনার—"

অশোক বাধা দিয়ে বলে উঠল, "সে তর্ক আপনার সঙ্গে পরে হবে। আপাতত, একটা দায়ে পড়ে এসেছি। আপনি যদি একটু সাহায্য করেন -"

"নিশ্চয়ই, নিশ্চয়ই—"

"একটা খুব পুরনো খাতা জোগাড় করেছি। সে সম্বন্ধে আপনার সঙ্গে কিছু আলোচনা করতে পারলে খুশি হতুম।"

"আমার সাধ্যে যতটুকু কুলোয় সানন্দে করব।"

"গুজরাটি ভাষায় লেখা খাতা। এ অঞ্চলের পুরনো ইতিহাসও তাতে কিছু পাওয়া যাচ্ছে। আমি না জানি এর ভাষা, না জানি এ অঞ্চলের কথা। তাই গোটাকতক জিনিস আপনার কাছে যাচাই করিয়ে নিতে চাই। মনে হয়, খাতার লেখক শ'দেড়েক বছর আগে এ দিকে বাস করতেন। আপনাকে অনুরোধ করছি খাতাটা ভাষার দিক থেকে এবং ঐতিহাসিক তথ্যের দিক থেকে নির্ভুল কিনা বিচার করে দেখতে।"

খাতাটা হাতে নিয়ে ত্রিবেদী অতিমাত্রায় উৎসাহী হয়ে উঠলেন, "এটা যে একটা অতি প্রাচীন পুঁথি তা ত চেহারা দেখলেই বোঝা যায়। কালিটা ফ্যাকাশে বাদামি হয়ে গিয়েছে, পাতাগুলো হয়ে গিয়েছে ঝুরঝুরে হলদে। নির্ভুল

কি না প্রশ্ন করছেন কেন? এর মধ্যে থেকেই হয়ত এমন কয়েকটি দুর্মূল্য তথ্য পাওয়া যাবে যার ওপর নির্ভর করে প্রাচীন গুজরাটি ভাষা এবং এ অঞ্চলের প্রাচীন ইতিহাস সম্বন্ধে মতবাদগুলি যাচাই করে নেওয়া যাবে। খাতাটার যে বয়েস দেড়শ'র ওপর তা ত আপনি দেখেই বুঝতে পারছেন।"

"হুঁ। শুধু চোখে দেখে ত তাই মনে হচ্ছে!"

ত্রিবেদী খাতাটার পাতা উলটে রীতিমতো উত্তেজিত হয়ে উঠলেন, তাঁর চোখদুটো চকচক করতে লাগলো। "মিঃ রায়," সোৎসাহে তিনি বললেন, "খাতাটা আমার কাছে রেখে যেতে পারেন? এর মধ্যে এমন সব কয়েকটা তথ্য পাচ্ছি যার ওপর নির্ভর করে প্রবন্ধ লিখলে প্রাচীন গুজরাট সম্বন্ধে প্রচলিত থিয়োরিগুলো গুঁড়ো করে ভেঙে ফেলতে পারব।"

"বেশ ত," অশোক বলল, "আজ দুপুর তিনটে নাগাদ এসে খাতাটা নিয়ে যাব। ততক্ষণ আপনি পড়ুন।"

"কিন্তু এ খাতা ফেরৎ নিয়ে আপনি কী করবেন? আপনি ত এ ভাষা জানেন না। অথচ এ খাতাটা যদি আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ে দান করেন তা হলে—"

"বেশ ত। সেটা আর এমন কী বেশি কথা হল! আজ দুপুর তিনটে থেকে শুধু পাঁচটা পর্যন্ত খাতাটা আমার চাই। তারপর আপনাকে দিয়ে দেব, আপনার মহামূল্য প্রবন্ধ-ট্রবন্ধ লিখবেন।"

ত্রিবেদী অবাক হয়ে অশোকেব দিকে চেয়ে বইলেন।

অশোক উঠে দাঁড়াল।

"তা হলে আমি তিনটে নাগাদ এসে খাতাটা নিয়ে যাব; ইতিমধ্যে আপনি যদি একটু পড়ে বাখেন এবং আমায় যদি তখন জানান কোন-কোন নতুন তথ্য আবিষ্কৃত হল, তাহলে অত্যন্ত কৃতজ্ঞ বোধ কবব।" তাবপর কুনুব দিকে ফিরে বলল, "চল কুনু, আমাদের আবাব এখনি হর্নবি বোডে যেতে হবে।"

"হর্নবি রোড! সে আবার কি?"

"সেখানেই ত খবরের কাগজের বড়-বড় আপিস।"

"কিন্তু," ত্রিবেদী ব্যগ্রভাবে বললেন, "আপনি খবরেব কাগজে এখনি খাতাটার খবর দেবেন না! তা হলে ওবা এখনি এমন হৈচৈ পড়িয়ে দেবে!—জানেনই ত বোম্বাই-এর কাগজ-ওয়ালারা একটু ছুতো পেলেই লম্বাই-চওড়াই খবর ছাপিয়ে দেয়।"

"হুঁ। তাই ত দেখছি। এ খাতাটার কথা আমি কিছুই বলব না, তবে ওবা যে কেমন কবে খবব জোগাড় কবে সেটুকু জানবাব আগ্রহ হয়েছে।"

অশোক উঠে দাঁড়িয়ে হাত তুলে নমস্কার কবল, "তাহলে এখন উঠি। দুপুর তিনটে! কী বলেন?"

"হুঁ, তিনটে!" খাতাটার প্রতি আত্মনিয়োগ কবে ত্রিবেদী বললেন, "নমস্কার।"

পথে বেবিয়ে এল আশোক আব কুনু।

"তুই ঠিকই বলেছিলি, কুনু। পণ্ডিতেরা আসলে কোনো কাজেরই নয়!" অশোক পথে বেরিয়ে বলল, "জানতে চাইলুম খাতাটা ঠিক আছে কিনা আর ভদ্দরলোক ভাবতে বসলেন দেড়শ বছর আগেকার ইতিহাসটা ঠিক আছে কিনা!" কুনু এসবের কিছুই মানে বুঝতে পারছিলো না। অবাক হয়ে অশোককে কী যেন জিজ্ঞেস করতে যাচ্ছিল। কিন্তু অশোক তখন তীব্রভাবে মুখ দিয়ে "স্‌…স্‌…" করে শব্দ করছে। চীৎকার করে শিষ দেবার মতন অনেকটা! কুনু আরও অবাক হয়ে গেল যখন দেখল সেই শব্দের আহ্বানে পথের ধাবন্ত একটা ট্যাক্সি বোঁ করে ঠিক ওদের সামনে এসে ব্রেক কসল।

"হর্নবি রোড," গাড়িতে উঠে অশোক ড্রাইভারকে বলল। তারপর পাশে কুনুর দিকে চেয়ে, "তুই ত আর বোম্বাই সহর ঘুরে দেখলি নে। এখানে লোকজনকে ডাকতে হলে ওই রকম কুস্বর করতে হয়।"

ট্যাক্সি ছুটে চলল।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

ওষুধের দোকানে চাবি

কনু অবাক হয়ে গেল। ইতিমধ্যেই বোম্বাই সহর অশোকের যেন নখদর্পণে এসে গিয়েছে। কুনুর এখনো দীর্ঘ ট্রেন-জার্নির ব্যাথা গা থেকে মরেনি, হাই তুলতে-তুলতে আর আলসেমি করতে-করতে ও ভাবছিল বিশ্রাম এখনো সম্পূর্ণ হয়নি। আর এরই মধ্যে কোন ফাঁকে বেরিয়ে আর বেড়িয়ে অশোক রীতিমতো সহর আর শহরতলি চষে ফেলেছে। এবং, শুধু তাই নয়, খুঁটিনাটি পথঘাট পর্যন্ত যেন মুখস্থ করে ফেলেছে। ট্যাক্সিতে দ্রুত বেগের সঙ্গে সমানে তাল রেখে অশোক গড়গড় করে কুনুকে বুঝিয়ে চলল, "এই হল দাদার। এদিকেই বোম্বাই-এর আসল বাঙালী মহল। একটু এগিয়েই বাঙালী ছেলেমেয়েদের ইস্কুল। প্যারেল। প্যারেলের ময়দান। গিরনি কামগড় ইউনিয়ন। ভারতবর্ষে মজুরদের এত বড় ইউনিয়ন আর কোথাও নেই।... সিনেমার স্টুডিও বাঁ দিকে এগুলো। কত স্টুডিও আছে বোম্বাইতে? ওঃ অনেক।· ছাপা সাড়ির দোকান। আর একটু ওপাশে এগুলে কোলাপুরি চটির আড়ৎ পাওয়া যাবে।..."

অবশেষে হর্নবি রোড। খবরের কাগজের আপিস খুঁজে বের করতে একটুও কষ্ট হল না কিন্তু কষ্ট হল কর্তাদের কাছে

আসল কথাটা পাড়তে। অশোক বলতে চায় যে প্রতাপচন্দ্রের মস্তিষ্ক বকৃতির খবর খবরের কাগজওয়ালাদের পক্ষে অত তাড়াতাড়ি, প্রায় রাতারাতি, পাওয়া একেবারে তাজ্জব ব্যাপার বলেই মনে হয়। কেন না, এ কোন সভাসমিতির খবর নয়, মিছিল-মজলিসের খবর নয়, খেলাধুলোর খবর নয়, সিনেমা-থিয়েটারের খবর নয়, যে কাগজওয়ালারা আগে থেকেই আঁচ করে ওৎ পেতে বসে থাকবে। প্রতাপচন্দ্রও যেমন চাপা প্রকৃতির লোক বলে শোনা গেল যে তিনি স্বেচ্ছায় সবাইকে ডেকে এ-কথা বলে বেড়াবেন তাও ত মনে হয় না। তাহলে খবরটা বেরুল কেমন করে? আর শুধু যে বেরুল তাই নয় একেবারে খবরের কাগজে ছাপা হয়ে গেল!

কুনু অবশ্য অশোকের আসল উদ্দেশ্যটা ঠাহর করতে পারেনি। না হয় মানাই গেল যে খবরটা বেরুবার কথা নয় তবুও বেরিয়ে পড়েছে, এমন কি ছাপা পর্যন্ত হয়ে গিয়েছে। কিন্তু তার সঙ্গে ভূত ধরবার যোগাযোগ কোথায়? ট্যাক্সিতে আসতে-আসতে এ নিয়েও দুজনের মধ্যে কিছু কথাবার্তা হয়েছিল। অশোক সোজা জবাব দিতে চায়নি। হেঁয়ালী করেই বলেছিলো, "খবরটা স্বয়ং ভূত খবরের কাগজের কাছে পৌঁছে দিয়েছেন কি না তা আবিষ্কার করা দরকার।"

কিন্তু কে যে খবরটা পৌঁছে দিয়েছে তা আবিষ্কার করা অ... সোজা নয়। কাগজওয়ালা শুধু জাঁক করে বলে, "আমাদের

কাগজ কি অমন যা-তা কাগজ ! দুনিয়ার কোথায় কী হচ্ছে তার সবটাই আমাদের নখদর্পণে !" অশোক নানান ভাবে ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে কথাটা পাড়তে চায়, নানান ছলে বের করতে চেষ্টা করে খবরটা কেমন করে তারা পেল ! কিন্তু বুদ্ধির লড়াই করা যায় শুধু তার সঙ্গেই যার বুদ্ধি আছে, কিন্তু যে বোকার মতো কেবল দম্ভ করে বুদ্ধির বড়াই করে চলে তার সঙ্গে চলে না। কাগজের বড়কর্তা, মেজকর্তা, সব কর্তাই শুধু বুক ফুলিয়ে বলেন, "দুনিয়ার সকলের হাঁড়ির খবর আমরা জানি মশাই, একেবারে হাঁড়ির খবর জানি। ওই ত আমাদের ব্যবসা।"

অশোক একটু বিরক্ত হয়ে বলে, 'সে খবরটুকু ত আমিও জানি 'যে দুনিয়ার সব খবর আপনারা জানেন। কেবল দয়া করে বলে ফেলুন এই খবরটা কেমন করে জানলেন ?"

কর্তারা হাসেন। "জানলুম ? আসলে সেইটুকুই ত আমাদের ট্রেড-সিক্রেট, ব্যবসার গোপন রহস্য। সেটা বুঝলে ত আপনিও নিজে খবরের কাগজের দপ্তর ফাঁদতে পারতেন !"

"ধুত্তোর ট্রেড-সিকরেট," পথে বেরিয়ে অশোক অত্যন্ত বিরক্তভাবে কুনুকে বললে। "এক একটি একেবারে দম্ভের ফানুস, অহংকারের আকাশে হুসহুস করে উড়ছে !"

কুনু বললে, "তোরই বা এ খেয়ালের কী মানে হয় বুঝলুম না। ভূত ধরতে বেরিয়ে ভূতের খবর কে প্রথম জানাল তাই নিয়ে মাথা ব্যথা কেন ?"

"দেখি", অশোক বলল, "ভূতটা যদি ধরতে পারি তখন নিজেই বুঝতে পারবি।"

"আর তখন," কনু অশোককে একটু উৎসাহ দেবার আশায় বলল, "এই সব পেটমোটা কাগজ-ওয়ালারাই ভীড় করে আসবে, অনুনয় করে বলবে কেমন করে ভূতটা ধরা পড়ল, আর তখন আমি এই ফানুসগুলোর পেটে খোঁচা মেরে ভুসভুস করে সমস্ত দম্ভের ধোঁয়া বের করে দেব।"

অশোক হাসতে-হাসতে বলল, "কিন্তু তার আগে ভূতটাকে ধরা দরকার।"

"তা ত নিশ্চয়ই।"

"চল তা হলে সেই চেষ্টা করা যাক।"

"কোথায় যাবি?"

"প্রথম, অধ্যাপক ত্রিবেদীর বাড়ি যাওয়াই উচিত। ভদ্রলোক যেমন ছিটগ্রস্ত মানুষ, মনে হয় তাঁর কাছ থেকেও যে-সব খবর পাব আশা করেছিলুম তাও পাব না। তাই খবর বের করবার জন্য বন্দোবস্ত করতে হবে। প্রথমে একটা ওষুধের দোকানে যাওয়া যাক।"

"ওষুধ? সেখানে কী খবর পাবি?"

"খবর পাব না, তবে খবর বের করবার চাবি পাব।"

"ওষুধের দোকানে চাবি?"

"হুঁ। চ না।"

প্রকাণ্ড ওষুধের দোকান। অশোক কতকগুলো এ্যাসিড প্রভৃতির নাম বলতে দোকানদার কপাল কুঁচকে একটু চেয়ে রইল। তারপর সন্দেহের গলায় বললে, "ডাক্তারের প্রেস-ক্রিপসন আছে?"

অশোক অম্লান বদনে বলল, "হুঁ।" বলে, পকেট থেকে একটা নোটবুক বের করে তার একটা পাতা ছিঁড়ে খসখস করে ঠিক প্রেসক্রিপসন লেখার মতো লিখে ফেলল এবং তলায় একটা নাম সই করে দিল। কুন্তু চোখ গোলগোল করে বন্ধুর কাণ্ডটা দেখতে লাগল। অশোক যে কস্মিনকালেও ডাক্তার নয় এ কথা কুন্তু যত ভালো করে জানে তত ভালো করে আর কেউ নিশ্চয় জানে না। অথচ, কুন্তুর দেখে ভারি মজা লাগল যে, অশোক পাকা ডাক্তারের মতো প্রেসক্রিপসন লিখতে পারে এবং বেমালুম মিথ্যে একটা বাজে সইও পার করে দিতে। কুন্তু আরও অবাক হয়ে দেখল অশোক নিজের সই-এর পাশে দিব্যি নির্লিপ্তভাবে একটা কী যেন উপাধি বসিয়ে দিল।

দোকানদার কপাল কুচকেই কাগজটা নিল এবং তার পরমুহূর্তে তার চোখমুখের চেহারা বদলে গেল। অপ্রস্তুত ভাবে প্রশ্ন করল, "আপনিই কলকাতার সেই বিখ্যাত ডাক্তার এইচ. ঘোষ. এম.ডি?"

অশোক একটু তাচ্ছিল্যের ভঙ্গি করে বলল, "হুঁ।"

দোকানদার প্রায় গদগদ ভাবে বলল, "কাগজে দেখেছিলুম আপনি একটা বিশেষ কেস নিয়ে বোম্বাই আসছেন।"

অশোক বলল, "জানেনই ত কাগজওয়ালারা সবাইকার হাঁড়ির খবর রাখে।"

"কিন্তু," দোকানদার বলল, "আপনি যে স্বয়ং আমার দোকানে পদধূলি দেবেন এমন কথা স্বপ্নেও ভাবতে পারিনি।"

"দেখুন," অশোক ভারিক্কি চালে বলল, "আমি রোগীকে যখন যে ওষুধ দিতে চাই তা শুধু প্রেসক্রিপসনে লিখেই দিই না। বরাবর ওষুধের দোকানে দাঁড়িয়ে নিজে তদারক করে ওষুধ তৈরি করাই। সব কম্পাউণ্ডারেরই ত হাত সমান হয় না!"

"এরকম সাবধানী না হলে কি আর অতবড় ডাক্তার হওয়া যায়?" শ্রদ্ধায়, ভক্তিতে দোকানদার প্রায় নুয়ে পড়ল—বলল, "চলুন, আপনি ওষুধ তৈরি নিজে দেখবেন চলুন।"

"না, আমিই বাড়িতে মিশিয়ে ঠিক মতো ওষুধ তৈরি করে নেব। এ কেসটা বড় কঠিন কেস, নানান রকম পরিমাণ দিয়ে পরীক্ষা করতে হবে। আপনি আমায় এই ওষুধগুলো খাঁটি দিন। দেখবেন, পুরনো স্টক না হয়।"

"নিশ্চয়ই, নিশ্চয়ই", বলতে-বলতে দোকানদার নিজের কোটের সামনের বোতামগুলো ভালো করে এঁটে হন্তদন্ত হয়ে ভেতরের দিকে গেল।

ওষুধের বোতল-টোতলগুলো ভালো করে গুছিয়ে ট্যাক্সিতে

বসে স্বস্তির নিশ্বেস ফেলে অশোক বলল, "ভাগ্যিস খবরের কাগজওয়ালারা সবাইকার হাঁড়ির খবর রাখে। তা নইলে আমিই কি ছাই জানতে পারতুম কলকাতার বিখ্যাত ডাক্তার এইচ. ঘোষ., এম ডি. আজ এখানে এসে পৌঁছোবেন।"

"কিন্তু থেকে-থেকে তাঁর সই জাল করতে গেলি কেন ?"

"নইলে ভাই অনেক হাঙ্গামা হোত। ডাক্তারের সই ছাড়া ওষুধগুলো পাওয়া কঠিন, আর দেখছিসই ত বোম্বাই সহরের ছররা—কোনো ডাক্তারকে যদি বলতুম সই করে দিতে তা হলে জেরা করে-করে একেবারে ফ্যাচাংখেকো করে

"কিন্তু ডাক্তার ঘোষের ত বয়েস হয়েছে। দোকানদার যদি ধরে ফেলত !"

"ঠিক বলেছিস", অশোক বলল, "তবে দোকানদারের চেহারা দেখে মনে-মনে ঠিক বুঝে ফেলেছিলুম যে তার বুদ্ধি তোর চেয়েও মোটা।"

কুনু রীতিমতো রাগ করে ট্যাক্সির জানলার বাইরে চেয়ে রইল। বুদ্ধি নিয়ে অশোক যখন খোঁটা দেয় তখন সত্যিই ওর আত্মসম্মানে লাগে। কেন না, ও জানে অশোককে কোনোদিন বুদ্ধির যুদ্ধে পরাস্ত করে উচিত শিক্ষা দিতে পারবে না।

অধ্যাপক ত্রিবেদী প্রায় হাঁ-হাঁ করে উঠলেন, "সেকি ? খাতা-খানা আপনি ফেরত নিয়ে যাবেন ? ও খাতাটার আপনার কী

লাভ হবে বলুন? অথচ, প্রাচীন গুর্জর সম্বন্ধে কত অদ্ভুত তথ্য আমি ওর মধ্যে খুঁজে পেয়েছি!"

"অদ্ভুত মানে নতুন, কী বলুন?"

"নিশ্চয়ই নতুন। অনেক প্রতিষ্ঠিত ঐতিহাসিক মতবাদ এ খাতার সাক্ষীর সামনে একেবারে ভেঙে পড়বে।"

"তার মানে, আপনি মেনে নিচ্ছেন খাতাটা খাঁটি?"

"তার মানে?"

"তার মানে, এমন ত হতেই পারে যে খাতাটা আসলে জাল। তা হ'লে প্রাচীন গুজরাট সম্বন্ধে মতবাদকে শুধরে নেবার কথাই যে ওঠে না।"

"জাল? এ কথা যে ভাবাই যায় না। খাতাটার চেহারা একবার ভালো করে দেখুন—হলদে ঝুরঝুরে খাতা। এ খাতা কখনো জাল হতে পারে?"

"ইংরিজিতে একটা কথা আছে—যা কিছু চকচক করে তাই সোনা নয়।"

অধ্যাপক ত্রিবেদী অবাক হয়ে চেয়ে রইলেন।

"খাতাটা যে জাল," অশোক বলে চলল, "এ সন্দেহ আপনার কথা শুনে আমার মনে আরও বদ্ধমূল হল। আপনার কথার সারমর্ম এই যে প্রাচীন গুজরাটের ইতিহাসের সঙ্গে এতে যে-সব বর্ণনা আছে সে সবগুলো ঠিক খাপ খায় না। এই ত?"

"হুঁ।"

"সেটুকুই আমি জানতে চেয়েছিলুম।"

"কিন্তু তার কারণ ত এও হতে পারে যে খাতাটা ভুল নয়, আসলে প্রাচীন ইতিহাস সম্বন্ধে আমাদের মতবাদগুলোই ভুল।"

"হতে পারে বই কি। নতুন-নতুন তথ্য আবিষ্কারের ফলে অনেক সময়েই ত মানুষের মতবাদ বদলায়।"

"তা হলে এ ক্ষেত্রে যে তা হবে না তার প্রমাণ কী?"

"প্রমাণের দাওয়াই কিনে এনেছি। বাইরের গাড়িতে আছে।"

"দাওয়াই?"

"হঁ। দাওয়াই। বড় কড়া-কড়া দাওয়াই। খাতাখানা তা হজম করতে পারলে তখন ইতিহাসকে সংশোধন করবার ক্ষমতা তার আছে। তবে যতদূর মনে হচ্ছে, বেচারা অত কড়া দাওয়াই হজম করতে পারবে না।"

অধ্যাপক ত্রিবেদী হতভম্বের মতো দাঁড়িয়ে রইলেন। কনু বোকার মতো অশোকের পেছু-পেছু ট্যাক্সিতে উঠল। অশোকের হাতে ঝরঝরে পুরনো খাতাটা।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

'খাতার সঙ্গে বোঝাপাড়া

"কুনু", বাড়ি ফিরে খাওয়া-দাওয়ার পর অশোক বলল, "এখন তুই একটু বিশ্রাম নিতে পারিস , বিকেলে একবার আমার সঙ্গে বেরুলেই হবে। কিন্তু এখন তোর কোনো কাজ নেই।"

"তুইও একটু বিশ্রাম নে না", কুনু বলল, "তোর খাটুনিও ত কম হয়নি"—ভাবখানা এই যে আসল যা কাজকর্ম তার সবটা যেন কুনুই করেছে, অশোক নেহাত সহকারির মতো পেছুপেছু ঘুরেছে মাত্র।

"উঁহুঁ, আমার এখন আলসেমির সময় নেই", অশোকের গলায় কেমন যেন একটা অন্যমনস্ক ভাব, "বিকেলের আগেই খাতাটার সঙ্গে বোঝাপাড়া শেষ করতে হবে।"

"খাতাটার সঙ্গে বোঝাপাড়া?", দিদি অবাক গলায় বললেন।

"বলো কি?" ভবতোষবাবুর গলাতেও বিস্ময় কম নয়।

"হুঁ। ওকে কাঠগড়ায় দাঁড় করাতে হবে। দেখতে হবে ওর সাক্ষী আসল না নকল।"

"হঁয়ালী-হেঁয়ালী কথা রাখো," দুটো গালে একসঙ্গে দুটো পান পুরে চিবুবার চেষ্টা করতে-করতে ভবতোষবাবু বললেন, "বাংলা ভাষায় বুঝিয়ে বলো খাতাটাকে কী করতে চাও।"

"আপনারা, মানে উকিলরা", অশোক বলল, "সোজা বাংলায় যাকে বলেন cross examine "

"তার মানে ?"

"মানে জেরা।"

"নাঃ দিদি," কুন্তু এতক্ষণে বেশ একটু উৎসাহ ভরে বলল, "ভবতোষদা যে কেমন উকিল তা এতক্ষনে বুঝলুম। জেরা মানে জানেন না ? যাকে বলে cross examine –"

"আঃ হা," ভবতোষবাবুর গলায় গভীর অশ্বস্তি, "এখনো হেঁয়ালী। এদিকে বলে আমার মক্কেলের মাথা খারাপ হয়ে সম্পত্তি বেহাত হবার জোগাড় -কোথায় তার একটা ত্বিল্লে করবে, আর তা নয় হেঁয়ালী !"

"হেঁয়ালী মানে ? সত্যিই খাতাটাকে জেরা করতে হবে", অশোক বলল।

"হেঁয়ালী নয় মানে ? খাতা কি ভাড়াটে সাক্ষী যে জেরা করবে ?"

"এ ক্ষেত্রে ত প্রথম থেকেই আমার তাই সন্দেহ হচ্ছে।" অশোকের গলায় চাপা গাম্ভীর্য, বোঝা যায় যে আর বেশি কথা কইতে চাইছে না। হয়ত সময় নেই, তাই। "আচ্ছা ভবতোষদা", অশোক একটু থেমে আবার বলল, "এতদিন ত ওকালতি করেছেন, আজ আপনাকে হাকিম করে দিলুম, আমি হলুম উকিল, আর কাঠগড়ায় দাঁড় করানো যাক খাতাটাকে।"

"আর আমরা?" দিদি ফস করে প্রশ্ন করলেন।

"হুঁ আমরা?" কুনুর গলায় বেশ একটু ঝাঁঝ, "আমরা কি ঘোড়ার ঘাস কাটতে এসেছি?"

"এই বিচার ব্যাপারটার মধ্যে তুইও থাকতে চাস? বেশ দিদি, তাহলে তুমি আর কুনু জুরি হও---এমন সুযোগ আর জীবনে পাবে না, জুরি হওয়া কম খাতিরের নয়।"

"আঃ হা, ছেলেমানুষি রাখো," ভবতোষবাবু উদ্বিগ্ন ভাবে বললেন, "ভুলে যেও না আমার মক্কেলের মাথা খারাপ হয়ে গিয়েছে, খবরের কাগজে তা প্রকাশও হয়ে গিয়েছে, এখন বাকি শুধু তার সম্পত্তিটুকু বেহাত হওয়া।"

"হুঁ", অশোক বলে চলল, "প্রত্যেকটি কথা মনে রাখতে হবে এবং তা ছাড়া ভুললে চলবে না যে এই খাতাখানা জাল।"

"চুলোয় যাক খাতা," ভবতোষবাবু বললেন, "ওসব তোমার গোয়েন্দাগিরির প্যাঁচ, ওসব প্যাঁচ রাখো। খাতাটা জালই হোক আর আসলই হোক আমার মক্কেলের মাথার কী হবে? তার সম্পত্তির কী হবে?"

"সে সব পরের কথা," অশোক যেন তোড়ে বক্তৃতা দিতে সুরু করল, এমন তোড়ে যে আর কেউ যাতে বাধা দিতে না পারে, "আপাতত কথা হল খাতাটা জাল এবং খাতাটা যে জাল এ সন্দেহ আমার মনে আসে যখন প্রথম খাতাটার চেহারা দেখলুম। দুশো বছরের পুরনো খাতার চেহারা অমন হতেই পারেনা।"

"তার মানে?" কনু প্রায় রুখে উঠল, "চেহারা দেখে ত বরং মনেই হয় খুব পুরনো, একেবারে ঝরঝরে পুরনো। ঠিক কত পুরনো তা কেমন ক'রে হিসেব করব, কিন্তু পুরনো যে তাতে সন্দেহ নেই। পাতাগুলো একেবারে হলদে হয়ে গিয়েছে, কালির রঙ হয়েছে ফিকে-বাদামী, এমন কি বাঁধাই—বাঁধানোটা দেখলেই বোঝা যায় কত দিনকার খাতা।"

"হুঁ," অশোকের গলা একেবারে অবিচলিত, "বেশ, বাঁধাই আর মলাটের কথাই প্রথম ধরো।" অশোক খাতাটা হাতে নিয়ে একটু নাড়াচাড়া করতে লাগলো। "মলাট আর বাঁধাই খুব পুরনো মনে হচ্ছে, নয়? হবার ত কথাই। যে চামড়া দিয়ে খাতাটা বাঁধানো তা অবশ্যই খুব পুরনো চামড়া। সন্দেহ নেই।"

"নিশ্চয়ই," কুনু বলল।

"কিন্তু এমন ত হতেই পারে যে খুব পুরনো চামড়া দিয়েই কেউ খাতাটা সম্প্রতি বাঁধিয়েছে। খুব পুরনো চামড়া বোম্বাই সহরে দুর্লভ নয়, এখানে দরকার হলে, শুনেছি, এক ঘণ্টার মধ্যে বাঘের দুধ জোগাড় করা যায় আর খুব পুরনো চামড়া জোগাড় করা যায় না?"

"তা না হয় যায়," কুনু বলল, "কিন্তু শুধুই ত পুরনো চামড়া নয়! দেখছ না, বইটার গায়ে, মলাটের ওপর, কত চিহ্ন রয়েছে? এসব চিহ্ন যে ব্যবহারের চিহ্ন তা দেখলেই বোঝা যায়। কত দিন ধরে কত মানুষ বইটাকে ব্যবহার করেছে,

আলমারিতে রেখেছে, নেড়েছে-চেড়েছে-পড়েছে—তার সব চিহ্ন। এগুলোকে অস্বীকার করবে কেমন করে? এগুলোর মধ্যে যে ইতিহাসের স্পষ্ট পদচিহ্ন!"

"ঠিক বলেছিস। এগুলোকে অস্বীকার কববাব উপায় নেই। এবং উপায় নেই বলেই বাধ্য হলুম বইটাকে জাল বলে সন্দেহ করতে।"

"তার মানে?"

"মানে চিহ্নগুলো ঠিকই আছে তবে সবই ভুল জায়গায় রয়েছে। একটা বই খুব বেশিদিন ধরে ব্যবহৃত হলে ঠিক কোন-কোন জায়গায় ব্যবহাবেব চিহ্ন পড়া উচিত? প্রথমত, মলাটের নীচের দিকটা, যে দিকটা আলমারির সেলফ-এব সঙ্গে ক্রমাগত ঘসা খায়। তাব পব, মলাটের কোণাগুলো, কেন না, সে জায়গাগুলোর চামড়া সবচেয়ে পাং আব এই কোণাগুলোর ওপরেই পড়ে সবচেয়ে বেশি ঝক্কি। তারপব, বইটাকে আলমারি থেকে টেনে বেব করবাব সময় বাঁধাই-এব মাথায় যে জায়গাটায় আঙুলের চাপ পড়ে সেই জায়গাটা। বইটাব বাঁধাই-এব স্বতো-গুলোও বাববাব খোলা বন্ধ হওয়ার দরুণ ঢিলে হয়ে যাওয়া উচিত। পুবনো বই ভালো করে লক্ষ্য কবলেই বুঝতে পারবি যে সামনের আর পেছনের মলাটেব ওপর-দুটোই জখম হয় সবচেয়ে কম। কিন্তু এই খাতাটাকে যখন প্রথম দেখলুম তখনই আমাব কতকগুলো সন্দেহ হল: দেখলুম এর মলাটেব নীচের

দিকটা, কোণাগুলো এমন কি বাঁধাই-এর সূতোগুলো একেবারে খাসা রয়েছে। তবুও খাতাটার ওপর রয়েছে অনেক সব দাগ, ব্যবহৃত হবার দাগ, কিন্তু সবই এলোমেলো, অজায়গায়, কুজায়গায়। যেমন ধর, মলাটের ওপরের দাগগুলো, ওগুলো ব্যবহারের চিহ্ন নয়, ব্যবহারের ধাপ্পা। এক কথায় খাতাটা প্রাচীন নয়, পুরনো চামড়া দিয়ে বাঁধিয়ে ওকে যেন প্রাচীনতার মুখোস পরানো হয়েছে। ভালো করে লক্ষ্য করলেই বোঝা যায়।"

অশোক একটু থামলো।

কারুর মুখে কোনো কথা নেই।

অশোক আবার বলে চলল, "তা ছাড়া, আর একটা কথা ত খুবই স্পষ্ট। এটুকু ত সকলেরই মাথায় আসা উচিত ছিল। দু'শো বছর আগেকার খাতা, অথচ বাঁধাইটা একেবারে হাল ফ্যাসানের।"

"তার মানে?"

"মানে দু'শো বছর আগে আমাদের দেশে এ জাতের বাঁধাই মোটে সম্ভবই নয়। দেখ না, বাঁধাই-যন্ত্রের অস্পষ্ট দাগ পর্যন্ত খাতাটার গায়ে, অথচ একটু ভাবলেই বুঝতে পারবে দু'শো বছর আগে বাঁধাই-যন্ত্র আমাদের দেশে থাকা সম্ভবই নয়। তখন অধিকাংশ বই পাতায় লেখা হত, এবং পাতাগুলোর তাড়ি বাঁধাকেই যা বাঁধাই বলা যায়!"

"কিন্তু কাগজ?" কুনু বলল, "কাগজটার চেহারা কি বাস্তবিকই খুব পুরনো নয়?"

"তা অবশ্য ঠিক। এবং দু'শো বছর আগে চীন ও ইয়োরোপের কোনো-কোনো জায়গায় কাগজে লেখার প্রচলন সত্যিই হয়েছে! বাটুলিওয়ালা বংশের সঙ্গে জলদস্যুতার প্রবাদ যখন সংযুক্ত তখন এমন কথা মনে হতেই পারে যে অতদিন আগে প্রতাপচন্দ্রের কোনো পূর্বপুরুষের হাতে কোনো উপায়ে লেখার কাগজ এসেছিল। পাণ্ডুলিপিটা তাই পুরনো হতেই পারে যদিও বাঁধাইটা মাত্র হালের!"

"হুঁ। আমার ত এখন তাই মনে হচ্ছে।"

"মনে হবার আর একটা কারণ কালি—কালিটা কী রকম ফ্যাকাসে বাদামি দেখাচ্ছে!"

"হুঁ। তা ত বটেই।"

"এসব কথা আমি আগেই ভেবেছি। কিন্তু তবুও একটা সন্দেহ মন থেকে মুছতে পারিনি। যদি পাণ্ডুলিপিটা পুরনোই হয় এবং বাঁধাইটা অপেক্ষাকৃত আধুনিক হয় তা হলে পুরনো চামড়া দিয়ে বাঁধাই করারই বা দরকার কী আর সেই বাঁধাই-এর ওপর এলোমেলো দাগ ফেলে প্রাচীনতার ধাপ্পা দেবারই বা কী মানে হয়? এ সবের পেছনেই একটা প্রচ্ছন্ন উদ্দেশ্য আছে বলে মনে হয় না কি?"

"উদ্দেশ্য যাই থাক, কাগজ আর কালি যদি বাস্তবিকই

পুরনো হয় তা হলে বাঁধাই সম্বন্ধে তুই যত সন্দেহই করিস না কেন আসল পাণ্ডুলিপিকে কোনো মতেই জাল বলে চালাতে পারিস না।"

"ঠিক। তাই পরীক্ষা করে দেখতে হবে কাগজ আর কালি সত্যি পুরনো কিনা। এবং সে পরীক্ষা যতক্ষণ না শেষ করছি ততক্ষণ অবশ্যই তোরা কেউ কোনো রায় দিতে পারিস নে। তবে আমার মনে-মনে বিশ্বাস মলাটের ওপর যখন ধাপ্পা ধরা পড়েছে তখন কাগজ এবং কালির ওপরও ধাপ্পা আবিস্কৃত হবে।"

"কিন্তু ধাপ্পা কি না ধরবি কেমন করে?"

"তারই ত দাওয়াই কিনে এনেছি।" অশোক বলল, এবং তারপর দিদির দিকে ফিরে, "আমার সেই চামড়ার ছোট্ট বাক্সটা?"

দিদি উঠে গিয়ে বাক্সটা নিয়ে এলেন। অশোক প্যাকেট খুলে ওষুধগুলো টেবিলে সাজাল। তারপর ব্যাগটা থেকে ছোট ভাঁজ-করা চক-চকে একটা অণুবীক্ষণ বের করে টেবিলের ওপর ঠিক করে বসালো আর বের করল ড্রপার, সরু চিমটে, কাচের দু-একটা পাত্র।

টেবিলের ওপর তিন জোড়া কৌতূহলী চোখ।

অশোকের চোখে কৌতূহল নেই। স্থির, শান্ত দৃষ্টি। সে যেন আপন মনেই বলে চলল:

"খাতার পাতাগুলোকে যে সন্দেহ করছি তার একটা স্পষ্ট

কারণ অবশ্যই রয়েছে। কাগজ পুরনো হলে হলদে হয়ে যায় বটে; কিন্তু কোনো খুব পুরনো বই যদি ভালো করে লক্ষ্য করা যায় তা হলে চোখে পড়ে পাতাগুলোর সমস্তটাই সমান হলদেটে নয়। তার কিনারাগুলো বেশী হলদেটে, মাঝের দিকটা অনেক কম হলদেটে। এর কারণ অবশ্য—” অশোক কথা বলছে আর সযত্নে ওষুধপাতি এবং যন্ত্রপাতি নিয়ে কাজ গোছাচ্ছে —“এর কারণ অবশ্য স্পষ্ট : বইটা যখন বন্ধ করা থাকে তখন পাতাগুলোর ভেতর দিকটায় হাওয়া লাগে না, কিনারগুলোতেই হাওয়া লাগে। আর হাওয়ার মধ্যে যে অক্সিজেন আছে তার ফলেই কাগজ অমন হলদে ঝুরঝুরে হয়ে যায়। অথচ, এই খাতাটার প্রত্যেকটা পাতার সমস্ত অংশই সমান হলদে, ঝুরঝুরে!”

“তার কারণ অবশ্য এও হতে পারে যে খাতাটার পাতাগুলো বহুদিন আবাঁধাই অবস্থায় খোলা পড়েছিলো—তখন পাতাগুলোর পুরো অংশ সমান হাওয়া খেয়ে সমান হলদে হয়ে গিয়েছে!”

“হতে পারে বই কি! কিন্তু এও ত হতে পারে ফিকে চায়ের জলে ডুবিয়ে পাতাগুলোকে পুরনো হলদেটে দেখতে করা হয়েছে!”

“তাও কি সম্ভব নাকি?”

“খুব সম্ভব। আসলে যে ব্যাপারটা কী তা একটু পরীক্ষা করলেই বুঝতে পারা যাবে।”

ততক্ষণে অশোকের তৎপর হাতের গুনে টেবিলের ওপর একটা ছোট্ট স্পিরিট ল্যাম্প জ্বলছে। একটা টেস্ট টিউবের মধ্যে পরিষ্কার জল ঢেলে এবং তার মধ্যে খাতাটা থেকে একটুকরো ছোট্ট কাগজ ছিঁড়ে দিয়ে অশোক স্পিরিট ল্যাম্পের আগুনে সেটা ফোটাচ্ছে।

তিন জোড়া কৌতূহলী চোখ টেবিলের ওপর।

অশোকের চোখে কৌতূহল নেই। স্থির, শান্ত, দৃষ্টি।

একটু চুপচাপ।

কাগজটা বেশ একটু ফোটবার পর অশোক সাবধানে সরু চিমটের ডগায় সেটা তুলে নিল। তারপর এক টুকরো চৌকো কাঁচের ওপর সেদ্ধ কাগজের টুকরোটা ফেলে একটা লম্বা ছুঁচ দিয়ে সেটা বেশ করে পিঁজে ফেলবার মতন করল। তারপর একটা শিশি থেকে এক ফোঁটা গাঢ় রঙের তরল জিনিষ তুলে তার ওপর ফেলল।

"ওটা কী ওষুধ রে?" কুনু প্রশ্ন করল।

"ওষুধ-টষুধ নয়। এর নাম এ্যানিলাইন্ স্টেন্। অনুবীক্ষণ দিয়ে দেখবার সুবিধে হবে।" বলতে বলতে অশোক সবুজ সুটকেশ থেকে একটুকরো ব্লটিং কাগজ বের করে কাঁচের ওপর থেকে বাড়তি রঙটা শুষে নিলো। তারপর আর একটা শিশি থেকে আর এক ফোঁটা কি ফেলল সেদ্ধ আর পেঁজা কাগজের টুকরোর ওপর।

"ওটা আবার কি ?" –কুনু আবার প্রশ্ন করল।

"গ্লিসারিন।" বলতে বলতে অশোক আর এক টুকরো চৌকো কাঁচ প্রথমটার ওপর সাবধানে টিপে বসালো।

তিন জোড়া কৌতূহলী চোখ টেবিলের ওপর। অশোক সাবধানে কাঁচের টুকরো ছুটো মাইক্রোস্কোপে ভবে দিলো এবং তারপর এক চোখ বন্ধ করে নলের ওপর দিককাব ফুটোর মধ্যে আর এক চোখ বসালো।

কারুর মুখে কথা নেই।

স্তব্ধতা ভাঙলো অশোকই, "যা ভেবেছিলুম ঠিক তাই। কাগজটা একেবাবে আধুনিক কাগজ।"—বলতে বলতে অনু-বীক্ষণ থেকে চোখ সবিয়ে নিলো।

"কেমন করে বুঝলে ?"—এতক্ষণে প্রশ্ন করলেন দিদি।

"কঠিন নয়। তুমিই একবার চোখ দিয়ে দেখ। স্পষ্ট দেখতে পাবে কাঠের টুকবো, বাঁশের টুকরো, ছেঁড়া কাপড়, পেঁজা তুলো—এই সব। এসব জিনিষ দিয়ে কাগজ তৈবি মাত্র শ খানেক বছর হল চালু হয়েছে। ১৮৪০-এ কেলার বলে একজন ইয়োরোপীয়ান্ বাঁশ এবং কাঠ থেকে কাগজ তৈবি করার পদ্ধতি চালু করেন, এ পদ্ধতিব তাই নাম কেলার-পদ্ধতি। তাহলে বুঝতেই পারছো, খাতাটার বয়স দুশো বছর হতেই পারে না, কেন না মাত্র একশো বছর আগে এইভাবে কাগজ তৈবি করার পদ্ধতি পৃথিবীতে এসেছে। আমার ত মনে হচ্ছে কাগজটা

খুবই আধুনিক ; কেন না ওব মধ্যে আর একটা জিনিষ রয়েছে যাকে বলে esparto—সে জিনিস দিয়ে তৈবি কাগজের চল খুব বেশীদিন হয়নি। তাই বলছিলুম, কাগজটা যে হলদে হয়েছে তা বয়সেব দরুণ নয়, খুব সম্ভব চায়ের জলে চান করার দরুণ।"

"কিন্তু লেখার কালি ?"

"হুঁ। লেখার কালিও পরীক্ষা করে দেখতে হ'বে বই কি। যে রকম বাদামি রঙ তাতে ত মনে হয় যে খুবই সেকেলে !"

ফুঁ দিয়ে অশোক স্পিরিট ল্যাম্পটা নিভিয়ে দিলো আব অণুবীক্ষণটা সযত্নে বন্ধ করে রাখলো চামড়ার ব্যাগে।

"এবার কালিটা নিয়ে পরীক্ষা করা যাক। তবে, তার আগেই নিজের একটা অপকর্মের কথা স্বীকাব কবে নিচ্ছি।' বলতে বলতে বুক পকেট থেকে সযত্নে অশোক একটা খাম বেব করল এবং সেই খামের থেকে বের করল একটা পুরোনা চিরকুট। "এটা", অশোক বলল, "সত্যিই খুব পুরোনো চিরকুট। আমি চুরি করে এনেছি।"

"চুরি !" একসঙ্গে তিনটে বিস্মিত গলাব ঐকাতান।

"হুঁ," অত্যন্ত সহজ গলা অশোকেব, "অধ্যাপক ত্রিবেদী যখন তন্ময়ভাবে এই খাতা নিয়ে আলোচনা করছিলেন তখন তাঁর লাইব্রেরীর তাক থেকে হাত সাফাই করে এনেছি।"

"কিন্তু এটা কি তোর উচিত হল ?"—কনু অত্যন্ত গম্ভীর গলায় প্রশ্ন করল, যেন ইস্কুলের মাস্টারমশাই নীতিশিক্ষা পড়াচ্ছেন।

"না, সত্যি উচিত হয়নি", অম্লান বদনে বলে চলল অশোক, "কিন্তু উপায়ও যে ছিলো না। সত্যিকারের দুশো বছরের পুরোনো চিরকুট এই বিদেশ-বিভূঁয়ে পাই-ই বা কোথায়? তা ছাড়া, একে ঠিক চুরি বলতেও পারিস না, কারণ পরীক্ষা হয়ে গেলেই ফেরত দিয়ে আসব।"

"কিসের পরীক্ষা?"

"এই দেখ না। শ দুয়েক বছর আগে এক রকম কালি মানুষ ব্যবহার করত বলে জানি যে কালির মধ্যে iron-sulphite বলে একটা জিনিস আছে। সে কালি সত্যিই পুরনো হলে বাদামি হয়ে যায়। ত্রিবেদীর ঘর থেকে যে চিরকুটটা এনেছি তার লেখাগুলো বাদামি হয়ে রয়েছে। প্রথম আমি পরীক্ষা করে দেখবো এই চিরকুটের লেখাগুলো iron-sulphite-এর কালির কিনা। যদি তাই হয় তাহলে প্রামাণিত হবে প্রাচীন গুজরাটে ও কালির প্রচলন ছিলো এবং তাহলে আশা করতে হবে এই খাতার কালিও একই জাতের। তারপর দেখব খাতার কালিতে iron-sulphite আছে কিনা।"

"আছে কিনা বুঝবি কী করে?"

"যদি iron-sulphite থাকে তাহলে লেখার ওপর একফোঁটা এ্যামোনিয়াম সালফাইট্ ফেললেই ধরা পড়বে। দেখ না।"

তারপর অশোক অত্যন্ত স্থির হাতে একটা বোতল থেকে ড্রপারে করে তুলল একটু আরক এবং ত্রিবেদীর ঘর থেকে আনা

চিরকুটের এক কোণায় একটা অক্ষরের ওপর ফেলল একফোঁটা সেই আরক।

তিন জোড়া উদ্‌গ্রীব চোখ চিরকুটটার ওপর।

দেখতে দেখতে চিরকুটের অক্ষরটা একেবারে মিশমিশে কালো হয়ে গেল।

অশোক সেটাকে সাবধানে টেবিলের এক কোণায় সরিয়ে রাখলো আর তারপর খাতাটার একটা পাতা খুলে একটা অক্ষরের উপর আবার এক ফোঁটা আরক ফেলল।

তিনজোড়া উদ্‌গ্রীব চোখ টেবিলের উপর।

কিন্তু খাতার ফিকে বাদামি অক্ষর গভীর কালো হয়ে উঠল না। বরং, আরও ফিকে হয়ে অস্পষ্ট বেগুনি রঙ হয়ে গেল।

এতক্ষণে পাতলা হাসি দেখা দিলো অশোকের মুখে। হালকা চুলগুলো কপালের ওপর থেকে পেছনের দিকে ঠেলে দিতে দিতে দুটো কনুই-এর ভর দিলো টেবিলের ওপর। ভবতোষবাবুর দিকে চেয়ে বলল, "জেরা শেষ করেছি। এবার আপনার হাকিমী রায় দিন।"

ভবতোষবাবু সেই যে তখন দুগালে একসঙ্গে ছটা পান পুরেছিলেন এতক্ষণ তা চিবোতে বেমালুম ভুলে গিয়েছিলেন। তন্ময় হয়ে শুনছিলেন অশোকের কথা। যেন হুঁস ফিরে এলো। একসঙ্গে কচমচ করে চিবোতে সুরু করলেন সেই ছটা পান। আর তারপর বলে চললেন—

"বাস্তবিক আশ্চর্য! অশোক, তুমি যে এত জানো, অমন খুঁটিয়ে ভেবে দেখো তা আমি কল্পনাও করতে পারতুম না। বুদ্ধির খেলায় তোমার সঙ্গে পারা মনে হচ্ছে অসম্ভব : তুমি যদি উকিল হতে তাহলে নিশ্চই অসাধারণ ভালো উকিল হতে। যদি তুমি ডাক্তার হতে—"

"কিন্তু", অশোক বাধা দিলো, নিজের প্রশংসা শুনতে সত্যিই বড় অস্বস্তি হয়। "কিন্তু, আমি উকিলও নই, ডাক্তারও নই। আমি হলুম—"

"জানি আমি। তবে যদি উকিল হতে, অন্তত আইন সম্বন্ধে খানিকটা জ্ঞান থাকত তাহলে সত্যিই বড় ভালো হত। সে জ্ঞান নেই বলেই তোমার এত আশ্চর্য্য পরীক্ষা সবই বিফল হল।"

"তার মানে?"

"একটু ঠাণ্ডাভাবে ভেবে দেখো", ভবতোবাবু বললেন, "আমাদের আসল সমস্যাটার দিক থেকে ভেবে দেখবার চেষ্টা করো। আসল কথা হচ্ছে আইনের কথা : প্রতাপচন্দ্রের যদি বাস্তুবিকই মস্তিষ্ক বিকৃতি হয়ে থাকে তাহলে সমস্ত সম্পত্তি থেকে তিনি বঞ্চিত হবেন। উইলে এমন কথা নেই যে একটা খাঁটি-খাতা দেখে এই মাথা খারাপ হওয়া দরকার। মাথা যদি খারাপ হয় তা হলেই হল ; তা আসল খাতা দেখেই হোক আর নকল খাতা দেখেই হোক—তফাৎ কিছুই হয় না। তুমি যদি এর বদল

উদয়চন্দ্রর—প্রতাপচন্দ্রের কাকার—উইলটাকে এইভাবে নকল বলে প্রমাণ করতে পারতে তাহলে না হয় একটা হিল্লে হত।"

"ঠিক বলেছেন," অশোক অতিমাত্রায় উৎসাহিত হয়ে বলে উঠল, "আপনি বলতে চান সাপ দেখে ভয় পাওয়া আর দড়িতে সাপ দেখে ভয় পাওয়া দুইই একদিক থেকে এক কথা—নিছক ভয় পাওয়ার দিক থেকে। এই ত?"

"হুঁ। তাই নয় কি?"

"নিশ্চই।"

"আমাদেব উদ্দেশ্যটাব কথা ভুললে ত চলবে না। কী বলো?"

"নিশ্চই। আমাদের উদ্দেশ্য হল প্রতাপচন্দ্রকে বাচানো, কিম্বা তাঁব সম্পত্তি বাঁচানো—এই ত?"

"হুঁ। তাই নয় কী?"

"নিশ্চই।"

"তা হলে?"

"তাহলে চলুন সেই চেষ্টাই কবা যাক। কুনু, যাবি নাকি সঙ্গে?"

"কোথায়?"

"উদয়-ভবন। প্রতাপচন্দ্রের বাড়ি। পথে শুধু একবাব ত্রিদেবীর চিরকুটটা ফেরত দিয়ে যেতে হবে।"

"আমি প্রস্তুত।"—কুনু বেশী কথা বলছে না। ওবও নেশা ধরছে বোঝা যায়।

"তাহলে চলুন ভবতোষদা, প্রতাপচন্দ্রেব সঙ্গে আলোপ করিয়ে দেবেন চলুন।"

অষ্টম পরিচ্ছেদ

চলে যেতে হবে

অশোক, কুন্তু আর ভবতোষবাবু যখন উদয়-ভিলার সামনে পৌঁছোলেন তখন বিকেল হয়ে গিয়েছে। আকাশে আলো ম্লান হয়ে এসেছে, আর সেই ম্লান আলোয় সমুদ্র আর পিচের পথ, কালো এবড়ো খেবড়ো পাথর আর দূরের ঝাপসা তাল-গাছের বন—যেন কি রকম মৃত অদ্ভুত মনে হচ্ছে।

কারুর মুখে কথা নেই। দেউড়িতে দরোয়ান উঠে দাঁড়াল, অভিবাদন জানাল—কিন্তু নিঃশব্দে।

তারপর প্রকাণ্ড প্রাসাদ। অথচ কি রকম যেন খাঁ খাঁ করছে। বড় বড় ঘর। আসবাবের বিন্দুমাত্র অভাব নেই। বরং বাহুল্যই। অথচ কিসের অস্পষ্ট অভিশাপ যেন বোবা উদ্ধত ভঙ্গিতে স্তব্ধভাবে পাহারা দিচ্ছে। এখানে মৃত্যুর হাওয়া। এখানে জীবনের কোন স্থান নেই। অগস্তুকের দল অনধিকার প্রবেশ করেছে মনে হয়।

কোথাও কিছুমাত্র শব্দ নেই। শুধু তিনজনের পায়ের শব্দ। কি রকম খাপছাড়া, কি রকম অবাঞ্ছনীয় মনে হয় এই পায়ের শব্দ। সেই শব্দে কেঁপে উঠছে সমস্ত বাড়ির স্তব্ধতা—যেন সূর্যপূজারীর অভিশাপের মূক সাক্ষীর কপাল কুঁচকে উঠছে!

সূ ।

অলৌকিককে কুনু মানে না। ভয় বলে কোন জিনিসকে সে জীবনে চিনতে শেখেনি। তবুও একটা বোবা অস্বস্তিতে তার দম প্রায় বন্ধ হয়ে আসছিল। কেমন সঙ্কোচ হচ্ছিল স্তব্ধতার এই অখণ্ড রাজত্ব ভাঙতে ভাঙতে এগিয়ে চলতে।

অথচ ভেবে দেখতে গেলে এর কোন মানেই হয় না। ফাঁকা বাড়ি। লোকজন নেই। এই যা। তবুও ইতিহাস? এই বাড়ির, এই বংশের পেছনে যে অদ্ভুত ইতিহাস রয়েছে সেই ইতিহাসকে কেমন করে অস্বীকার করা যাবে? হয়ত অলৌকিক কিছুই নয়। হয়ত কেন, নিশ্চয় কিছুই নয়। কেননা সে রকম হতেই পারে না —কুনু মনে মনে নিজের সঙ্গে তর্ক করে। তবু সেই ইতিহাস, সূর্যপূজারীর সেই অভিশাপ—সে যেন বাড়ির ধূলোকণার মধ্যে বোবা সাক্ষীর মতো দাঁড়িয়ে। এ ইতিহাসকে কেমন করে অস্বীকার করা যায়—এ ইতিহাস যে দুঃস্বপ্নের মতন সমস্ত বাড়িময় থমথম করছে।

কোথাও বিন্দুমাত্র শব্দ নেই। যেন জীবনের সীমানা পার হয়ে মৃত্যুর মৌনতার মধ্যে পা ফেলতে ফেলতে তিনজনে এগিয়ে চলেছে। কারুর মুখে কথা নেই, কুনুর মনে নানান রকম কথা তোলপাড় করছে। আর একটা অস্বস্তি—ভয় নয়, একটা অদ্ভুত অস্বস্তি—দুঃস্বপ্নের মতো, বুকচাপার মতো। কারণ নেই, তবুও নিজেকে কেমন অপরাধী মনে হয়; মনে হয় এই স্তব্ধতাকে অমনভাবে ভেঙে এগিয়ে চলা বুঝি উচিত হচ্ছে না। ভাবতে

গেলে হাসি পায়, হাসি পাবারই কথা। কিন্তু এই অভিশপ্ত প্রাসাদ রক্তে কিসের ঢেউ তোলে ; বুদ্ধির বাঁধ সে ঢেউতে ভেঙে চুরমার হয়ে যায়। কুনু ভালো করে, পরিষ্কার ভাবে ভেবে দেখবে কেমন করে ?

ভবতোষবাবু চলেছিলেন সব প্রথম। এ বাড়ির ঘরদোর তাঁর চেনাশুনো, পরিচিত। তারপর অশোক। অশোকের মনের মধ্যে কী রকম ভাব তা মুখ দেখে মোটেই বোঝবার উপায় নেই। কেননা, অশোকের মুখের উপর মনের ভাব কোনদিনই কোন ছায়া ফেলতে পারে না। শুধু ওর তীক্ষ্ণ চোখ দুটো চক-চক করে। কিন্তু তার বেশি আর কিছুই নয়। ওইটুকুই।

"ডানদিকে লাইব্রেরি-ঘর," হঠাৎ থেমে দাঁড়িয়ে ভবতোষ-বাবু বললেন, কি রকম খাপছাড়া মনে হল তাঁর গলার স্বর, "এই ঘরেই সম্ভবত তাঁকে পাওয়া যাবে।"

কাকে ? বুঝতে অসুবিধে হয় না প্রতাপচন্দ্র সম্বন্ধেই কথাটা তিনি বললেন। কেন না, প্রতাপচন্দ্রের সঙ্গে দেখা করবার জন্যেই তিনজন এখানে উপস্থিত। "কে জানে এখন কেমন অবস্থায় আছেন," ভবতোষবাবু প্রায় আপন মনেই বললেন, "একে মাথা খারাপ, তায় সম্প্রতি খুব আফিম ধরেছেন।"

কুনু বা অশোক এ কথার জবাব দিল না। জবাব আছেই বা কি ?

ভবতোষবাবু লাইব্রেরির দরজার ওপর সন্তর্পণে টোকা দিলেন। ভিতর থেকে শব্দ এল, "ভেতরে আসুন।"

দোর ঠেলে ঢুকলেন ভবতোষবাবু, তারপর অশোক, তারপর কুনু।

প্রকাণ্ড ঘর। একেবারে কড়িকাঠ পর্যন্ত ঠাসা বই। দক্ষিণ দিকের জানলাটা খোলা, তার মধ্যে সমুদ্রের একফালি নজরে পড়ে। সমুদ্রের ওপর সূর্য অস্ত যাচ্ছে। সমস্ত সমুদ্র রক্তাক্ত।

আর সেই জানলার সামনে দাঁড়িয়ে একটি শীর্ণ পুরুষ। আস্তে আস্তে সমুদ্রের দিক থেকে মুখ ফেরোলো, তারপর চোখের চশমাটা খুলে পকেট থেকে ধবধবে রুমাল বের করে চশমার কাঁচ মুছতে লাগল।

সূর্যাস্তের আলোয় চশমার পুরু কাঁচ চকচক করে উঠল।

লোকটি চশমাটা আবার চোখের ওপর দিল, তারপর অত্যন্ত ঠাণ্ডা নিস্তেজ গলায় বলল, "আসুন।"

ভবতোষবাবু আলাপ করিয়ে দিলেন।

প্রতাপচন্দ্রের মুখে ফুটে উঠল দুর্বল ফিকে হাসি। "আমাদের দেশে এলেন," প্রতাপচন্দ্র অশোক আর কুনুকে উদ্দেশ করে বলে চললেন, "কিন্তু এমন সময় এলেন যখন আমার শেষ হয়ে এসেছে। আমার শেষ হয়ে এসেছে, আমার সময় নেই—নইলে আপনাদের মতো অতিথিদের নিয়ে কত আনন্দই করতে পারতুম। এই সহর, এই সমুদ্র—এদের আমি কী ভালো

যে বাসি তা কেমন করে বলব! অথচ, আমার শেষ হয়ে এসেছে, আমায় চলে যেতে হবে—এই সহর, এই সমুদ্র ছেড়ে আমায় চলে যেতে হবে ; আমাব সময় হয়ে এলো।"

প্রতাপচন্দ্র একটু থামলেন। কেমন যেন হাঁপিয়ে পড়েছেন মনে হল। তাবপর আস্তে আস্তে নীচু টেবিলের একটা দেরাজ থেকে ওষুধের একটা শিশি বের করে একটা ছোট্ট গেলাসে কি ঢাললেন ; তারপব ঢক কবে গিলে ফেললেন।

নিশ্চয়ই বিস্বাদ ওষুধ। তাঁর ফ্যাকাশে মুখ কি বকম বিকৃত হয়ে গেল।

পকেট থেকে রুমাল বের করে ঠোঁট মুছতে মুছতে প্রতাপ-চন্দ্র আবার এগিয়ে গেলেন পশ্চিমেব জানলটাব দিকে, আর বিহ্বল ভাবে চেয়ে বইলেন জানলার বাইরে।

বাইবে সমুদ্রেব ওপব লাল সূর্যাস্ত। সমস্ত সমুদ্র রক্তাক্ত মনে হয়।

আর সমুদ্র থেকে ঠিকরে-আসা লালচে আলোয় স্পষ্ট দেখা গেল তাঁর চোখদুটো চকচক করছে।

চোখের কোণে জল!

এ অবস্থায় কী-ই বা বলা যায়! ছেলেমানুষ নয়, বোকাহাবা নয়—তবুও যদি অমন ছেলেমানুষি কবে তা হলে তাকে কী বলে সান্ত্বনা দেওয়া যাবে?

কুনু দাঁড়িয়ে রইল বিহ্বল ভাবে।

ভবতোষবাবু এগিয়ে গিয়ে সান্ত্বনা দেবার চেষ্টা করলেন, "আপনি অনর্থক বিচলিত হয়েছেন প্রতাপচন্দ্র।"

প্রতাপচন্দ্র হাসলেন। আবার সেই দুর্বল ফ্যাকাশে হাসি। "এটা যে তর্কের বিষয় মোটেই নয় ভবতোষবাবু," প্রতাপচন্দ্র বলে চললেন, "আমি দর্শনের ছাত্র, আমি তর্ক-বিদ্যার শেষ পর্যন্ত তলিয়ে দেখেছি। যদি তর্কের বিষয় হত তা হলে আমি তর্ক করতুম, হয়ত আপনাদের কাছে হার মানতুম না।"

প্রতাপচন্দ্র একটু থামলেন। তারপর যেন আচমকা একটা উত্তেজনার ঢেউ এল তাঁর মধ্যে, তাঁর ক্ষীণ সরু সরু আঙুল-গুলো অস্থিরভাবে ঘুরতে লাগল পাশের টেবিলটার ওপর—

"আমি নিজে দেখছি। একবার নয়, দুবার নয়, বারবার। প্রথমে অবিশ্বাস করেছি নিজের চোখ, প্রথমে আমল দিইনি অলৌকিক কোন কথা। কিন্তু একবার নয়, দুবার নয়—বারবার। সূর্যপূজারীর অভিশাপ আমার সামনে সমন পাঠিয়েছে। এ সমনকে নিজের চোখে দেখতে পেয়ে—একবার নয় দুবার নয়, বারবার দেখতে পেয়েও আমি কেমন করে অস্বীকার করতে পারি? এখন নিজের সঙ্গে তর্ক করা বন্ধ করেছি—এখন আমি বুঝতে পেরেছি এ জিনিস তর্কের বিষয় নয়। সূর্যপূজারীর অভিশাপ আমার সমস্ত জ্ঞান, আমার সমস্ত সঞ্চিত অভিজ্ঞতাকে মিথ্যে করে দিয়েছে। আমি আর নিজের সঙ্গে তর্ক করি না……"

রোগা দুর্বল শরীরে যেন শক্তি ক্ষয়ে যাচ্ছিল। দম নেবার জন্যে প্রতাপচন্দ্র আবার থামলেন। সমুদ্র থেকে ঠিকরে-আসা সূর্যাস্তের আলোয় তাঁর চোখদুটো কী রকম অসহায়, কী রকম করুণ মনে হচ্ছিল।

ভবতোষবাবু তাঁর কাছে আস্তে আস্তে এগিয়ে গেলেন। অনেকটা সান্ত্বনা দেবার সুরেই তিনি আবার বললেন, "আপনি অনর্থক বিচলিত হয়েছেন, প্রতাপচন্দ্র। একটা খবর বোধ হয় আপনি জানেন না—যে খাতায় সূর্যপূজারীর অভিশাপের কথা রয়েছে সে খাতাটা জাল বলে প্রমাণিত হয়ে গিয়েছে।"

প্রতাপচন্দ্রের পাতলা ঠোঁটে আবার ক্ষীণ হাসি ফুটে উঠল। এ হাসি তাঁর চোখের কোণায় জলের চেয়ে করুণ, তাব চেয়েও অসহায়।—"জাল বলে প্রমাণ হয়েছে?"—প্রতাপচন্দ্র প্রশ্ন করলেন! কিন্তু প্রশ্নের সুরে এতটুকু উৎসাহের সাড়া নেই।

উৎসাহ ববং ভবতোষবাবুর গলায়, "হুঁ। জাল। কলকাতার একজন বিশিষ্ট অপরাধ-বিজ্ঞানী বিচার করে দেখিয়েছেন যে খাতাটা মোটেই প্রাচীন নয়, তার ওপর প্রাচীনতার মুখোস পবানো হয়েছে মাত্র।"

"কিন্তু তাতে প্রমাণ হল কী?"—তার্কিক প্রতাপচন্দ্র যেন বহুদিন পরে আড়ামোড়া ভেঙে উঠে বসলেন, "খাতাটা আসলে পুরনো নয়, অনেক ভুলচুকে ভরা খাতা—এ আমি অনেকদিন আগেই জানতুম। প্রথম যখন ওটার পাতা ওলটাই তখনই

আমি দেখতে পেয়েছিলুম ওর মধ্যে নানান রকম ভুল কথা আছে, প্রাচীন গুজরাটের ইতিহাসের সঙ্গে যা একদম মেলে না। গোয়েন্দার দরকার কি বলুন—খাতার পাতায় যে কাগজ তা ঊনবিংশ শতাব্দীর আগে পৃথিবীতে প্রস্তুত হতে পারে না, খাতায় যে কালিতে লেখা তা মোটেই পুরনো কালি নয়। আর অত কেন, খাতাটার বাঁধাই দেখলেই বুঝতে পারা যায় ও খাতা প্রাচীন নয়। দীর্ঘ দিন ব্যবহারের ফলে বাঁধাই-এর যে জায়গায় চিহ্ন পড়া উচিত ও খাতার সে-সব জায়গায় চিহ্ন নেই, ভুল কয়েকটা দাগ পড়েছে মাত্র।"

কুনু যেন এক মুহূর্তে নিভে গেল। পাগল দেখতে এসে এ কী কাণ্ড! কিছুক্ষণ আগে যে কথা আবিষ্কার করার দরুন অশোকের প্রতি মনে মনে সে শ্রদ্ধায় নুয়ে পড়েছিলো, সে কথাই কিনা এই দুরন্ত পাগল অতি অনায়াসে, গড় গড় করে, প্রায় মুখস্থ বলার মতো বলে গেল। খাতাটা আসলে পুরনো নয়, প্রাচীনতার কয়েকটা ভ্রান্ত ইঙ্গিতে মোড়া মাত্র—এ কথা আবিষ্কার করার মধ্যে বুদ্ধিভ্রংশের প্রমাণ ~ দূরের কথা তীক্ষ্ণ বুদ্ধি, তীক্ষ্ণ বিশ্লেষণ-শক্তির প্রমাণ রয়েছে বরং! তা হলে?

এতক্ষণ পরে অশোক প্রথম কথা বলল: "খাতাটা যে বাস্তবিক পুরনো নয় এ কথা তা হলে আপনি অনেকদিন আগেই বুঝতে পেরেছিলেন?"

"হুঁ", অত্যন্ত সহজ গলায় বললে প্রতাপচন্দ্র, "যেদিন প্রথম হাতে পাই সেই দিনই।"

"তাহলে খাতাটাকে অতখানি বিশ্বাস করলেন কেমন করে ?"

"খাতাকে বিশ্বাস ? কই খাতাকে ত আমি প্রাচীন বলে বিশ্বাস করিনি! আমি বিশ্বাস করেছি নিজেব চোখ-কে। খাতাটা আমাব হাতে পৌঁছোবাব আগেই প্রেতলোকেব প্রতীককে দেখতে পেলুম, দেখতে পেলুম মৃত সূর্যপূজারীর সমন আমায় ডাকতে এসেছে। তারপব খাতাটা আমার হাতে এলো : বুঝলুম এটা আসল নয়, তবুও এব ভেতবের খবরটুকু আসল। মনে হল আমাদের বংশের কেউ—খুব বেশিদিন আগে নয় হয়ত—এই খাতায় আমাদের বংশেব অতীত অভিশাপের কথা লিখেছিলেন। ঘটনা যখন ঘটেছে খাতাটা যে তখনকারই হতে হবে তার কোন যুক্তি নেই।"

"নিশ্চই নয়," অশোক বলল, "কিন্তু একটা কথা ভেবে দেখুন : খাতাটা যাতে দেখতে পুবনো লাগে লেখক সে চেষ্টা করলেন কেন ?"

অশোকের প্রশ্ন শোনার সঙ্গে সঙ্গে প্রতাপচন্দ্রের চেহাবা যেন বদলে যেতে লাগলো। একটা আকস্মিক চাপা উত্তেজনা হঠাৎ যেন তাঁর দুর্বল ফ্যাকাশে চেহারার ওপব কালো ছায়ার পর্দা টেনে দিল। কয়েক মুহূর্ত তিনি চুপ করে রইলেন, তারপর ভবতোষবাবুব দিকে চোখ তুলে

চাইলেন। সে চোখ স্থির, শান্ত, অথচ তার আড়ালে একটা তীব্র ভৎর্সনা।

"ভবতোষবাবু," প্রতাপচন্দ্রের গলা এমন স্থির, এমন শান্ত, যে প্রত্যেকটি শব্দের টুকরোকে স্ফটিকের মতো স্বচ্ছ মনে হয়, "ভবতোষবাবু, আলাপ করিয়ে দেবার সময় আপনি বললেই পারতেন আমায় জেরা করবার জন্যে আপনি এই অপরাধ-বিজ্ঞানী ভদ্রলোককে এনেছেন। অবশ্য এতে যে অন্যায় কিছু আছে তা আমি বলতে চাই না; আর আনবেন না-ই বা কেন? সহর শুদ্ধু সকলেরই যখন ধারণা আমার মাথা খারাপ হয়ে গিয়েছে তখন ত আমার যাঁরা মঙ্গলাকাঙ্খী তাঁরা সকলেই সব রকম চেষ্টা করবেন। এতে দোষের কিছু নেই; বরং আমার প্রতি মমতারই প্রকাশ রয়েছে। তবে একটা কথা বিশ্বাস করুন: আমার মাথা খারাপ যদিই বা হয়ে থাকে তা হলেও এতখানি খারাপ নিশ্চয়ই হয়নি যে ওঁকে অপরাধ-বিজ্ঞানী বলে পরিচয় করিয়ে দিলে আমি দুঃখিত হতুম।"

কনু আর ভবতোষবাবু একেবারে স্তম্ভিত!

অত্যন্ত সপ্রতিভ ভাবে অশোক বলল, "আপনি ঠিকই বলেছেন। তবে ভবতোষবাবুর বা আমাদের কারুর বাস্তবিক কোন দোষ নেই। কেন না, আপনার এখানে আসবার আগে পর্যন্ত আমাদের কারুর ধারণাই ছিলো না যে আপনার বুদ্ধি এখনো ঝকঝকে নির্মল রয়েছে। আজ সকালের কাগজ

আমরা পড়েছি . হয়ত আপনিও পড়েছেন এবং আপনিই বলুন যে ভাবে তারা খবর ছাপিয়েছে তাতে আমাদের সকলের পক্ষেই শঙ্কিত হওয়া স্বাভাবিক কি না। যাই হোক, খবরটা যে মিথ্যে এ দেখে আমরা সকলেই আশ্বস্ত হয়েছি।"

"তা হলে আমার মাথা যে খারাপ হয়নি এ কথা আপনি বিশ্বাস করছেন ?"

"নিশ্চয়ই"—অশোক খুব জোর দিয়েই বলল।

"ধন্যবাদ," প্রতাপচন্দ্র বললেন।

আর কথা নয়।

তারপব সমস্ত ঘরে একটা চাপা অস্বস্তিব স্তব্ধতা। কারুর মুখে কথা নেই। কী-ই বা এখন বলা যায়।

সন্ধে হয়ে আসছে। সমুদ্র আরও টকটকে, আরও বক্তাক্ত মনে হয়। আর মনে হয় সমুদ্র থেকে ঠিকবে-আসা মৃদু লাল আলো সমস্ত ঘরের আবহাওয়াকে বড় বেশি গুমোট কবে তুলছে।

কারুব মুখে কথা নেই।

কিন্তু এমন বোকার মতো দাঁড়িয়ে থাকলে ত আর চলবে না। অশোক আস্তে আস্তে প্রতাপচন্দ্রেব দিকে এগিয়ে গেল। প্রতাপচন্দ্র জানলার বাইরে চেয়ে কী যেন ভাবছেন।

"শুনুন প্রতাপচন্দ্র," অশোকেব গলা অত্যন্ত কোমল অথচ অত্যন্ত দৃঢ মনে হল, "আমি সত্যিই অপবাধ-বিজ্ঞানী হিসেবে আপনাকে কয়েকটা প্রশ্ন করতে চাই।"

"অপরাধ বিজ্ঞানের আওতায় আমার কেস-টা একেবারেই পড়ে না অশোকবাবু। আপনাকে ছোট করতে চাইছি না ; কিন্তু প্রেতলোক সম্বন্ধে অজস্র তথ্য জেনে আমি অন্তত এটুকু বুঝতে পেরেছি যে এ ব্যাপার অপরাধ বিজ্ঞানের বাইরে। আমায় সাহায্য করবার যে চেষ্টা করছেন তার জন্যে ধন্যবাদ ; কিন্তু আমার পূর্বপুরুষের কুকীর্তির যে ঋণশোধ আমায় করতেই হবে সে ব্যাপারে আপনার একটুও হাত থাকতে পারে না। আপনি বৃথা সময় নষ্ট করবেন না।"

"কিন্তু প্রেতলোকই যে আমি স্বীকার করি না।"

"তাতে প্রেতলোকের কিছুই আসে-যায় না।"

"প্রেতলোককে আমি অস্বীকার করি কেন না এ পর্যন্ত জীবনে তার কোন প্রমাণ পাইনি।"

"আপনি ভাগ্যবান পুরুষ। আপনার বংশে কোনো অতীত কুকীর্তি নেই। ঈর্ষা করবার মতো মনের জোর থাকলে আপনাকে আমি ঈর্ষা করতুম। কিন্তু সে জোর আমার আর নেই ; আমার সময়ও শেষ হয়ে এসেছে। আমি শুনেছি প্রেতের আহ্বান।"

"সেই কথা বলুন। আমায় আগাগোড়া বলুন।"

"কিন্তু লাভ কী ?"

"আর কোন লাভ থাকুক আর নাই থাকুক, অন্তত আমার নিজের মস্ত বড় ভুল ভাঙতে পারে। প্রেতলোক সম্বন্ধে ভ্রান্ত বিশ্বাসকে আমি যেমন খারাপ মনে করি প্রেতলোক সম্বন্ধে ভ্রান্ত

অবিশ্বাসকেও আমি তেমনি খাবাপ মনে করি। আমার অবিশ্বাস যদি ভ্রান্তই হয় তা হলে আপনাব উচিত তা ভেঙে দেওয়া।”—অশোকের গলায় ক্রমশ একটা আদেশের সুব ফুটে উঠতে লাগল।

“কিন্তু তর্ক করতে আর ভালো লাগে না। নিজের সঙ্গে অনেক দিন অনেক তর্ক করেছি, ক্লান্তি লাগে—তর্ক করতে আব ইচ্ছে করে না।”

“আমি তর্ক করতে চাই না।”

“তবে কী চান?”

“যা ঘটেছে তাই শুনতে চাই।”

“সে সব কথা ভবতোষবাবুকে আগেই বলেছি। তাঁর কাছ থেকেই শুনতে পারেন।”

“উঁহু। আমি এমন কয়েকটা কথা শুনতে চাই ভবতোষবাবু যা জানেন না।”

“বলুন কী কথা?”

“প্রথম কথা, আপনি প্রথম কোথায় প্রেতলোকের সাক্ষাৎ পেলেন?”

“আমার ড্রেসিং রুমে।”

“সে ঘরে কটা দরজা জানলা?”

“মাত্র একটা দরজা—আমার শোবার ঘর থেকে ঢোকবাব দরজা। ঘরটাব বাকি তিন দিকে একেবারে ঠাস ইটের গাঁথনি।”

"কী দেখলেন বলুন।"

"খুলেই বলছি। ঘরটায় ঢোকবার দরজার ঠিক মাথার ওপর একটা ইলেকট্রিক আলো আছে। আমার শোবার ঘর থেকে কয়েক ধাপ নেমে ডানদিকে আলোর সুইচটা পড়ে। সেদিন রাতে শোবার আগে জামা কাপড় বদলাবার জন্যে ড্রেসিংরুমে নামছি, সামনে দোরটা বন্ধ ছিল। দোরটা খুললুম। ঘর অন্ধকার। মনে হল অন্ধকার থেকে একটা বাদুড় উড়ে বেরিয়ে গেল। এমনিতে অবাক হবার কিছু নেই; কিন্তু সে বাদুড়টা অদ্ভুত, ভারি অদ্ভুত। তার গা থেকে ঠিকরে বেরুচ্ছে নীলচে আলো। অবাক হয়ে ফিরে চাইলুম। কিন্তু বাদুড়টাকে আর দেখতে পেলুম না। মনে হল মনের ভুল হয়ত বা। তাই মন থেকে ও কথা মুছে ফেলতে ফেলতে ডানদিকের সুইচটা টিপলুম। আর চমকে উঠলুম। ঘরের মধ্যে আমার ঠিক মুখোমুখি একটা মাথা উলটো হয়ে শূন্যে ভাসছে। আমি কিন্তু ভয় পাইনি। একটুও নয়। লাফিয়ে ঢুকলুম ঘরের মধ্যে। অন্ধকার ঘর; বাইরের দোরের ওপরের আলোটা চৌকাঠ পেরিয়ে ভেতরে পৌঁছোয় না। কিন্তু ঘরের মধ্যে অন্য আলো আছে। তাড়াতাড়ি তার সুইচ টিপে ভেতরের আলো জ্বাললুম। কিন্তু আশ্চর্য; আলোয় ঘর ভরে উঠলে ভেতরে শুধু আমার ওয়ার্ডরোব আর ড্রেসিং টেবিল ছাড়া কিছুই চোখে পড়ল না।"

"অথচ ইতিমধ্যে যে ঘর থেকে কেউ বেরিয়ে গিয়েছে তাও মনে হল না ?"

"হতেই পারে না ; কেন না, ঘরে ঢোকবার মাত্র একটি দরজা, এবং সে দরজা জুড়ে ঢুকেছি আমি নিজে। কোনো কিছু ঘর থেকে বেরিয়ে যেতে গেলে আমায় ধাক্কা না দিয়ে বেরুতেই পারে না।"

"তারপর আপনি কী করলেন ?"

"বলছি শুনুন। সেদিন আর বিশেষ কিছু করিনি। কেবল, মনটা কি রকম যেন ছমছম করতে লাগল। শোবার ঘরে ফিরে শুয়ে পড়লুম। তারপর একমাস চুপচাপ। ঠিক একমাস পরে আবার ঘটল সেই ঘটনা। এবার কিন্তু প্রথমেই আমি অনেক বেশি সজাগ ছিলুম ; ঘরের মধ্যে সেই ভাসমান মুণ্ডু দেখতে পেয়েই এক লাফে ঢুকলুম ভেতরে এবং মুহূর্তের মধ্যেই ভেতর থেকে দোরটা বন্ধ করে দিলুম। তারপর আলো জ্বাললুম। কিন্তু আশ্চর্য ! তন্ন তন্ন করে খুঁজেও ঘরের মধ্যে আর কিছু পেলুম না ; শুধু আমার কাপড়ের আলমারিটা আর ড্রেসিং টেবিলটা। · আর সেদিন আমি ভয় পেলুম ; জীবনে প্রথম ভয় পেলুম। আমার চামড়ার মধ্যেটা শিরশির করতে লাগলো ; বেশ বুঝতে পারলুম আমার হার হয়েছে। আমার সমস্ত বুদ্ধি, আমার সমস্ত অভিজ্ঞতা—সবকিছুর হার হয়েছে। আর আমার ভয় লাগল ; আমার চামড়ার মধ্যেটা শিরশির করতে লাগল

—আর সমস্ত রাত আমার চোখে ঘুম এল না। শুধু ভয়ে নয়, একটা দারুণ অস্বস্তিতে। হেরে যাবার অস্বস্তি—কেন না, তার আগে জীবনে এমন কিছুতে বিশ্বাস করিনি যার স্বপক্ষে বুদ্ধির সাক্ষী নেই। সেই রাতে প্রথম বুঝলুম বুদ্ধির হার হয়েছে: বুঝলুম এবার থেকে নতুন করে সবকিছু শিখতে হবে। তাই পরদিন ভোর বেলায় লাইব্রেরি-ঘরে ঢুকে অতি প্রিয় দর্শণ আর বিজ্ঞানের পুঁথির দিকে একদম মন গেল না। যেসব বইকে এতদিন অবহেলা করে ঠেলে রেখেছিলুম টান পড়ল সেগুলোর দিকেই—অধ্যাত্মবিদ্যা আর তন্ত্র সম্বন্ধে বইগুলো। আর অবাক হয়ে গেলুম, সেগুলো ঘাটতে ঘাটতে আর পড়তে পড়তে দিন কতক পরে হঠাৎ একদিন বেরুলো এই খাতাটা। খাতাটায় অনেক ভুলচুক চোখে পড়ল—কিন্তু তবুও সমস্ত ব্যাপারটা একেবারে স্পষ্ট হয়ে গেল চোখের সামনে। বুঝলুম ঠিক একমাস অন্তর, প্রতি অমাবস্যার রাতে, কিসের মূর্তি আমি দেখতে পাই। ক্রমে যেন সমস্ত ব্যাপারটা প্রায় নেশার মতন আমায় পেয়ে বসল, অমাবস্যা আসবার মুখে কী রকম অধৈর্য লাগতে লাগল। সূর্যপূজারীর সেই কাটা মুখ—"

অশোক হঠাৎ বাধা দিল, "সূর্যপূজারীর মুখ মনে করলেন কেমন করে?"

"আর কার মুখ মনে করতে পারি বলুন—অবশ্যই উল্টো ভাবে যে মুখ দূরে ভাসছে তাকে চিনতে পারা অসম্ভব; তাছাড়া

সূর্যপূজারীব চেহারা কেমন ছিল তারও উল্লেখ খাতাটায় কোথাও নেই। কিন্তু আর কার মুখ ওভাবে হাওয়ায় ভাসতে পারে বলুন ?"

"তা ঠিক। তাবপর কী হল ?"

"তারপর কী হল তা নিশ্চয়ই আপনি ভবতোষবাবুব কাছ থেকে মোটামুটি জানতে পেরেছেন। সমস্ত কথা আবার সুরুর থেকে গুছিয়ে বলবার মতো শক্তিও আমার নেই, কেবল যেটুকু জানেন না সেটুকু শুনতে পাবেন।" প্রতাপচন্দ্র একটু থামলেন, তারপর আবাব বলতে সুরু করলেন, "আপনাদের হয়ত খেয়াল নেই, কিন্তু আজ হল অমাবস্যা ; এবং আজকেব এই সূর্যাস্ত আমার জীবনে শেষ সূর্যাস্ত। আমায় আজ চলে যেতে হবে," প্রতাপচন্দ্রের গলা আবার আগেকার মতো দুর্বল হয়ে এলো। আবার তিনি আগেকাব কথাগুলোই করুণভাবে বলে যেতে লাগলেন, "এই সহর এই সমুদ্র, এই সূর্য্যাস্ত—এদের যে আমি কী ভালবাসি তা কেমন করে বলব ? অথচ চলে যেতে হবে যেতে হবে—আমার বংশের অতীত পাপেব প্রায়শ্চিত্ত করবার দিন এসেছে আজ।"

প্রতাপচন্দ্রের চোখে কি রকম ফাঁকা দৃষ্টি ফুটে উঠলো। —মৃত্যুর মুখোমুখি অসহায় মানুষের চোখে যেরকম ফাঁকা দৃষ্টি ফুটে উঠে। আস্তে আস্তে ঘরের ভেতর থেকে চোখ সরিয়ে নিয়ে তিনি বাইবের দিকে মুখ ফেরালেন। সূর্য অনেকক্ষণ অস্ত গিয়েছে, তবুও লালচে আভা দিগন্ত পর্যন্ত ছড়ানো।

"সূর্যদেব, আমায় ক্ষমা কোরো ; আমায় ক্ষমা কোরো। তোমার প্রিয়তম পূজারীর······" প্রতাপচন্দ্রের পাতলা ঠোঁট দুটো কাঁপতে লাগল, গলা ভারি হয়ে এলো।

কুনু আর ভবতোষবাবু বিমূঢ়ের মতো শুনছিলেন প্রতাপ-চন্দ্রের শেষ প্রার্থনা। উভয়েরই মন একেবারে যেন নেতিয়ে পড়ছিল। অসম্ভব করুণ ; অসম্ভব অসহায়। অথচ কিছুই করবার নেই, এ লোককে সান্ত্বনা দেবার কি কোনো মানে হয় ? আর কী বলেই বা সান্ত্বনা দেওয়া যাবে ? তাই দুজনে স্তব্ধ, পাথরের মূর্তির মতো স্তব্ধ।

কুনুর হুঁস হল। হঠাৎ হুঁস হল যে ঘরে অশোক নেই, "অশোক গেল কোথায় ?"

"তাইত। অশোক গেল কোথায় ?" ভবতোষবাবুও প্রায় চমকে উঠলেন।

কিন্তু কারুর পক্ষেই জোরে কথা বলা সম্ভব নয়। জীবনের যেন শেষ সান্ত্বনা উপভোগ করছেন প্রতাপচন্দ্র—প্রার্থনার সান্ত্বনা। একটানা চাপা গম্ভীর প্রার্থনায় বিঘ্ন আনা অসম্ভব।

অথচ, অশোক গেল কোথায় ? অশোক কি এই প্রেত-পুরীতে এসে উবে গেল না কি ? ভবতোষবাবুর বুকের মধ্যেটা কেমন যেন ছাঁৎ করে উঠলো। একেবারে প্রেতপুরীতে দাঁড়িয়ে প্রেত সম্বন্ধে অমন নাস্তিকতা ঘোষণা করাটা একটু বাড়াবাড়ি নয় কি ?

নবম পরিচ্ছেদ

দুর্দান্ত দরোয়ান

কিন্তু ভূত সম্বন্ধে যাদের রুচি নেই তাদেরও সম্বন্ধেও ভূতের রুচি থাকা সম্ভব নয়। তাই, এই প্রেতপুরীর মধ্যেই অশোককে আবিষ্কার করা গেল দিব্বি সুস্থ শরীরেই। সুস্থ, কিন্তু মেজাজটা রীতিমতো চড়া: প্রতাপচন্দ্রের দরোয়ানের সঙ্গে ধুমাধুম ঝগড়া লাগিয়েছে। কাছে গিয়ে কুনু আর ভবতোষবাবু ব্যাপারটা বুঝতে পারলেন কিন্তু বুঝতে পারলেন না কেন থেকে থেকে অশোক এমন খাপছাড়া কাণ্ড করে বসল। আসলে দোষটা ত তারই: কাউকে না বলে স্রেফ প্রতাপচন্দ্রের শোবার ঘরের মধ্যে ঢুকে পড়া—শুধু ঢুকে পড়া নয়, জিনিসপত্তর তছনছ করে উটকে পাটকে দেখা—এটা কোন মতেই ভদ্রতাসঙ্গত ব্যাপার নয়। প্রতাপচন্দ্রের দরোয়ান ত আর অশোককে চেনে না—সে কেমন করেই বা বুঝবে অশোক প্রতাপচন্দ্রের মঙ্গল উদ্দেশেই এই লণ্ডভণ্ড করতে এসেছে। ফলে সে এসে সঙ্গত ভাবেই বাধা দিতে গিয়েছিল, সে বলতে চেয়েছিল যে বাবুর ঘর যদি তল্লাস করতেই চাও তাহলে বাবুর মত নিয়ে এস! অশোক নাকি তার কথায় কানই দেয় নি। তারই পরিণাম এই ধুমাধুম ঝগড়া।

ভবতোষবাবুর মধ্যস্থতায় ঝগড়াটা থামলো। তিনি অশোককে বুঝিয়ে বললেন এই বিপদের বাড়িতে পা দিয়ে ছেলেমানুষি করা মোটেই উচিত নয়, ইত্যাদি। অশোকের রাগ তবু পড়ে না—কটমট করে সে দরোয়ানের দিকে তাকালো তারপর বলল প্রতাপচন্দ্রের ভালোর জন্যেই সে যখন ঘরটা পরীক্ষা করতে চায় তখন পরীক্ষা তাকে করতে দিতেই হবে। "দরোয়ানকে এ ঘর থেকে চলে যেতে বলুন" --অশোক যেন রাগে ফোঁস ফোঁস করছে।

শেষপর্যন্ত অশোকের জিদই জিৎল। শেষপর্যন্ত দরোয়ান ফোঁস ফোঁস করতে করতে ঘর ছেড়ে চলে যেতে বাধ্য হল।

এদিকে সন্ধে হয়ে আসছিলো। আলো একেবারে কমে এসেছে। ভবতোষবাবু সুইচ টিপে ঘরের আলো জ্বালাতে গেলেন। কিন্তু আলো জ্বলল না। অশোক একটু হাসল, বলল—"জানতুম।"

"জানতুম মানে ?"

"মানে, শোবার ঘরের বড় আলোটা আজ খারাপ হয়ে যাবার কথা। আজ যে অমাবস্যার রাত।"

"তার মানে ?"—ভবতোষবাবু বিহ্বল ভাবে বললেন।

অশোক তাঁর কথার জবাব দিল না। শোবার ঘর থেকে ড্রেসিং ঘরে যাবার যে দরজা তার ঠিক মাথার ওপর আর একটা আলো, সেটার দিকে সোজা এগিয়ে গিয়ে অশোক সুইচ

টিপল। জ্বলে উঠল আলো—একটা নীলচে আলো। অশোক আলোটার দিকে একটু চেয়ে রইল, তারপর ড্রেসিং ঘরের দোর ঠেলে খুলে ফেলল।

কুনু আর ভবতোষবাবু ঠিক কী করবেন ভেবে না পেয়ে চুপচাপ দাঁড়িয়ে।

ড্রেসিং-রুমের দোর খুলেই কিন্তু অশোক ভেতরে ঢুকল না। কয়েক মুহূর্ত চুপ করে ঘরের মধ্যে চেয়ে দাঁড়িয়ে রইল—পকেট থেকে রুমাল বের করে একবার নিজের মুখটা মুছল।

ড্রেসিং রুম-এর মধ্যে অন্ধকার। দরজার ওপরের নীলচে আলোটা শুধু অশোকের মুখের ওপর পড়েছে! অন্ধকার ড্রেসিং-রুম-এর মধ্যে কী খুঁজছে অশোক? কুনু আর ভবতোষবাবু এগিয়ে গেলেন তার দিকে। কিন্তু ততক্ষণে অশোক ড্রেসিং-রুমএর মধ্যে ঢুকে ভেতরের আলো জ্বালিয়ে ফেলেছে।

ভেতরে দেখবার কিছুই নেই! শুধু একটা ড্রেসিং-টেবিল, সেকেলে ধরনের। একটা কাপড়ের আলমারি, সেকেলে ধরনের। আর কিছুই নয়।

কিন্তু সবই ত খাপছাড়া কাণ্ড অশোকের! হঠাৎ মাটির ওপর প্রায় উপুড় হয়ে শুয়ে পড়ে খুব মনোযোগ সহকারে মাটিতে ম্যাগ্নিফাইং গ্লাস দিয়ে কী যেন খুঁজতে সুরু করল। প্রেত জিনিসটা যে সূক্ষ্ম এ কথা অবশ্য সবাই মানে—কিন্তু তাই বলে অমন ভাবে তাকে মাটিতে তল্লাস করতে হবে! ভবতোষ-

বাবু অশোকের ছেলেমানুষি দেখে মনে মনে না হেসে পারলেন না ; কিন্তু তারপরই অশোক যা সুরু করল তা দেখে হাসি আর মনে মনে চেপে রাখাও কঠিন হল ! লাইব্রেরি ঘরে প্রতাপচন্দ্র প্রলাপ বকছেন—তাঁর মাথার ঠিক নেই, তাঁর সম্পত্তি ফসকে যাবার জোগাড় ! কোথায় তাঁকে একটু সান্ত্বনা দেবার চেষ্টা করবে, তাঁকে বাঁচাবার চেষ্টা করবে—আর তা নয়, ছোট্ট ড্রেসিং ঘরে ঢুকে এ কী ছেলেখেলা !

ড্রেসিং টেবিলের তলায় একটা নীচু জলচৌকি মতন ছিল, তার ওপর ড্রেসিং টেবিলটা বসানো। অশোক করল কি, পকেট থেকে একটা গজফিতে বের করে সেই জল চৌকিটা ঠিক কতখানি উঁচু তাই মাপতে সুরু করল। তাজ্জব ব্যাপার !

"এত মাপজোপ কিসের ?"

কিন্তু এ প্রশ্নের জবাব পাওয়া গেল না। অশোক শুধু গম্ভীর ভাবে আপন মনে বলল, "হুঁ", তারপর কনুর দিকে চেয়ে, "ভবতোষদার চেয়ে প্রতাপচন্দ্র ঠিক কতটা লম্বা হবেন আন্দাজ করতে পারিস ?"

"তা প্রায় ইঞ্চি আষ্টেক হবেন বই কি।"

"ঠিক ইঞ্চি আষ্টেক ত ?"

কিন্তু কনুকে আর উত্তর দিতে হল না। ঘরের মধ্যে হৈ হৈ করতে করতে ঢুকল প্রতাপচন্দ্রের দুদান্ত দরোয়ান। বহুক্ষণ সে বাবুর শোবার ঘর ছেড়ে দিয়েছে, নেহাত উকিলবাবু বলেছেন

বলেই দিয়েছে। কিন্তু আর সে রাজি নয়। যদি শোবার ঘর তল্লাস করবারই দরকার থাকে তাহলে ঠিক মত ওয়ারেন্ট নিয়ে আসতে হবে, অন্তত বাবুর সম্মতি ত বটেই। তার বাবু অসুস্থ, সেই অসুস্থতার সুযোগে কেউ যে ঘরের মধ্যে যা খুসি তাই করবে·· ·· ·· ·ইত্যাদি।

লোকটা দেখা গেল নেহাতই বগচটা প্রকৃতির। তার সঙ্গে হৈ-হল্লা নিশ্চয়ই করা যেত, ভবতোষবাবু ত প্রায় তাই ঠিকই করেছিলেন। স্পষ্ট রাগে তাঁর মুখ টকটকে লাল হয়ে উঠেছে। কুনু ভাবছিল অশোকেরও নিশ্চয়ই রোখ চেপে গিয়েছে, নিশ্চয়ই সেও জবরদস্তি সুরু করবে। ফলে হবে একটা কেলেঙ্কারী।

কিন্তু তা হল না। দেখা গেল, অশোকের মেজাজ এখন ভয়ানক মোলায়েম, ভয়ানক মিষ্টি। বরং সে উলটো সুরই গাইতে সুরু করল, "ঠিকই ত বলেছে বাপু! কর্তার অবর্তমানে অপরিচিত লোক শোবার ঘরে ঘটঘট করবে—এ আর কার সহ্য হয়? চলুন ভবতোষদা, আমাদের আবার আজ একটু সকাল সকাল শুয়ে পড়তে হবে।"

এ আবার কী খাপছাড়া কথা? "হঠাৎ সকাল সকাল শোবার তাগিদ কেন?" ভবতোষবাবু প্রায় বিহ্বল ভাবেই বললেন।

"ওরে বাবা, আজ অমাবস্যার রাত! মনে নেই এ রাতে ভূত বেরুবার কথা," অশোক বলে চলল, "তাই, তাড়াতাড়ি বাড়ি

ফিরে সকাল সকাল শুয়ে পড়াই ভালো।' অশোকের গলায় কোথায় যেন প্রচ্ছন্ন বিদ্রূপ—"আব দরোয়ানজি, আজ রাতে খুব হুঁসিয়াব থেকো তোমরা। বাবুব শোবাব ঘবটা বাঁচালেই ত হল না, বাবুকেও বাঁচাতে হবে। আজ বাতে যে ভূত বেরুবাব ভয়—ভূতে যদি বাবুকে ভুলিয়ে নিয়ে যায় তা হলে কিন্তু বড় আফশোষেব কথা হবে!"

বিহ্বল ভাবে দাঁড়িয়ে বইল দবোয়ান। ওবা তিনজন ঘব থেকে বেবিয়ে পড়ল।

দশম পরিচ্ছেদ

জেলেপাড়া হয়ে

আকাশে আলো নেই। আজ চাঁদ উঠবে না। পথ অন্ধকার। থমথম করছে সবাইকার মন মেজাজ।

প্রতাপচন্দ্রের বাড়ি থেকে বেরুবার সময় অশোক বলেছিল তাড়াতাড়ি শুয়ে পড়বার কথা। কিন্তু পথে বেরিয়ে দেখা গেল তার মতলব বদলে গিয়েছে। তাড়াতাড়ি বাড়ি ফেরার চেয়ে সমুদ্রের কিনারায় গিয়ে খানিকটা হাওয়া খাওয়ার ব্যাপারেই তার আপাতত ঢের বেশি উৎসাহ। কিন্তু সমুদ্রের ধারে বেড়াবারও ত ভদ্র জায়গা এ সহরে বিরল নয়, হাওয়া যদি খেতেই হয় তা হলে সেদিকে যাওয়াই ত উচিত। কিন্তু, অশোক সোজা এগিয়ে চলল জেলে-পাড়ার দিকে। সেদিকটা অপেক্ষাকৃত নোংরা। নেহাত পাগল না হলে কেউ সেদিকে হাওয়া খেতে যায় না।

কিন্তু, মুহূর্তে মুহূর্তে অশোকের যেন মত বদল হচ্ছে। হাওয়া খেতে এলে ত হাওয়া খাওয়াই উচিত। তার বদলে এ কী?

অদূরে, একটা নৌকো বালির ওপর উবুড় করে ফেলে দুজন জেলে সেটাকে মেরামত করছে দেখা গেল। দূর থেকে লণ্ঠনের

আলোয় তাদের শরীর আবছা দেখা যায়। অশোক হন হন করে এগিয়ে চলল তাদেরই দিকে। মনে হল হঠাৎ তাদের আবিষ্কার করতে পেরে সে আহ্লাদে আটখানা হয়ে পড়েছে।

"কিহে কর্তা, নৌকোটা বুঝি খুব জখম হয়েছে?"—ইতিমধ্যেই অশোক ভাঙা ভাঙা গোয়ানিজ ভাষা রপ্ত করে ফেলেছে, অন্তত গোয়ানিজ জেলেদের সঙ্গে কথা বলার পক্ষে যথেষ্ট ভালোই।

"তা জখম খুবই হয়েছিল।"

"মেরামত শেষ হতে লাগবে কতক্ষণ?"

"আর কতক্ষণ বাবু; সকাল থেকে ত এই নিয়েই পড়ে রয়েছি। মেরামত শেষ না করে আর জলস্পর্শ করছি না।"

"তা বেশ। তা বেশ। তা হলে জোয়ার আসবার আগেই মেরামত শেষ হয়ে যাবে। কি বল?"—যেন নৌকোটা মেরামত হবার ওপর অশোকের জীবন-মরণ নির্ভর করছে—এত উৎসাহ।

"তা নিশ্চয়ই হবে"—জেলে জোর দিয়েই বলল।

"তাহলে জোয়ার এলে এই নৌকো নিয়েই ঢেউ ভেঙে এগুতে পারবে—কি বলো?"

"তা যদি না পারি তাহলে যে মাঝিপাড়ার সর্দার নামে কলঙ্ক পড়বে।"

"বেশ, বেশ। কিন্তু একটা কথা," অশোক আমতা

আমতা করে বলল, "আজ রাতে আর না হয় মাছ না-ই ধরলে!"

এ আবার কোন ধরনের অনুরোধ! কুন্থু আর ভবতোষবাবু দুজনেরই চোখ প্রায় গোলগোল!

"সে কি কথা বাবু?"—জেলের সর্দার রীতিমতো ঘাবড়ে পড়েছে, "মাছ না ধরলে সংসার চলবে কেমন করে?"

"আঃ হা, তার জন্যে আবার ভাবনা কি?"—বলতে-বলতে অশোক পকেট থেকে একটা করকরে দশটাকার নতুন নোট বের করল, "সংসার চালাবার কাজটুকু এই দিয়েই হবে। কেমন?"

একেবারে চারজোড়া বিহ্বল চোখ অশোকের ওপর। এ যেন রীতিমতো ভূতুড়ে ব্যাপার। শেষ পর্যন্ত কি অশোককেই ভূতে পেল না কি।

সর্দার হলেও, জেলেটা যে বেজায় ঘাবড়ে গিয়েছে সেটুকু বুঝতে পারা যায় তার হাবভাব দেখেই! প্রথমটায় সে কিছুই ঠাহর করতে পারল না, তারপর যেন ব্যাপারটা ঠিকমতো বিশ্বাস করতে সাহস পেল না। নোটটা লণ্ঠনের আলোয় একবার তুলে ধরল, নোটটা যে জাল নয় বুঝতে পারল—চকচক করে উঠল তার দুটো চোখ—কিন্তু ওটা ট্যাঁকে পোরা ঠিক হবে কি না ঠাহর করতে না পেরে প্রায় জবুথবু হয়ে দাঁড়িয়ে রইল।

"ঘাবড়াচ্ছো কেন?"—অশোক খুব সহজ গলাতেই বলল,

"আসলে ওটুকু ত অগ্রিম। বাকি টাকা পরে পাবে—অনেক মোটা টাকা।"

"কিন্তু কী করতে হবে আমাদের?"

"বিশেষ কিছুই নয়। নৌকোটা নিয়ে ঠিক এই জায়গায় আমার জন্যে অপেক্ষা করবে। রাতে সমুদ্রে জোয়ার এলে একটু বেড়াতে বেরুবো ভাবছি। তখন যদি ঠিকমতো বেড়িয়ে আনতে পারো তা হলে দেখবে কী রকম মোটা বখশিশ পাবে!"

বিহ্বল জেলে দুজনকে পেছনে ফেলে অশোক বাড়ি ফেরার পথ ধরল। তার পেছনে ভবতোষবাবু। তার পেছনে কুনু।

একাদশ পরিচ্ছেদ

অন্তর্দ্ধান

বিমূঢ় জেলে দুজনকে পেছনে ফেলে কুনু আর ভবতোষবাবুর সঙ্গে অশোক বাড়ি ফেরার পথ ধরল। জেলে দুজনের সঙ্গে কথা বলবার পর কে যেন তার মুখে চাবি বন্ধ করে দিয়েছে একেবারে একটিও কথা বলছে না।

ভবতোষবাবু চলতে চলতে বললেন "কী রকম বুঝছ, অশোক?"

"বুঝছি কপালে দুর্ভোগ আছে।"

"তার মানে?"

"দেখুনই না। অবশ্য আমার সমস্ত হিসেব ভুলও হতে পারে।"

"আঃ হা! খুলেই বলো না।"

"পরে বলব।"

"পরে মানে কখন?"

"মনে হচ্ছে কাল সকালে।"

এর পর আর কথা চলে না! তিনজন তাই চুপচাপ বাড়ির দিকে এগিয়ে চলে।

বাড়ি ফিরে অশোক তার চামড়ার ব্যাগ নিয়ে বসল। তার

মধ্যে থেকে দু-একটা জিনিস বের করে রাখল, সেদিন দোকান থেকে কেনা দু-একটা ওষুধপত্তর ভরে নিল ব্যাগে। নিজের অটোমেটিক রিভলভারটা বের করে সাফ করল, কুন্নুকে বলল তারটাও সাফ করে রাখতে। রাতে দরকার পড়তে পারে। তারপর, তাজা কার্তুজের প্যাকেট খুলে ভরে নিল রিভলভারে। কুন্নুকেও ভরে নিতে বলল।

দিদি এসে বললেন, "খাবার দেওয়া হয়েছে।"

"যাচ্ছি। আচ্ছা দিদি, তোমাদের বাড়িতে নিশ্চয়ই ভালো থার্মোফ্লাস্ক্ আছে।"

"হুঁ। কী হবে?"

"খানিকটা খুব কড়া কফি ভরে রাখতে হবে। কফি যেন খুব বেশি কড়া হয় আর তাতে দুধ না চিনি দেওয়া না হয়।"

"কী আশ্চর্য! তুই ত কড়া কফি একদম খেতে পারিস নে। আর তাছাড়া দুধচিনি একদম বারণ?"

"আমাদের জন্যে নয়। আমাদের জন্যে যদি বাড়তি ফ্লাস্ক্ থাকে তাহলে চা করে রাখলেই চলবে।"

"কিন্তু কফি কার জন্যে?"

"কাল সকালে বলব।"

তারপর আবার চুপচাপ। খাবার সময় অশোক একটিও কথা বলল না। খাওয়া শেষ হয়ে যাবার পর কুন্নুকে বলল,

"চটপট শুয়ে পড়। শোবার সময় বড় টর্চ আর রিভলভার মাথার বালিসের তলায় রাখিস।"

কুনু বেচারা ফাজলামি পর্যন্ত করতে পারছে না—অশোকের চেহারা এত গম্ভীর।

রাত কত হবে বোঝা যায় না। শুধু কালো আর জমাট বাঁধা অন্ধকার। অমাবস্যার রাত। ধড়মড় করে বিছানার ওপর উঠে বসল কুনু—মনে হল অন্ধকারে কে যেন ঘরের জানলা দিয়ে ভেতরে ঢুকল।

কুনু হয়ত বিনা দ্বিধায় তার দিকে রিভলবার তুলে ধরত, কিন্তু বেচারা নিরস্ত্র হতে বাধ্য হল।

"ঘুম ভেঙে গেল?", স্পষ্ট অশোকের গলা, "আমার দিকে কিন্তু গুলি চালাস নি।"

"তুই? অশোক?"

"হুঁ। বাইরের দরজা বন্ধ দেখলুম তাই।"

"কিন্তু গিয়েছিলি কোথায়?"

"সান্তা ক্রুস।"

"এই মাঝরাতে?"

"প্রতাপচন্দ্রের আজ রাতেই হারিয়ে যাবার কথা। দেখতে গিয়েছিলুম সত্যি হারিয়ে গিয়েছেন কি না!"

"কী দেখলি?"

"দেখলুম হারিয়ে গিয়েছেন। তাজ্জব ব্যাপার। দেউড়ির দরোয়ান না কি টেরই পায় নি!"

"তারপর?"

"দশ মিনিটের মধ্যে আমাদের রওনা হতে হবে। সময় একদম নেই। তৈরি হয়ে নে। আমি ততক্ষণ ভবতোষদাকে ডেকে তুলছি।"

অশোক ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

ঘুমচোখে একটা প্রকাণ্ড বর্মা চুরোট ধরালেন ভবতোষবাবু, দিদি তাঁর হাতে একটা ফ্লাস্ক দিলেন, "এটায় চা—" তারপর আর একটা ফ্লাস্ক কুনুর হাতে—"এটায় কফি।"

"কুনু, ফ্লাস্কটা খুব সাবধান! ভাঙলে সর্বনাশ হবে।"

"ঠিক আছে। ভাঙবে না।"

"টর্চ আর রিভলবার ভুলিস নি ত?"

"না। কোমরে ঝুলিয়ে নিয়েছি।"

"ঠিক আছে। আসি দিদি। তুমি দুশ্চিন্তা কোরো না। কাল সকাল হবে আমাদের ফিরে আসতে।"

তারপর ওরা যাত্রা করল।

ঘুটঘুটে অন্ধকার পথ। কটা বেজেছে আন্দাজ করা কারুর পক্ষেই কঠিন। অশোকের হাতঘড়িতে অবশ্য ফসফরাস জ্বলছে, কিন্তু সেদিকে ভালো করে দেখবার উৎসাহ কারুর নেই।

অন্ধকারের বুক চিরে অশোকের তীব্র টর্চ সবাইকে পথ দেখিয়ে নিয়ে চলেছে। আর সকলে চলেছে চুপচাপ। কিন্তু কোন দিকে? কোন দিকে গেলে পাওয়া যাবে প্রতাপচন্দ্রকে? এ কথার জবাব কে দেবে? অশোক যে কথা একদম বলছে না। অশোক সোজা চলেছে সমুদ্রের দিকে।

সমুদ্রের দিকে কেন? কুনু আর ভবতোষবাবু কিছুই বুঝতে পারেন না। অনুগতের মতো অশোকের পেছুপেছু এগিয়ে চলেন শুধু।

চলতে চলতে অশোক হঠাৎ থমকে দাঁড়াল। থমকে দাঁড়ালেন ভবতোষবাবু আর সেই সঙ্গে কুনুও।

কার যেন পায়ের শব্দ। কে যেন দৌড়ে আসছে তাদেরই দিকে। স্তব্ধ রাত্রির বুকে সে শব্দ স্পষ্ট আর ভারি।

কে আসছে? অশোক টর্চ ফেলল পেছুন দিকে। কুনু কোমরে হাত দিল--বিভলবারের ওপরে হাত দিল।

অনেক দূরে টর্চের আলোয় দেখতে পাওয়া গেল প্রতাপ-চন্দ্রের সেই দুর্দান্ত দরোয়ানকে! হাঁপাতে হাঁপাতে সে ছুটে আসছে। মুখে টর্চের আলো পড়ায় লোকটা থমকে দাঁড়াল, তারপর আন্দাজে উকিলবাবুদের অনুমান করতে পেরে চেঁচিয়ে বলল, "দাঁড়ান বাবু। জরুরি কথা আছে।"

ওরা তিনজন অপেক্ষা করে রইল। দরোয়ান দৌড় থামিয়ে আসতে আসতে এগিয়ে এল।

অশোক শুধু একবার অধৈর্যভাবে চাইল নিজের হাত ঘড়ির দিকে।

"ভয়ানক ব্যাপার চলেছে বাড়ির মধ্যে। আপনারা তাড়াতাড়ি আসুন, আপনাদের ডাকতে এসেছি।"

"কী ব্যাপার?"

"প্রতাপচন্দ্রকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না।"

"সে খবর ত আমিই প্রথম তোমাকে দিয়েছি।"

"হুঁ। তারপর বাড়ির মধ্যে ঢুকে আমি খোঁজ করতে সুরু করি। কিন্তু সমস্ত বাড়িময় এক অসম্ভব ঘটনা ঘটতে সুরু করেছে: একটা বাদুড—তার গা থেকে ঠিকরে বেরুচ্ছে নরকের নীলচে আগুন—সমস্ত বাড়িময় ঘুরে বেড়াচ্ছে, আর বাড়ির সর্বত্র নানান রকম শব্দ, নানান রকম অদ্ভুত আলো—জিনিসপত্র সমস্ত একেবারে লণ্ডভণ্ড হয়ে যাচ্ছে। তার মধ্যে একাএকা বাবুকে খোঁজবার সাহস হল না. অন্য সব চাকরবাকরও ভয়ে একেবারে ঘাবড়ে পড়েছে। তাই আপনাদের ডাকতে এসেছি। এখুনি আপনারা আসুন। সবাই মিলে বাবুকে খোঁজ করব।"

"তোমার বাবুকেই খুঁজতে বেরিয়েছি আমরাও।"

"কিন্তু এদিকে কোথায় চলেছেন?"

"জেলে পাড়ার দিকে।"

"বাবু কি ওই দিকে গিয়েছেন?"

"দেখা যাক কোন দিকে গিয়েছেন। আমরা যতক্ষণ না

ফিরি ততক্ষণ তুমি অন্য লোকজন নিয়ে বাড়িতেই থাকবে যাও।"

"না না, আমার সাহস হচ্ছে না। আপনারা আসুন।"

অশোক আবার হাতঘড়ির দিকে দেখল, তারপর সংক্ষেপে শুধু বলল, "এখন আমাদের সময় নেই।" তারপর হনহন করে আবার হাঁটতে সুরু করল।

বোঝা গেল ভূতের ভয়ে দরোয়ান এখন বাড়ি ফিরতে মোটেই রাজি নয়। তাই সেও পা চালাল ওদের দলের সঙ্গে।

টাকার লোভ বড় ভয়ানক লোভ। দশটাকার করকরে নোট হাতে পেয়ে এবং আরও অনেক টাকার আশ্বাস পেয়ে জেলে দুজন সমুদ্রতীরে তাদের নৌকো নিয়ে একেবারে প্রস্তুত। কিন্তু ওদের টাকা দিয়ে দাঁড় না করিয়ে রাখলেও হয়ত চলত, কেন না ইতিমধ্যে আরও কয়েকটা জেলেদের নৌকো সমুদ্রে মাছ ধরা শেষ করে পাড়ে পৌঁছেছে। এ সময়টায় সমুদ্র তীরে নৌকোর বাস্তবিকই অভাব নেই।

নির্দিষ্ট নৌকোর মধ্যে অশোক প্রায় লাফিয়ে উঠল। তার শরীর ক্ষিপ্র চনমনে হয়ে উঠেছে। বারবার হাতঘড়ির দিকে দেখছে, মুহূর্ত মাত্রও আর সময় নষ্ট করতে রাজি নয়।

"সময় বড় কম। তাড়াতাড়ি উঠে পড়ুন আপনারা"—

অশোক যেন যুদ্ধক্ষেত্রেব সেনানায়ক হয়ে গিয়েছে। তাব গলায শুধু আদেশের সুর।

ভবতোষবাবু উঠলেন। কুনু উঠল। দরোয়ানও উঠতে যাচ্ছিল, কিন্তু অশোক বাধা দিল।

"তুমি বাড়ি ফিবে যাও। যদি বাড়ি ঢুকতে সাহস না হয পুলিশে খবর দেবে যাও।"

"আসতে চাচ্ছে আসুক না আমাদেব সঙ্গে", ভবতোষবাবু বললেন, "ক্ষতি ত কিছু নেই, বরং দলে আর একজন থাকা ত ভালই।"

অশোক শুধু বলল, "উঁহু।" তাবপব জেলে দুজনকে আদেশ দিল, চটপট নৌকো নাবাতে।

স্তম্ভিত দরোয়ান চুপচাপ বালির ওপব দাঁড়িয়ে।

সমুদ্র জোয়াবে ফুলে উঠেছে।

নৌকো নাবানো সহজ কথা নয়। কিন্তু জেলেপাড়াব সর্দারের নামে অত সহজে কলঙ্ক পড়ে না—ঢেউ-এব সঙ্গে ধস্তাধস্তি করে ওবা দুজন অল্পক্ষণেব মধ্যেই নৌকো ভাসিয়ে দিল।

বালিব ওপর দাঁড়িয়ে দবোয়ান শুধু ফ্যালফ্যাল করে দেখতে লাগল—দেখতে লাগল ছোট্ট নৌকোটা সমুদ্রের অন্ধকারে মিশিয়ে যাচ্ছে।

"যাবি কোন দিকে? ব্যাপার কি?" কুনু প্রশ্ন করল এতক্ষণ পরে।

কিন্তু সে ভাবনা অশোকের। তার কর্মপদ্ধতি অনেক আগে থাকতেই ছকা আছে : যেদিকে গেলে বোম্বাই সহর পাওয়া যাবে ঠিক তার উলটো দিক বরাবর যাবার নির্দেশ দিল জেলে দুজনাকে।

জোয়ারের ঢেউয়ের সঙ্গে ধস্তাধস্তি করার দরুণ পরিশ্রমের মধ্যেও জেলে দুজনের ঠোঁটে নিশ্চয়ই ফুটে উঠেছিল হাসির রেখা, মাঝরাতে পাগলা বাবুর খেয়াল দেখে হাসি! কিন্তু অন্ধকারে সে হাসি কারুর চোখে পড়ল না।

কুনু অবাক হয়ে সমুদ্র দেখছিল। সমুদ্রের এরকম মূর্তি সে এর আগে কখনো দেখেনি। শুধু জমাট বাঁধা নিরেট একটা অন্ধকারের বন্যা—অন্ধকার আর শুধু অন্ধকার। দূরে, কিনারার দিকে, ফসফরাসের রূপোলি আগুন জ্বলছে—যেন একটা বিরাট দৈত্য, তার ঠোঁটের কোনায় নরকের নীলচে আগুন!

এ এক ভারি অদ্ভুত অভিজ্ঞতা। এই বিরাট কালো দৈত্যের বুক চিরে ছোট্ট নৌকোয় চড়ে এগিয়ে চলা—লোকালয়ের ঠিক উলটো দিকে, কোন দিকে শুধু অশোকই জানে। কোলের ওপর কফির ফ্লাস্ক্, কোমরে টর্চ আর রিভলভার, রাত কটা হবে জানা নেই। এতদিন পরে একটা সত্যি উত্তেজনার আস্বাদে কুনুর মন বেশ চনমন করে উঠেছে।

অশোক শুধু ঘড়ির দিকে অসহিষ্ণু ভাবে তাকাচ্ছে—

"জোরে চালাও। আরো জোরে--যত জোর পারো"—এ ছাড়া তার মুখে আর কোন কথা নেই !

হঠাৎ মনে হল সমুদ্রের ওপর ছপছপ করে আর একটা শব্দ। জলের ওপর দাঁড় টানার শব্দ। স্পষ্ট শব্দ। অশোক চমকে উঠল আর সঙ্গে সঙ্গে চীৎকার করে বলল, "চুরোটটা জলে ফেলে দিন।" কিন্তু, ভবতোষবাবু চুরোটটা জলে ফেলে দেবার আগেই দারুণ দুর্ঘটনা ঘটে গেল- দূর সমুদ্রের বুকে গর্জন করে উঠল একটা বন্দুক আর জেলের সর্দার আহত হয়ে লুটিয়ে পড়ল ছোট্ট নৌকোয়। তারপর আর একটা, আরও একটা।

সমুদ্রের বুকের ওপর থেকে কে যেন পাগলের মতো এলোমেলো গুলি চালাচ্ছে !

এবার কিন্তু নৌকোর কোন আরোহী আহত হল না, আহত হল নৌকোটা। কয়েকটা গুলির আঘাতে নৌকোর একটা দিক যেন ঝাঁঝরা হয়ে গেলো আর সেদিক দিয়ে হুড়হুড় করে নোনা জল ঢুকতে সুরু করল।

"কুনু, কফির ফ্লাস্ক ভবতোষদাকে দিয়ে হালটা ধর। ভবতোষদা, পা দিয়ে প্রাণপণে টিপে ধরুন নৌকোর ফুটো গুলো"—চীৎকার করে উঠল অশোক আর শুধু চীৎকার নয়, তার হাতের রিভলভারও গর্জন করে উঠল। অনেক দূরে অন্ধকারের দিকে সেও এলোমেলো গুলি চালাতে সুরু করেছে।

"টর্চ জ্বালাস নি, ওদের পক্ষে লক্ষ্য করবার সুবিধে হবে"—দূরে দাঁড় টানার শব্দ লক্ষ্য করে বেপরোয়া গুলি চালাচ্ছে আর পাগলের মত চীৎকার করছে—"হালটা মজবুত করে নৌকোর সঙ্গে বাঁধ তারপব দেখ সর্দারেব জখমটা কোথায় হল, পাব্‌লিস ত আমার ব্যাগ থেকে ফার্স্ট এড্ দে—"

আবার অশোকের হাতে গুলির শব্দ। এবার সমুদ্রের অন্ধকারে দূরে একটা আর্তনাদ।

আবার অশোকেব পিস্তল।

কিন্তু এবার যেন জলযুদ্ধটা একতরফা হতে সুরু কবল। কুনুও ক্ষেপে গিয়েছে। হাল বেঁধে মাঝিকে পরীক্ষা কবে দেখল, তাব আঘাত গুরুতর হয়নি, কাঁধের কাছে সামান্য চোট লেগেছে। ক্ষিপ্রহাতে কুনু তাব কাঁধে একটা ব্যাণ্ডেজ বেঁধে ফেলল—"ভবতোষদা, ওকে একটু চা ঢেলে দিন"—বলতে-বলতে টলটলে নৌকোর মধ্যে সোজা হয়ে দাঁড়াল কুনু আর দূরে দাঁড়ের শব্দ লক্ষ্য কবে গর্জণ কবে উঠল তার হাতের পিস্তলও।

কিন্তু ও তরফ থেকে আর জবাব নেই। ববং দাঁড়ের শব্দ ক্রমশ যেন সরে যাচ্ছে!

হো হো কবে হেসে উঠল অশোক, "ভাবতেই পারে নি আমাদের কাছেও পিস্তল আছে আর আছে অজস্র কার্তুজ। ভাবতে পাবে নি বলেই সামান্য কয়েকটা কার্তুজ নিয়ে ধমক

দিতে এসেছিল। কার্তুজ ফুরিয়েছে, এখন তাই রণে ভঙ্গ দিচ্ছে।"

"ফলো করবি না?"

"উঁহু। ফলো করবার সময় কোথায়?" বলতে বলতে অশোক একবার হাতঘড়ির দিকে চাইল, "কুনু, কত জোরে দাঁড় টানতে পারবি?"

কলকাতা রোইং ক্লাবের চাম্পিয়নসিপের মর্যাদা কুনুর মধ্যে যেন মাথা চাড়া দিয়ে উঠল, বুক ফুলিয়ে ধরল দাঁড় আর নৌকা ছুটে চলল প্রায় তীব্রবেগে। একজন মাঝি আর কুনু, তাদের মধ্যে পাল্লা চলেছে কার হাত ক্ষিপ্র!

ভবতোষবাবু পা দিয়ে প্রাণপণে নৌকোর গর্ত চেপে রয়েছেন, অশোক আহত মাঝিকে ওষুধ দিয়ে চাঙ্গা করে তুলছে আর দূরে মিলিয়ে গিয়েছে পলায়মান নৌকার শব্দ।

ওরা কারা? ভবতোষবাবু থমকে বসে ভাবছিলেন। ব্যাপারটা যেন কিছুতেই তাঁর মাথায় ঢুকছিল না। এই মাঝরাতে নৌকো নিয়ে অশোক কোথায় চলেছে? কারা বাধা দিতে চায় অশোককে? অশোক তাদের কথা আঁচই বা করল কেমন করে? বেরুবার আগেই যে আঁচ করেছিল তার প্রমাণ অশোক প্রস্তুত হয়ে বেরিয়েছে।

কুনু এমন পাকা মাঝির মতো দাঁড় টানতে শিখল কোথায়?

নৌকো হুড়হুড় করে এগিয়ে চলেছে। কোন দিকে চলেছে? কোনদিকে গেলে সন্ধান পাওয়া যাবে প্রতাপচন্দ্রের?

এই সব এলোমেলো প্রশ্নে ভবতোষবাবুর মাথার মধ্যেটা কী রকম যেন গুলিয়ে যাচ্ছিল! চোখে কিছু দেখবার উপায় নেই!

অন্ধকার রাত!

অমাবস্যা!

সমুদ্রে আলো নেই!

হঠাৎ অশোকের হাতে জ্বলে উঠল তীব্র টর্চ। সমুদ্রের বুকের অন্ধকার চিরে কী যেন খুঁজতে সুরু করল আলোর তীব্র বর্শা। ক্রমে চঞ্চল আলো স্থির হয়ে দাঁড়াল একটা ছোট পাথরের দ্বীপের ওপর। সে পাথরের ওপর জীর্ণ প্রাসাদ, বহু শতাব্দীর ভারে ভেঙে গিয়েছে।

অন্ধকারে থমথম করছে সে প্রাসাদ।

"কুনু, ওইটে। ওই দিকে নৌকো ভেড়াতে হবে," অশোক বলল।

কিন্তু, এতক্ষণে ক্ষেপে উঠল মাঝি দুজন! প্রথমটায় বাবুকে মজাদার পাগল মনে হয়েছিল, কিন্তু ক্রমশই তারা বুঝছে এ বাবু শয়তানের অনুচর ছাড়া কেউ নয়। গোলাগুলি না হয় বোঝা যায়। আহত হয়েছে বলেও সর্দার ততখানি ঘাবড়ে পড়েনি। কিন্তু এই মাঝরাতে—ঘোর অমাবস্যার রাতে—ওই

নামকরা ভুতুড়ে পোড়ো বাড়িতে যাওয়া ? ও বাড়ির ইতিহাস কে না জানে, কে না জানে প্রেতের উপদ্রবে ও বাড়ির মালিক নিজে সেখানে টি'কতে পারে নি। ওই বাড়িই ত উদয়চন্দ্রের আদিম বাড়ি, ওই বাড়িতে টে'কতে পারেন নি বলেই ত তিনি নিজে নতুন বাড়ি করেছিলেন সান্তা ক্রুস্-এ।

এই মাঝরাতে, গভীর অমাবস্যার রাতে, ওই বাড়ির গায়ে নৌকো লাগানো ? মাঝিরা কিছুতে রাজি নয়, জান থাকতে নয়।

কিন্তু নৌকোর দাঁড় কুনুর হাতে। অশোক এক হাতে ধরল হাল আর তার আর এক হাতে উদ্যত আগ্নেয়াস্ত্র! নিরুপায় মাঝি দুজন শুধু গজরাতে লাগল—তা ছাড়া আর তারা কী করতে পারে ? এমনটা হবে জানলে টাকার লোভে কি তারা কখনো ভুলত ?

"ভবতোষদা, কফির ফ্লাস্কটা সামলে রাখবেন। টর্চটা ধরুন বাড়িটার ওপর", অশোক বলল। তার গলায় কঠোর আদেশ শুধু।

"জোয়ারের জলে বাড়ির চারদিক ত ভেসে গিয়েছে। নৌকো ভেড়ানো যাবে না", কুনু বলল। মরীয়ার মতো সে দাঁড় টেনে চলেছে।

"এই বাড়ির নীচে কোথাও একটা গোপন সুড়ঙ্গপথ আছে," অশোক বলে চলল, "সেই পথ দিয়েই নাকি বহুদিন আগে

প্রতাপচন্দ্রের পূর্বপুরুষরা জলদস্যুর ব্যবসা চালাতেন। সেই সুড়ঙ্গপথটা খুঁজে বের করতে হবে।”

হাল অশোকের হাতে। ভবতোষবাবুর টর্চ অনুসরণ করে সে বাড়িটার চারপাশে নৌকো ঘোরাতে লাগল।

অমঙ্গলের আশঙ্কায় দুজন মাঝি জড়সড় হয়ে বসে।

শেষ পর্যন্ত সুড়ঙ্গপথ বেরুল। মাঝি দুজন ইষ্টমন্ত্র জপ করতে লাগল।

কুনু একা দাঁড় টানছে। অশোক হাল ধরে। নৌকো ঢুকল অন্ধকার সুড়ঙ্গর মধ্যে।

“সাবধান কুনু, পাথরে না চোট লাগে”, সুড়ঙ্গের মধ্যে অশোকের গলা গুমগুম করছে—“ভবতোষদা, দেয়াল আর ছাদের দিকে টর্চ ঘোরান, নৌকো বাঁধবার আংটা পাওয়া যাবে।”

আংটা বেরুল শেষ পর্যন্ত। মজবুত করে আংটার সঙ্গে নৌকো বেঁধে ফেলল কুনু।

কুনু আর সেই আলস্যপ্রিয় যুবক নয়। তার শরীরের প্রত্যেকটি পেশী চঞ্চল হয়ে উঠেছে।

এক হাঁটু জল। তার মধ্যেই নেমে পড়ল অশোক, কুনু, এমন কি ভবতোষবাবুও। সর্বনাশের ভয়ে মাঝি দুজন শুধু ঠকঠক করে কাঁপতে লাগল, নাবতে একেবারেই রাজি হল না।

কিন্তু ওদের দিকে নজর দেবার মতো সময় অশোকের মোটেই নেই! জল পেরিয়ে সুড়ঙ্গর ভাঙা সিঁড়ি, টর্চের

আলোয় পথ খুঁজতে খুঁজতে সেই সিঁড়ি ভেঙে সে ওপরের দিকে উঠে চলল।

তার পেছু পেছু কুনু।

তার পেছু পেছু ভবতোষবাবু।

অশোক সাবধানে এগুচ্ছে আর টর্চের আলো ফেলে কী যেন খুঁজছে।

তারপর হঠাৎ সে থমকে দাঁড়াল। তার হাতে টর্চের চঞ্চল আলো স্থির হয়ে গেল।

সে আলোর মুখে মুখ গুঁজড়ে পড়ে রয়েছে একটি মনুষ্য-মূর্তি! দীর্ঘ ক্ষীণ শরীর।

"প্রতাপচন্দ্র!" উত্তেজনায় চীৎকার করে উঠলেন ভবতোষবাবু।

কিন্তু বিস্ময় প্রকাশ করে নষ্ট করবার মতো সময় তখন অশোকেরও নেই, কুনুরও নেই—দুজনে ঝুঁকে পড়েছে অচৈতন্য দেহের ওপর।

ব্যাগ্র ভাবে অশোক নাড়ীটা পরীক্ষা করল, চোখের কোল টেনে টর্চ দিয়ে দেখল, তারপর স্বস্তির নিশ্বেস ফেলে বলল, "যাক দেরি হলেও খুব বেশি দেরি হয় নি। এখনো সময় আছে।" বলতে বলতে অশোক আর কুনু প্রতাপচন্দ্রের দেহটা তুলে নিল।

"ভবতোষদা, আলো দেখিয়ে ওপরের দিকে চলুন, ওপরে বড় ঘর পাওয়া যাবে।"

ভাঙাচোরা হলেও হাত-পা মেলে কাজ করবার মতো জায়গা ওপরে প্রচুর। কুমুর আর অশোকের যেন দম ফেলবার সময় নেই! ব্যাগ খুলে অশোক পাকা ডাক্তারি শুরু করল যেন। ওষুধ খাইয়ে প্রতাপচন্দ্রকে হুড়হুড় করে বমি করাল, তারপর একটা ইনজেকশন দিল, মুখে কালো কড়া কফি ঢেলে দিল। এই রকম কত কি।

টর্চ ধরে দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে ভবতোষবাবু শুধু বললেন, "ব্যাপারটা কী ?"

"কিছু নয়। সামলে যাবেন। অতিরিক্ত পরিমাণ আফিম পেটে পড়েছিল, তাই।"

প্রতাপচন্দ্র যখন চোখ খুললেন তখন ভোর হয়ে গিয়েছে, আকাশে সূর্য উঠেছে! সমুদ্রে জোয়ার নেবে গিয়ে জেগে উঠেছে পাথর—এই ভাঙা প্রাসাদের সঙ্গে জমির যোগাযোগ ফুটে উঠেছে।

"আমি কিছু বুঝতে পারছি না," ক্ষীণ গলায় বললেন প্রতাপচন্দ্র, "এ আমি কোথায় এসেছি ?"

আপনাদেরই পুরনো বাড়িতে," অশোক বলল, "কিন্তু আগে সুস্থ হয়ে উঠুন তারপর সব বোঝবার চেষ্টা করবেন।" তারপর ভবতোষবাবুর দিকে ফিরে, "ভবতোষদা, আপনি ডাক্তার আর স্ট্রেচারের বন্দোবস্ত করবেন যান। মাঝি দুজন নিশ্চয়ই ভয়ে পালিয়েছে, কিন্তু স্থলপথেই এখন যেতে পারবেন আশা করি।"

"তুমি আর কুমু তা হলে এখন এখানে থাকবে ?"

"হুঁ। চায়ের ফ্লাস্কেএ চা আছে। আপাতত তার ওপর নির্ভর করেই আমরা রইলুম।"

ভবতোষবাবু ভাঙা বাড়ির এবড়ো-খেবড়ো পথ হাৎড়ে বাইরে চলে গেলেন।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

যবনিকা পতন

বিকেলে উদয়ভিলায় প্রতাপচন্দ্রের শোবার ঘরে ক্ষীণ দুর্বল শরীরে প্রতাপচন্দ্র শুয়ে আছেন। ডাক্তার-নার্স-এ ঘর ভরতি। ঘরে ঢুকলো অশোক আর কৃষ্ণ আর ভবতোষবাবু।

"আমি কিছু বুঝতে পারছি না, অশোকবাবু", প্রতাপচন্দ্র বললেন।

"বুঝিয়ে বলছি শুনুন।" শুরু করল অশোক, "প্রথম কথা হচ্ছে, খাতাটায় ঝুটো দাগ দেখে বেশ পরিষ্কার বুঝতে পারা গেল এর পেছনে কোনো মানুষের মগজ রয়েছে। প্রেতের নয়। মানুষের মগজ যদি থাকে তা হলে একটা স্পষ্ট উদ্দেশ্য থাকা ত দরকার। উদ্দেশ্য কী হতে পারে? আপনাকে অলৌকিক ব্যাপারে শুধু বিশ্বাসী করে তোলাই নয়, অলৌকিক অভিশাপের অংশিদার করে তোলাও। কিন্তু আপনার মতো তীক্ষ্ণবুদ্ধি লোক স্বচক্ষে না দেখলে বিশ্বাস করবেন না। তাই স্বচক্ষে দেখাবার বন্দোবস্ত হল।"

"সেটা কেমন করে হল?"

"বলছি শুনুন। আপনার ড্রেসিং টেবিলের ডানদিককার আয়নাটার কাঁচটা বাঁকা, যেমন অনেক দাড়ি কামাবার আয়নার থাকে, অর্থাৎ তাতে প্রতিবিম্ব পড়ে উল্টো ভাবে এবং ড্রেসিং

রুমের ঠিক দোরের ওপর যে আলো সেটা এমন ভাবে বসানো যে সুইচের সামনে দাঁড়িয়ে আলো জ্বালালে শুধু মুখটার ওপরই আলো পড়ে। সেই মুখের প্রতিবিম্ব আয়নায় উলটো ভাবে দেখে আপনি সূর্যপূজারীর মুখ বলে মনে করেছিলেন।"

"কিন্তু তা হলে প্রথম দিন থেকেই ত দেখতে পেতুম। শুধু অমাবস্যার রাত কেন?"

"কারণ, আপনি বেশ লম্বা আছেন এবং ড্রেসিং টেবিলটা বেঁটে। তাই অমাবস্যার সন্ধ্যাবেলায় ড্রেসিং টেবিলটাকে জলচৌকির ওপর বসানো হত। আপনি লক্ষ্য করেন নি। কিন্তু আমি জলচৌকিটাকে মেপে দেখেছি, ঠিক আপনার মাথার মাপ হিসেব করে সেটা তৈরি। ঘরের মেঝেতেও ধুলোর দাগ ম্যাগনিফাইং গ্লাস দিয়ে পরীক্ষা করে বোঝা যায় জলচৌকিটা বরাবর ড্রেসিং টেবিল ঘাড়ে করে দাঁড়ায় না। মাসে একদিন করে দাঁড়ায় মাত্র।"

"কিন্তু সেই নীলচে আলো-ভরা বাদুড়?"

"সেটা সম্ভবত সত্যিই বাদুড়, তবে ফসফরাসে চুবিয়ে নেওয়া বোধ হয়। নিশ্চয়ই আপনার অনুপস্থিতিতে ঘরে বেচারাকে বন্দী করা হত, দোর খোলার সঙ্গে সঙ্গে উড়ে বেরিয়ে যেত।"

"কিন্তু কে? কে এমন চক্রান্ত করেছিল?"—ভবতোষবাবু অসহিষ্ণু ভাবে বলে উঠলেন।

"বলছি। সে যাই হোক, তার বুদ্ধির তারিফ না করে পারি নে। কী নিখুঁত ভাবে সব প্ল্যান করেছে বলুন? প্রথমত প্রতাপচন্দ্রকে স্বচক্ষে প্রেত প্রদর্শন করানো, তারপর বংশ ইতিহাসের সঙ্গে এই প্রেতকে জড়িয়ে ফেলে তাঁর মাথায় ঢোকানো যে অতীত অভিশাপের দেনা শোধ না করে উপায় নেই। খাতায় আফিম ধরার কথাটাও কতখানি হিসেব করে লেখা—লেখক জানতেন এত দিক থেকে প্রতাপচন্দ্রের মনকে বেঁধে ফেলা হচ্ছে যে তার পক্ষেও এই আফিম না ধরে উপায় নেই। এবং শেষ পর্যন্ত একদিন স্বপ্নচালিতের মতো সেই সুড়ঙ্গে ঢুকে আফিম খেয়ে আত্মহত্যা প্রতাপচন্দ্রকে করতেই হবে—কেননা দিনের পর দিন তাঁর মন এমন দুর্বল হয়ে পড়বে যে তখন খাতার হিসেব থেকে এক পা এদিক ওদিক হওয়া আর সম্ভব নয়। আমি কাল প্রতাপচন্দ্রের কথাবার্তা থেকে বুঝেছিলুম সেই সাংঘাতিক রাত উপস্থিত হয়েছে, পাছে জোয়ারের জন্যে পুরনো বাড়িতে ঢোকা সম্ভব না হয় তাই নৌকোর বন্দোবস্তও করেছিলুম।"

"সব ত বুঝলুম, কিন্তু আসামীটা কে বলছ না কেন?" অত্যন্ত অধীরভাবে বলে উঠলেন ভবতোষবাবু।

"তাও বলে দিতে হবে? সবই ত বললুম। আপনারা বুঝে নিন।"

"কী আশ্চর্য! নামটা না বললে বুঝব কেমন করে?"

"কেন? প্রতাপচন্দ্র আত্মহত্যা করলে বা অদ্ভুত পাগল হয়ে গেলে কার লাভ? কে সম্পত্তি পাবে?"

"সম্পত্তি পাবার যে লোক সে যে সম্পত্তি চায় না। কেননা প্রতাপচন্দ্রের একমাত্র আত্মীয় বীরবিক্রম, এবং সম্পত্তি পাবার চেয়ে সম্পত্তির হাত থেকে নিষ্কৃতি পেতে সে অনেক বেশি পাগল।"

"কিন্তু সেই-ই!" অশোক বলল।

অশোকের কথা যেন ঘরে বজ্রপাত করল।

"অসম্ভব!" একসঙ্গে প্রতাপচন্দ্রের ও ভবতোষবাবুর উত্তেজিত চীৎকার।

অশোক শুধু মৃদু হাসতে লাগলো। —"সম্পত্তির যখন আর কোন ওয়ারিশ নেই, তখন এ চক্রান্তের পেছনে আর কারুর কোন উদ্দেশ্য থাকতে পারে না। সময় পেলে বীরবিক্রমবাবুকে আমি নিশ্চয়ই বন্দী করতে পারতুম। অনেকবার তাঁর মুখো-মুখি হয়েছিলুম। কিন্তু নেহাত সময় ছিল না হাতে, তাই এবাড়িতেই দরোয়ান সেজে তিনি থাকতেন—তাই আমি আপনার শোবার ঘর পরীক্ষা করবার সময় দরোয়ানজী অমন শঙ্কিত হয়ে পড়েছিলেন, তাই আপনি নিরুদ্দেশ হবার পর পাছে আপনাকে জীবিত অবস্থায় খুঁজে পাই এই ভয়ে দরোয়ানজী আমাদের এ বাড়িতে টেনে আনতে চেয়েছিলেন এবং শেষ পর্যন্ত আমার চাল বুঝেতে পেরে দ্বিতীয় নৌকো ভাসিয়ে

আমাদের পেছু নেন—ভবতোষদার চুরোটের আগুন অনুসরণ করে পেছু নেন—এমন কি গুলি চালান!”

এ একেবারে আজগুবি কথা। অশোক যত ধুরন্ধর বুদ্ধিমানই হোক না কেন, তাই বলে যা খুশি বলবে? অথচ এইমাত্র অমন বিপদ থেকে উদ্ধার করেছে; কিছু বলাও যায় না।

কিন্তু বলতে আর হল না কাউকে। বাড়ির ভৃত্য একটা চিঠি নিয়ে উপস্থিত, দেউড়ির দরোয়ান নাকি খানিক আগে বাড়ি ছেড়ে যাবার সময় চিঠিটা ভৃত্যের হাতে দিয়ে গিয়েছে বাবুকে দেবার জন্যে।

প্রতাপচন্দ্র চিঠিটা পড়ে চললেন।

“প্রতাপ, আমি চল্লুম দেশ ছেড়ে, আমার জাহাজ ছাড়বে আধ ঘণ্টা পরে। ফলে আমায় ধরতে পারবে না। চলে যাচ্ছি, কেননা আমার সমস্ত প্ল্যান ভেস্তে গেল। দেখলুম বাঙালী গোয়েন্দা আমার চেয়ে চালাক। তবু তাঁকে ধন্যবাদ জানাই, কেননা সম্পত্তির লোভে ভাইকে খুন করবার যে চক্রান্ত করে-ছিলুম সত্যিই তাতে মনে মনে একটা দারুণ বিবেক-দংশনও ভোগ করছিলুম। অশোকবাবু আমায় অন্তত তার হাত থেকে বাঁচিয়েছেন, সেজন্যে কৃতজ্ঞ। আমায় আর বিশ্বাস করা সম্ভব নয়, তবু একটা কথা বিশ্বাস করতে অনুরোধ করি: প্রথম দিকে সত্যিই আমার এ অভিসন্ধি ছিল না। তোমার ওই বিরাট

সম্পত্তির স্বাদ না পেলে সম্পত্তির লোভই আমার হয়ত হত না। দিব্বি ছিলুম লক্ষ্ণৌতে খেলাধূলো নিয়ে।

"যাক ওসব কথা! তোমার কাছে ক্ষমা চেয়ে লাভ নেই; কেননা, জানি তোমার কাছ থেকে ক্ষমা পাবার যোগ্য নই। তবে, বিদেশ যাবার পথখরচার জন্যে যে সামান্য টাকা তোমার বাড়ি থেকে নিয়ে যাচ্ছি সেটুকু আমার রোজগারের টাকাই: এতদিন ধরে তোমার দেউড়িতে দরোয়ান সেজে পাহারা দিয়েছি, তারই জমানো মাইনে।

ক্ষমা তুমি করতে পারবে না, তবু আবার ক্ষমা চাইছি।

তোমার—বীরবিক্রম।"

চিঠির শেষটুকু পড়তে পড়তে প্রতাপচন্দ্রের গলা ভিজে এল।

ফস করে প্রশ্ন করল অশোক, "আচ্ছা, ঠিকানাটা দিয়ে যান নি, না?"

"ফেরারী আসামী কি ঠিকানা রেখে যায়?"—ভবতোষবাবু একটু বিদ্রূপ মাখিয়েই প্রশ্নটা করিলেন।

"নাঃ, ঠিকানাটা দিয়ে গেলে একটা ভালো উপদেশ লিখে পাঠাতে পারতুম: ভূতের গল্প ফাঁদতে তিনি যখন অমন ওস্তাদ তখন বিদেশ গিয়ে উনি যদি শুধু ভূতুড়ে গল্প লেখেন তা হলে, বলা যায় না, প্রতাপচন্দ্রের এখানে যা টাকা আছে সেটুকু হয়ত তিনি অনায়াসেই অল্পদিনে উপার্জন করতে পারবেন। ওদের দেশে শুনেছি লিখে বেশ দু পয়সা রোজগার করা যায়!"

এখানে মৃত্যুর হাওয়া

প্রবোধ ঘোষ

শিপ্রা বিশ্ববিদ্যালয়ের নাম-করা ছাত্রী, রবিশঙ্কর বিশ্ববিদ্যালয়ের নাম-করা ছাত্র ও খেলোয়াড় এবং বিভূতি ডাক্তার ও ডিটেকটিভ এদের তিনজনের নামের প্রথম অক্ষর নিয়ে 'শিবির' ক্লাবের গোড়া পত্তন। এই ক্লাবের উদ্দেশ্য হোলো গোয়েন্দাগিরি করা, রহস্য ও রোমাঞ্চের সন্ধানে ঘোরা। 'এখানে মৃত্যুর হাওয়া' তাদের প্রথম অভিযানের কাহিনী। একদিকে এই তিনজন ধুরন্ধর—অন্যদিকে কাফু, হাসেম, যোসেফ, ওয়াং-ফু। পটভূমিকা সুন্দরবন অঞ্চলের এক বিরাট পুরনো বাগানবাড়ি। রহস্যের পর রহস্য পাতায়-পাতায় ঘনিয়ে উঠেছে। প্রতিপদেই মৃত্যুর হাওয়া যেন গায়ে এসে লাগছে। এতো ভালো রোমাঞ্চকর উপন্যাস এবছর আর একটিও বেরিয়েছে কিনা সন্দেহ।

দ্বিতীয় বই

শ্বেত-চক্র

কামাক্ষীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়

১৩৫২ সালে 'রংমশাল' মাসিক পত্রে এই উপন্যাসটি প্রথম প্রকাশিত হয়। প্রকাশিত হবার সঙ্গে-সঙ্গেই এই উপন্যাস ছেলেবুড়োর মন ভুলিয়েছে। তার প্রধান প্রমাণ রাশিরাশি প্রশংসা-পত্র। 'কালপুরুষ সিরিজে'র অন্তর্গত করার সময় এই উপন্যাসটি অনেক বড় করে ঢেলে সাজানো হয়েছে। ফলে রংমশালের পাতায় প্রথম এই উপন্যাস যারা পড়েছো তারাও আবার একটি নতুন উপন্যাস পড়বার আনন্দ পাবে। এই বই-এর প্রধান চরিত্র সঞ্জীব আর ধনঞ্জয় কবিরাজ আর এক অদৃশ্য শত্রু যে হত্যা করার আগে একটি করে শ্বেত চক্র পাঠায়। পাতার পর পাতায় এই রহস্য ক্রমাগত ঘনিয়ে এসেছে। যতক্ষণ না শেষ লাইনটি পড়বে ততক্ষণ স্বস্তিরে নিশ্বেস ফেলতে পারবে না।

যারা 'রংমশাল' পত্রিকার গ্রাহক তারা এই সিরিজের বই বিনা ডাক-ব্যয়ে পাবে। গ্রাহক হবার নিয়মাবলীর জন্যে আজকেই এই ঠিকানায়

ঘনশ্যামের ঘোড়া

কামাক্ষীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়

বোপদেব আর ইহ জগতে নেই—এই ছোট্ট খবরের জন্যে কেন চেয়ার উল্টলো, টেবিল ভাঙলো, খবরের কাগজ টুকরো-টুকরো হোলো যদি জানতে চাও আজই তাহলে 'ঘনশ্যামের ঘোড়া' পড়। এ ছাড়াও আছে আরো পাঁচটি মজার গল্প। আছে বিখ্যাত পি সি. এল এর আঁকা ছবি. আছে নানা রঙের চমক-লাগানো প্রচ্ছদপট। দাম ১৷৷০, 'রংমশালের' গ্রাহকরা পাবে ১।০ আনায়। ডাকমাশুল ৫ আনা।

ছাতুবাবুর ছাতা

কামাক্ষীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়

কে ছাতুবাবু? কী রকম তাঁর হিসেব? তাঁকে তোমরা চেনো? এই সব মজাদার খবর জানতে হলে আজই এক কপি 'ছাতুবাবুর ছাতা' কিনে পড়। আটটি মজার মজার গল্প এতে আছে। অনেক মজার ছবি। সুন্দর নানা রঙের প্রচ্ছদপট। দাম ১।০, 'রংমশালের গ্রাহকরা পাবে ১, টাকায়। ডাকমাশুল ৫ আনা।

প্রাপ্তিস্থান

রংমশাল অফিস

কিংবা যে-কোনো বিখ্যাত বই-এর দোকান

এখানে মৃত্যুর হাওয়া

প্রবোধ ঘোষ

সংকেত ভবন
৩ নং শম্ভুনাথ পণ্ডিত স্ট্রীট
কলকাতা

'সাহিত্যিকা'র পক্ষে ১২৩, আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট, কলকাতা
থেকে সাধন চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক প্রকাশিত

দাম দু টাকা

প্র থ ম সং স্ক র ণ
ভাদ্র : ১৩৫৩

৩, শম্ভুনাথ পণ্ডিত ষ্ট্রীট, কলকাতার 'রংমশাল প্রেস

আমার প্রমাতামহী

স্বর্গীয়া মহিলা কবি গিরীন্দ্রমোহিনীর

স্মৃতির উদ্দেশে

এই সিরিজের অন্য বই

কামাক্ষীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়

শ্বে ত চ ক্র

প্র সা দ উ পা ধ্যা য়

প্রেতের আহ্বান

কা ল পু রু ষ

বাস্তববাদ আমাদের কল্পনাকে এতোই পঙ্গু করেছে যে ইস্কুল কলেজ আপিস দোকান কাছারি বস্তি ফ্যাক্টরি আর পাড়াগাঁর বাইরে আমাদের দৃষ্টি চলে না। কিন্তু বহির্জগতের জীবন-অভিযান রোমাঞ্চে ভরপুর। মানুষের পৃথিবীতে এক অদৃশ্য শক্তি আছে, কখন যে তার আঘাত নামে, কখন যে কালপুরুষের অভিশাপ আসে তা আমাদের বুদ্ধির অগোচর। অসাধারণ মুহূর্তে তখন ঘটে নিষ্ঠুর মৃত্যু, নির্মম অপরাধ। সেই কালপুরুষের অভিশাপই এই সিরিজের বইগুলির বিষয়বস্তু।

বর্তমান য়ুরোপে অপরাধ রহস্য ও রোমাঞ্চ অপূর্ব সাহিত্যে পরিণত হয়েছে। বিজ্ঞানের অগ্রগতির সঙ্গে এসেছে বিস্ময়কর কৌশল। শেক্সপীয়র থেকে আরম্ভ করে চেস্টারটন্ পর্যন্ত অনেক নামকরা ইংরেজী সাহিত্যিকই কালপুরুষের ছায়ায় তাঁদের শ্রেষ্ঠ রচনা সৃষ্টি করেছেন: রাশিয়ায় ডস্টয়েভ্স্কি, আমেরিকায় অ্যালান্ পো। বাংলায় খাঁটি রোমাঞ্চ-সাহিত্য গড়ে তোলাই হচ্ছে

শিলা সেন বিলেত থেকে ফিরেছে শুনে রবিশঙ্কর ও আমি চললাম তার সঙ্গে দেখা করতে। শিলার মা তার অল্প বয়সেই মারা গেছেন, বাবাও গত হয়েছেন প্রায় এক বছর—ক্যামাক্ ষ্ট্রীটে একখানি বাড়ী ও ব্যাঙ্কে প্রচুর টাকা রেখে। যোগানন্দ সেন এম্-এ (অক্‌সন্), বার্-অ্যাট্-ল উগ্র সাহেব ছিলেন। মেয়েকে লোরেটোতে পড়িয়ে খাঁটি মেমসাহেব বানাবেন ইচ্ছা ছিল, কিন্তু মেয়ে বাঙালীই রইল, উপরন্তু তার আবার কম্যুনিষ্ট্ হবার উপক্রম দেখা গেল। যোগানন্দ চিন্তিত হয়ে পড়লেন।

এর মধ্যে শিলা ইংরাজী সাহিত্যে এম্-এ পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণীতে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করল অনেক নোট্-মুখস্থ্-করা মোটা-কেতাব-পড়া ভালো ছেলেদের বিরাগভাজন হয়ে। প্রথম হল রবিশঙ্কর চৌধুরী: খাড়া ছ ফিট্ লম্বা, টেনিস্ ও ক্রিকেটে নাম-করা খেলোয়াড়। নাকটা তার ঠিক খাঁড়ার মতো নয়, বাঁশীর মতোও নয়, অর্থাৎ (আর্টিষ্ট মণি-বঙ্কু রায়ের মতে) একেবারেই গ্রীক্! দু হাত দিয়ে কেম্‌ব্রিজ্ হিষ্ট্রি অব্ লিট্‌রেচারের মোটা মোটা ভল্যুম্‌গুলো টেবিল থেকে ঠেলে ফেলে দিয়ে চশমার পুরু কাঁচের পেছন থেকে পিট্ পিট্ করে তাকিয়ে 'ভালো' ছেলে নরোত্তম সরকার বলল: "ওরা দুজন পেল ফার্ষ্ট ক্লাশ! লেখা-পড়া করার তাহলে আর কোনো মানেই হয় না।" নরোত্তম দ্বিতীয় শ্রেণীতে তৃতীয় স্থান অধিকার করেছে।

এর পরেই যোগানন্দ মারা গেলেন। শেষ কথা: "মাম্‌মি, এক বার বিলেত ঘুরে এসো।" বাবার শেষ ইচ্ছা রাখবার জন্য অত্যন্ত [illegible]লা গেল বিলেতে। বোম্বে থেকে আমরা তাকে বিদায়

দিলাম। বাড়ী আগলাবার জন্য রইলেন শিলার বিধবা পিসিমা দয়াময়ী দয়াময়ী তাঁর শ্বশুববাড়ীর সম্পর্কে আমার মামিমার কে যেন হন, আবা রবিশঙ্করের মায়েব তিনি বাল্যসখী। ফলে শিলার সঙ্গে সম্পর্ক আমা দের খুবই নিকট। আসলে আমরা বন্ধু

শিলার মতো বুদ্ধিতে ঝল্‌মল্‌ মেয়ে সহজে চোখে পড়ে না। মনটা ভারি ভালো। রংটা ঠিক ফর্সা বলা যায়না, অন্তত রবিশঙ্করেব মতে নয়। মানে, যে বং বয়স্থা মেয়েদের মায়েরা ঘসে মেজে উজ্জ্বল গৌব বর্ণ বলে ঘোষণা করেন। ছিপছিপে লম্বা গড়ন, মাথায় এক বাশ চু বড় বড় চোখছুটি হাসিতে টল্‌মল্‌। শিলার মতো সাহসী মেয়েও খু কম। যোগানন্দ তাকে ঘোড়ায় চড়া, রিভল্‌ভার্‌ চালানো ইত্যা শিখিয়েছিলেন। যাই হোক্‌, ছ মাস পরেই শিলা বিলেত থে পালিয়ে এল। সেখানে নাকি দিনে বাতে সব সময়েই বৃষ্টি : শিলা মাসে চারটে ছাতা হারিয়েছে।

শিলাদের বাড়ীতে আমবা যখন গেলাম তখন প্রায় সন্ধ্যা। ভজু এসে খবর দিল দিদিমণি আসছেন। প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই ঝড়েব বে শিলার প্রবেশ! "তোমাদের খুব আক্কেল যা হোক্‌! আমি মনে করে ছিলাম তোমরা নিশ্চয়ই বোম্বে যাবে আমাকে আনতে। গেলে না কেন?" শিলা জিগেস কবল

মুখ থেকে সিগারেটটি নামিয়ে রুমাল দিয়ে নাকের ডগাটি (গ্রী নাক!) রগড়ে রবিশঙ্কর বলল : "আমাদের কায ছিল।"

শিলা হেসে উঠল : "তোমাদের আবার কায! কী কায ছিল?"

আমি বললাম : "যাক ওসব কথা। এখন বলো খবর কী বিলেত দেশটা কেমন?"

রবিশঙ্কর শিলার মুখ থেকে কথা কেড়ে নিয়ে বলে উঠল: "মাটির!"

"সবই তো চিঠিতে তোমাদের কাছে লিখেছি। আর ওসব কথা কন বাপু?

"হাঁ, আমাদের সঙ্গে পড়ত মণিকা—মণিকা পুন্তম্বেকর্, সেই যে চুলগুলো কটা-কটা—সেই মণিকা গেছে ওখানে পড়তে। কেম্‌ব্রিজে পড়ছে।"

এই ভাবে গল্প চলল, গল্পের সঙ্গে চা।

ববিশঙ্কব হঠাৎ খুব চিন্তাব ভাণ কবে বলল: "কিন্তু এখন আমাদের কর্তব্য কী? বিভূতি, তুমি তো সবে ডাক্তারি পাশ করেছ, গলায় চোঙা ঝুলিয়ে বিনা ফীতে বোগী দেখে বেড়াবে। কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ের রত্নদুটির কী হবে?" শিলাও বেশ চিন্তাব ভাব দেখাল।

আমি বললাম: "কেন? তোমাদের দুজনেরই তো প্রোফেসরি বাঁধা। পয়সার ভাবনা যখন তোমাদেব নেই তখন এব মতো সুখের চাকরি আর কী আছে।"

শিলা প্রায় কেঁদেই ফেলল। "তুমি বল কী, বিভূতি! আমি তো একেবারেই পড়াতে পারব না। আজকাল মেয়েরা বেশ চালাক হয়েছে, ক্লাসে গণ্ডগোল করে। আমাকে মানবে কেন? আর তাছাড়া ত আজে-বাজে বই পড়াতে দেবে, হয়ত বাইবেল পড়াতে হবে! হে প্রভু, আমাকে প্রোফেসরি থেকে রক্ষা করো।"

রবিশঙ্কর জোড় হাতে বলল: "আমাকেও। হাঁ, পড়াবে নরোত্তম সরকার। নেচে-কুঁদে, হাত-পা ছুঁড়ে, মোটা রসিকতা করে, বাঙালি ইংরেজী বলে, নোট্-বই লিখে ওই হবে নাম-করা প্রোফেসর্।"

আমি বললাম : "তাহলে তোমাদের পরীক্ষায় ভালো করা উচিত হয়নি।"

"সত্যিই উচিত হয়নি," শিলা বলল, "কিন্তু হাত ছিল না, কী বলো, শঙ্কর ? আমার উচিত হতো ডাক্তারি পড়া।"

"আমার ইঞ্জিনীয়ারিং", বলল রবিশঙ্কব ।

"যাক্, যা হবার তা হয়ে গেছে। এখন কী করবে ? একটা কিছু করা তো দবকার !"

একটু ভাবল শিলা। খোঁপা থেকে একটা কাঁটা খুলে নিয়ে নির্দয়ভাবে মাথা চুলকে রায় দিল : "তোমাদের বলিনি এতক্ষণ। আমি কিন্তু ঠিক করে ফেলেছি।"

রবিশঙ্কর বলল : "ফেলেছ ? কী ঠিক করে ফেললে ?"

শিলা একটু এদিক-ওদিক তাকিয়ে নিচু গলায় বলল : ডিটেক্‌টিভ হব।" •

আমি ঘাবড়ে গেলাম। শিলা বলে কী ! শেষে কি ডিটেক্‌টিভ হতে গিয়ে সকলে মিলে জেলে যাব ! না, যোগানন্দ সেন মারা গেছেন বটে, কিন্তু মেয়েটির মাথা বিগড়ে তবে গেছেন। আমাদের চুপ কবে থাকতে দেখে শিলা বলল : "কী ! কথা নেই যে ! ভয় পেয়ে গেলি নাকি ?"

আমিই উত্তর দিলাম : "না, ভয়ের কথা হচ্ছে না। তবে আজ পর্যন্ত কোনো মেয়ে ডিটেক্‌টিভের কথা কখনো গল্পেও পড়িনি।"

রবিশঙ্কর গম্ভীরভাবে সিগারেট টানতে লাগল।

শিলা বলল : "শোনোনি ? তাহলে এখন শোনো। ষ্টুয়ার্ট্ পামারের ডিটেক্‌টিভ্ গল্প পড়েছ ?"

রবিশঙ্কর চেঁচিয়ে উঠল : "শিলা ঠিক বলেছে। হিল্‌ডগার্ড্‌ উইথার্স্‌—মাষ্টারণী ডিটেক্‌টিভ্‌ তো?"

শিলা গম্ভীর ভাবে বলল : "মাষ্টারণী নয়, বলতে হয় শিক্ষয়িত্রী।"

রবিশঙ্কর ধমক খেয়ে স্বীকার করল : "আচ্ছা, বাবা, তাই হোলো—শিক্ষয়িত্রী।"

মোটা মোটা ডাক্তারি বই ঘেঁটে ডিটেক্‌টিভ গল্প পড়ার সময় বেশী পাইনি। বললাম : "তা যেন হোলো। কিন্তু কাযটায় বিপদ আছে। মেয়েদের পক্ষে......তাছাড়া পরিশ্রমও..... এটা কী রকম... ..."

হাসি মুখে শিলা বলল : "রকম ঠিকই আছে, বিভূতি। একটুতেই ঘাবড়ে যাওয়া তোমার স্বভাব—ডাক্তারি করবে কী করে? শোনো। শোনো আমরা তিনজনে মিলে একটা ডিটেক্‌টিভ্‌ ক্লাব্‌ খুলি। শঙ্কর গুণ্ডাগোছের লোক......," রবিশঙ্করের আপত্তিতে বাধা দিয়ে শিলা বলে চলল, "অবশ্য ভদ্রলোকেরই মতো চেহারা। ওকে আমাদের দরকার হবে। ডিটেক্‌টিভ ব্যাপারে একজন ডাক্তারের বিশেষ প্রয়োজন—বিভূতি, তুমি আছো। আমি দেব বুদ্ধি। ভজুয়াও আছে, যদি দরকার হয়। আমি অফিস্‌ সংক্রান্ত কাযের ভার নিচ্ছি। কায একবার আরম্ভ করে দাও, দেখবে কী রকম ভালো লাগে। অ্যামেচার থিয়েটারও করেছো—গোঁফ-দাড়ি সহজেই লাগিয়ে নিয়ে ছদ্মবেশ ধরবে দরকার হলে। তারপর দেখবে আমাদের সাহায্য করতে ছুটে আসবে স্কুল কলেজের ছেলে মেয়েরা, কেরাণী, কবি, মুদী, মাষ্টার, মুন্সেফ, ময়রা, ব্যবসাদার, প্রোফেসর, ফিলম-অ্যাক্টর......"

শিলার তালিকায় বাধা দিলাম : "বলো কী!"

শিলা বলল : "ঠিকই বলছি। এরা যে সকলেই ডিটেক্‌টিভ্‌ গল্প

পড়ে—কেউ খোলাখুলি ভাবে, কেউ বা লুকিয়ে। এই তো সেদিন দেখলাম পিসিমা চোখে চশমা এঁটে লুকিয়ে…”

রবিশঙ্কর চেঁচিয়ে উঠল : “পিসিমা! লুকিয়ে? আমরাই তো ছেলেবেলায়…”

শিলা বলল : “এখন বুড়োরা লুকিয়ে পড়ে পাছে ছেলেরা হাসে।”

আমি বললাম : “কিন্তু একটা কথা আছে। ধরো, আমরা ডিটেক্‌টিভ হলাম। “অনেক সময় নানা কারণে পুলিশের সাহায্য দরকার করবে। সে রকম কোনো লোক…”

“আমার মামার বন্ধু ডিটেক্‌টিভ্ ইন্‌স্পেক্‌টর্ অমর লাহিড়ি,” রবিশঙ্কর উৎসাহের সঙ্গে বলল। “সে ঠিক হয়ে যাবে। অমরবাবুর সঙ্গে আমার খুব খাতির আছে।”

“আর একটা কথা : আমাদের অফিস্ হবে কোথায়? আমাদের কারো বাড়ীতে না হওয়াই ভালো। অবশ্য শিলার বাড়ীতে আমাদের গুপ্ত মন্ত্রণা চলতে পারে।”

রবিশঙ্কর সে ব্যবস্থাও ঠিক করে ফেলল। স্টারকিন্ স্ট্রীটে ওদের একটা বাড়ী ভাড়া দেওয়া আছে। তার তেতলার রাস্তার দিকে দুখানা ঘর নিয়ে ছিল এক চীনা পরিবার। দিন পনেরো আগে তারা উঠে গেছে ছাতাওয়ালা গলিতে তাদের এক আত্মীয়ের কাছে। ঘরদুটোর সঙ্গে লাগানো বাথরুম ও গ্যাসের উনুন আছে, টেলিফোনেরও ব্যবস্থা হতে পারে। ঠিক হল দরকারি কাগজপত্র শিলার কাছেই থাকবে বাড়ীতে : বিশেষ প্রয়োজন না হলে সে অফিসে আসবে না, বাড়ীতেই কায করবে। অন্তত একজন ডিটেক্‌টিভ্ লোকচক্ষুর খানিকটা অন্তরালে কায করবে।

রবিশঙ্কর জিগেস করল : "বেশ, আমাদের ক্লাব বা অফিসের নাম কী হবে ?"

শিলা হাসি মুখে উত্তর দিল : "শিবির।"

বললাম : "কেন ?"

শিলা হেসে উঠল : "বুঝলেনা ? তিনজনের নামের প্রথম অংশ নাও।"

এই আলোচনার দুদিন পরে সকাল বেলায় দুটি স্যুট্-পরা ভদ্রলোক সুটারকিন্ স্ট্রীটের এক চারতলা বাড়ীর গেট পার হয়ে গম্ভীর মুখে বাঁ দিকের সিঁড়ি দিয়ে দোতলায় উঠে গেলেন। আর প্রায় ঠিক সেই সময়েই ক্যামাক্ স্ট্রীটের এক বাড়ীতে বস্‌বার ঘরে একটি মেয়ে ক্যালেণ্ডারে সেদিনের তারিখের ওপর ছোট অক্ষরে লাল কালিতে লিখল 'শিবির।'

কাল রাত্রে ভীষণ ঝড় বৃষ্টি হয়ে গেছে। ষ্টীমার এসে পৌছবার থা ভোর পাঁচটায়, এল সাতটায়। নদীর ধারে একটি লোকও নেই। নেক কষ্টে জলকাদার মধ্যে সুট্-কেস্ নিয়ে আমরা দুজন তীরে উঠলাম। নিকটা দূরে একটা টিনের শেড দেখে রবিশঙ্কর সেদিকে পা বাড়াল। শেডের তলায় বেঞ্চিগুলো জলে ভেজা; খানিকটা জায়গা চট দিয়ে ঘেরা। একটু কেশে রবিশঙ্কর পর্দায় নাড়া দিল।

ভেতর থেকে কে যেন ফোঁস করে উঠল। "কে? কে? কী চান? খানে কেন?" বিড়ি মুখে এক তোবড়া-গাল ব্যক্তি বেরিয়ে এলেন—রোগা, কালো, লম্বা চেহারা। জ্বলন্ত দেশলায়ের কাঠিটা নিয়ে বিড়ির গায় আরতি করবার মতো ভঙ্গী করেই ভদ্রলোক খিঁচিয়ে উঠলেন: কাকে চান, মশায়? দিনে-রাতে একটু ঘুমোবার সময় পাইনা! ঝড়-বৃষ্টির মধ্যে সারারাত এখানে আটকে বসে আছি। আপনারা এই স্টীমারেই এলেন নাকি? তা এখানে কেন?"

রবিশঙ্কর বলল: "আপনিই এখানকার..."

ভদ্রলোক ক্ষেপে গেলেন: "হ্যাঁ, আমিই এখানকার সব! এতোটুকু সময় নেই আমার—দেখছেন না?"

রবিশঙ্কর চারপাশ দেখে বলল: "তা তো দেখছি। কিন্তু কুলি..."

"না, আমি কুলির কায করি না," বাধা দিয়ে ভদ্রলোক গর্বিত ভাবে বললেন।

এগিয়ে এসে বললাম: "যাক ওসব কথা। ইন্‌স্পেক্টর্ নামের লাহিড়ি এখানে কোথায় এসে উঠেছেন জানেন? তাঁর সঙ্গে

আমাদের বিশেষ দরকারি কথা আছে।" সুন্দরবন-অঞ্চলের এদিকে চোরাই মদ, আফিম, কোকেন ইত্যাদির ব্যবসা খুব জোর চলে। লাহিড়ি একটা লুকোনো ঘাঁটির খবর পেয়ে কলকাতা থেকে এখানেই তদন্ত করতে এসেছেন। আমরাও এই সম্বন্ধে কিছু খবর পেয়ে লাহিড়িকে জানাতে এসেছি, ওঁর সঙ্গে কিছু কায করবারও ইচ্ছা আছে। অমরবাবু আগেই জানিয়েছিলেন যে ষ্টীমারঘাটের ক্লার্কের কাছে তাঁর খবর পাবো।

লাহিড়ির নাম শুনেই ভদ্রলোক ঠাণ্ডা হয়ে বললেন: "সে কথা এতক্ষণ জানাননি কেন? ডান দিকের রাস্তা দিয়ে একটা ছোট জঙ্গল পার হয়েই দেখবেন একটা পুকুর, তার ধারেই বাংলো। যদি কিছু দরকার হয় আমাকে জানাবেন—আমার নাম ভবতারণ মুখুয্যে।"

ভদ্রলোককে নমস্কার জানিয়ে রাস্তায় নেমেছি এমন সময় একজন লোক সুট্-কেস্ হাতে হঠাৎ হুড়মুড় করে আমার গায়ের ওপর পড়েই ছুটতে ছুটতে ষ্টীমারে গিয়ে উঠল। ষ্টীমার ছাড়তে তখন আর দু-তিন মিনিট দেরি। আমরা লোকটির দিকে একবার তাকিয়ে চললাম বাংলোর সন্ধানে।

বাংলোয় এসে শুনলাম লাহিড়ি বেরিয়ে গেছেন সব ক'টি চৌকিদার নিয়ে, আছে শুধু তাঁর বেয়ারা। বাংলোটাই থানা। আমরা বড় নিরাশ হলাম। ষ্টীমার ঠিক সময়ে এলে নিশ্চয়ই ওঁর সঙ্গে বেরোতে পারতাম। যাই হোক, বেয়ারা আমাদের চা করে খাওয়াল। দুজনে সিগারেট ধরিয়ে বারান্দায় বেতের মোড়া নিয়ে বসলাম। আকাশ অন্ধকার, চারদিকে জলকাদা আর বনজঙ্গল। জোরে হাওয়া বইতে লাগল।

বাংলোর সামনের রাস্তায় এসে মিলেছে বনের ভেতর দিয়ে একটা পায়ে চলার পথ। হঠাৎ এই পথ দিয়ে একটি স্ত্রীলোক পাগলের মতো ছুটতে ছুটতে বাংলোর দিকে এগিয়ে এল। "সাহেব, খুন! খুন!" উত্তেজনায় ও ভয়ে তার গলা এমন বিকৃত হয়ে গেছে যে তার আর কোনো কথাই আমরা বুঝতে পারলাম না। লাহিড়ির বেয়ারা স্ত্রীলোকটির কাছ থেকে জানতে পারল যে তার নাম মুনিয়া। তাকে তার স্বামী লেহাই পাঠিয়েছে থানায় খবর দিতে। রাজবাড়ীতে খুন হয়েছে।

আমরা দুজনে খুব উৎসাহিত হয়ে উঠলাম। বেয়ারাকে বাংলোয় রেখে আমরা বেরিয়ে পড়লাম মুনিয়ার সঙ্গে। যাক, একটা সুযোগ এসেছে তদন্তের। ঘন বনের মধ্যে সরু পথ, পাশাপাশি চলা যায় না। দুদিকের গাছের সরু ডাল মাঝে মাঝে চাবুকের মতো সপাৎ করে গায়ে পড়ছে, মুখে কারো কথা নেই। দু-একবার মুনিয়ার সঙ্গে কথা বলবার চেষ্টা করেছিলাম, কিন্তু তার উত্তর বোঝা গেল না।

অনেকটা পথ এইভাবে হেঁটে রাজবাড়ীর সীমানায় এসে পড়লাম। খুব উঁচু প্রাচীর, জায়গায় জায়গায় ভেঙে পড়েছে। অনেক দিনের পুরোনো বাড়ী—তবে এককালে যে একটা বিশাল দুর্গের মতো প্রাসাদ ছিল তা এখনো বোঝা যায়। সামনের মাঠে প্রায় এক হাঁটু জল জমে আছে। মুনিয়া আমাদের নিয়ে এল পূব দিকের দরজায়। এখানে একটা বুড়ো হিন্দুস্থানী চাকর ভাঙা বাংলায় আমাদের জানাল যে সর্বনাশ হয়েছে, রাণী কালীশ্বরী খুন হয়েছেন।

অন্ধকার খিলানের তলা দিয়ে, মোটা মোটা থামের পাশ দিয়ে

খানিকটা পথ যাবার পর চোখে পড়ল প্রকাণ্ড একটা উঠান। তারই সামনে নাটমন্দির। উঠানের এক কোনে একটা কূয়ো, জায়গায় জায়গায় কূয়োর ঘের ভেঙে জমির সঙ্গে সমান হয়ে গেছে। এরই পাশে কাপড়ে ঢাকা লাস। একজন লোক আমাদের দিকে পেছন ফিরে বসে ছিল, পায়ের শব্দে উঠে দাঁড়াল।

রবিশঙ্কর ঢাকাটা তুলে নিতেই দেখলাম একটা বীভৎস দৃশ্য উপুড় হয়ে পড়ে আছে একটি স্ত্রীলোকের মৃতদেহ: শিরদাঁড়ার ঠিক পাশ দিয়ে কাঁধ থেকে প্রায় কোমর পর্যন্ত ক্ষতের দাগ। চুলের কাছে ঘাড় ও শিরদাঁড়ার সংযোগে আর একটা ক্ষত। জলে ধুয়ে ক্ষতগুলো শাদা হয়ে উঠেছে। পরণের শাদা থান একেবারে ভিজে গেছে। গায়ে হাত দিয়ে দেখলাম শরীর ঠাণ্ডা ও শক্ত। মৃত্যু হয়েছে অনেকক্ষণ, প্রচুর রক্তক্ষয়েই প্রাণ বেরিয়ে গেছে।

ভালো করে পরীক্ষা করবার জন্য লাসকে চিৎ করে শুইয়ে দেওয় হল। চমকে গেলাম। চোখদুটি খোলা—চোখে মুখে একটা অস্বাভাবিক নিষ্ঠুরতার ছাপ। দীর্ঘ দৃঢ় শরীরে যেন অমানুষিক শক্তি, একট কঠিন পৌরুষ ও দম্ভ। বয়স প্রায় চল্লিশ হতে পারে। শাদা থানের ভেতর দিয়ে স্বাস্থ্যের ঔজ্জ্বল্য ও গোলাপী আভা ফুটে বেরোচ্ছে। এককালে ইনি যে অসামান্যা সুন্দরী ছিলেন তা বোঝা যায়। কিন্তু চোখদুটি দেখলে ভয় করে।

রবিশঙ্কর জিগেস করল: "লাস ছিল কোথায়? এইখানেই?"

যে লোকটা কূয়োর ধারে বসে ছিল সে রুক্ষ গলায় উত্তর দিল "কূয়োর ভেতরে।" লোকটার লম্বা জোয়ান চেহারা, হাতের মুঠো বাঘের থাবার মতো। গায়ের রং তামাটে, মাথার চুল ও চোখ কটা।

জিগেস করলাম : "তোমার নাম কী ?"

লোকটা চোখ পাকিয়ে জবাব দিল : "কাফু্ ফার্ণান্দো।"

রবিশঙ্কর বলল : "কুয়োর ভেতব ? তোমরা দেখলে কী করে ?"

এবার লেহাই উত্তর দিল : "লাসের আধখানা কুয়োর ভেতর ঝুলছিল, বাকিটা উঠানের ওপর।"

"লাস দেখল কে প্রথমে ?" আমি জিগেস করলাম। লেহাই চুপ করে রইল। "কে দেখল ?"

লেহাই বলল : "আমি।" সে ভোরবেলায় ঘরে বসে ছিল। তার স্ত্রী নুনিয়া বলে যে রাণীর দরজা খোলা রয়েছে। তখন সে উঠানে ঢুকে এসে লাস দেখতে পায়। নুনিয়া ও কাফুর্কে তাড়াতাড়ি ডেকে এনে সে লাস উঠানে শুইয়ে দেয়।

রবিশঙ্কর জিগেস করল : "রাত্রে রাণীর কাছে কে ছিল ?"

নুনিয়া জানাল যে রাণী বড়ো তেজী ছিলেন কাউকে রাত্রে বাড়ীর ভেতরে থাকতে দিতেন না। আমাদেব খুব আশ্চর্য লাগল।

জিগেস করলাম : "রাণীব কে আছে ?"

নুনিয়া জানাল যে ইনি বিধবা, ছেলেমেয়েও নেই। এক ননদ আছেন সামনের দিকে গড়েব দোতলায়। এঁর নাম সোদামিনী। হত্যার খবর শুনে ইনি অজ্ঞান হয়ে পড়েছিলেন। এখন তিনি ঘরে শুয়ে আছেন।

"রাণী শুতে যেতেন কখন রাত্রে ?" রবিশঙ্কব জিগেস করল। কিন্তু কেউ সঠিক উত্তর দিতে পারল না। সন্ধ্যাব কিছু পরে নুনিয়া কায সেরে বেরিয়ে আসত। নটার মধ্যেই কালীশ্বরী দরজা বন্ধ করে দিতেন। কাল রাত্রে ঝড়বৃষ্টির মধ্যে কী হয়েছিল কেউ জানে না।

আমরা নুনিয়াকে নিয়ে কালীশ্বরীর শোবার ঘরের দিকে এগোলাম।

নাটমন্দিরেব পেছনে বড় বড় ঘর তালাবন্ধ হয়ে পড়ে আছে। সিঁ
দিয়ে উঠেই কালীশ্বরীর শোবাব ঘব। ঠিক মাঝখানে প্রকাণ্ড এ
খাট—কাঠের চার পাঁচটি ধাপ উঠে বিছানায় আসতে হয়। বিছানা
দেখে বোঝা গেল বাণী কাল রাত্রে সেখানে ঘুমোননি।

রবিশঙ্কর আমাকে জিগেস করল : "বিভূতি, খুন কখন হয়েছে ব
তোমার মনে হয় ?"

ঠিক বলা শক্ত, বৃষ্টির জলে শরীব ভিজে উত্তাপ খুব শীঘ্রই নষ্ট হ
যেতে পারে। একটু ভেবে বললাম : "খুব সম্ভব, সাত আট ঘণ্টার বে
নয়।"

শোবার ঘর ও আবো কয়েকটা ঘব খুঁজেও সন্দেহজনক কি
দেখতে পেলাম না। খুনের ব্যাপারটা খুব জটিল বলে মনে হল। উ
বংশের এই বয়স্থা মহিলাকে এমন নিষ্ঠুরভাবে কে হত্যা কবল ? কে
খুন নিশ্চয়ই রাত্রি বারোটা-একটাব আগে হয়নি। তাব আগে
করছিলেন ? কোথায় ছিলেন ? কুয়োব ধারেই বা লাসটা ছিল কে
হত্যাকারী কি কুয়োর ভেতবে মৃতদেহটা ফেলে দেবাব চেষ্টা করছি
ফেলে দিল না কেন ? দরজা খোলা থাকা অবশ্য খুব বড়ো একটা স
নয়। কালীশ্ববী হয়ত বন্ধ করতে ভুলে গিয়েছিলেন। হয়ত হত্যাক
আগে থেকেই বাড়ীর মধ্যে ছিল। খুন করে দবজা খুলে চলে গে
ক্ষত দেখে মনে হয় খুব ধারালো কোনো অস্ত্রের আঘাতে মৃত্যু হয়ে
এত চিন্তার চাপে মনটা ক্লান্ত হয়ে পড়ল।

বললাম : "শঙ্কর, চলো একবার সৌদামিনীর সঙ্গে দেখা ক
হয়ত তাঁর কাছ থেকে কিছু জানতে পাবা যাবে।"

কাফু ও লেহাইকে উঠানে লাসেব কাছে বসিয়ে রেখে অ
মনিয়ার সঙ্গে গাছের দোতলায় উঠলাম।

মুনিয়া এসে বলল সৌদামিনী এখন একটু ভালো আছেন। আমরা দেখা করতে পারি। সিঁড়ি দিয়ে উঠেই সৌদামিনীর শোবাব ঘব, পাশে পূজোর ঘর। সামনে ও পেছনে দালান। আমবা মুনিয়ার সঙ্গে শোবার ঘরে ঢুকলাম। প্রকাণ্ড খাটের ওপব বিছানায় বালিশে ঠেস দিয়ে সৌদামিনী বসে আছেন। মুখের চেহারা দেখেই মনে হল তিনি বিশেষ অসুস্থ। কী বকম একটা অস্থির ভাব, যেন দু চোখ দিয়ে কিছু খুঁজছেন, ার পায়ের শব্দের জন্য অপেক্ষা করছেন! বয়স প্রায় পঞ্চাশ, কিন্তু রীরে বেশ শক্তি আছে। কালীশ্বরীর মতো ইনিও সুন্দরী—বৈধব্যেব েশ মানায় না। সৌদামিনীর মুখে বিবর্ণ, চোখদুটি ক্লান্ত, শবীবেব ত্যেকটি রেখায় অবসাদ। মনে হল এই হত্যাব কথা শুনে তিনি েকবারে ভেঙে পড়েছেন।

দেয়ালের ধারে একটা বেঞ্চে আমবা বসলাম। সৌদামিনী একটু সলেন, ঘরের ভেতরে একটা অস্বস্তির আবহাওয়া গড়ে উঠল। তিনিই থমে কথা কইলেন: "আপনাবা থানা থেকে আসছেন?" রবিশঙ্কর িয়ে দিল যে আমরা ঠিক পুলিশের লোক নই।

সৌদামিনী চুপ করে বইলেন। বিবর্ণ মুখে সামান্য উত্তেজনাব ভাস এল। বললেন: "দেখুন, এ খুনের তদন্ত করে কোনো ফল হবে শুধু বাজবাড়ীর এই কলঙ্ক ছড়িয়ে পড়বে। আমাদের বংশের াই এই রকম।" গলার স্বব অস্পষ্ট হয়ে এল, চোখ বুজে গেল।

বললাম: "শুনুন, আমি ডাক্তার। আমার মনে হচ্ছে আপনি েষ অসুস্থ। কতো দিন থেকে আপনার শরীর খারাপ হয়েছে?"

একটু হেসে সৌদামিনী ব

ব্যাপারে হঠাৎ বিচলিত হয়ে অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিলাম। যাক্, আপনারা যদি খুনের তদন্ত করতে চান তাহলে কী জানতে চান বলুন।"

রবিশঙ্কর জিজ্ঞাসা করল : "আপনি কখন খবর পেলেন ?"

সৌদামিনী বললেন: "আমিই বোধহয় প্রথমে লাস দেখেছি। উপর ছাত থেকে দেখেই আমি নিচে আসছিলাম এমন সময়ে ঝুনিয়া আমাকে খবর দিল।"

"আচ্ছা, খুন কে করেছে বলে আপনার মনে হয় ? কেন ?" জিগেস করলাম। সৌদামিনী একটু চুপ করে রইলেন। চোখদুটি চঞ্চল হয়ে উঠল।

বললেন : "বুঝতে পারছিনা। সমস্ত ব্যাপারটা অসম্ভব লাগছে। খুনের কোনো কারণও খুঁজে পাচ্ছি না।"

এতক্ষণ বৃষ্টি বন্ধ ছিল, হাওয়ারও জোর ছিল না। কিন্তু এখন আকাশ আরো অন্ধকার হয়ে গেল। বাইরের দিকে তাকিয়ে দেখলাম ঝড়বৃষ্টি আরম্ভ হয়েছে। সৌদামিনী চুপ করে রইলেন, মনে হল অজস্র শান্তিতে যেন শরীর ভরে গেছে। আমরাও চুপ করে রইলাম : বাইরে শুধু ঝড়জলের শব্দ।

সৌদামিনী সোজা হয়ে বসলেন। গলার স্বর এবার উত্তেজিত, মুখ-চোখ বিকৃত। নিচু গলায় কথা বলতে আরম্ভ করলেন আপন মনে — অজস্র, অফুরন্ত। যেন অন্ধকার গভীর গুহা থেকে জলের স্রোত বেরিয়ে চলেছে অবাধে।

অন্ধকার ঘর, আকাশ মেঘে অন্ধকার। ঝড়, জল আর বিদ্যুতের গলার স্বর ডাব যায়। অস্পষ্ট

বিবর্ণ মুখে উত্তেজনার আভাস, বড় বড় চোখে অস্থিরতা। দিন হল রাত, ঘরের হাওয়ায় শুধু স্মৃতির পদধ্বনি।

এ রকম ঝড় তিনি আব কখনো দেখেননি। সামনে প্রায় দু মাইল জায়গা জুড়ে প্রকাণ্ড বন—সারা রাত সেখানে ঝড়ের গর্জন। বড় বড় গাছ ভেঙে পড়ার শব্দ হচ্ছে। মাঠে জল জমে গেল—শুধু লম্বা ঘাসের মাথাগুলো জলের ওপর জেগে আছে। হাওয়ায় ঘাসগুলো দোলে আর ছপ্ ছপ্ শব্দ হয়। মনে হয় যেন কোন অদৃশ্য হিংস্র জন্তু জলের তলায় গুঁড়ি মেরে ঘাস ঠেলে এগিয়ে আসছে। ঝড়জলের শব্দে ঘুম ভেঙে যায়, কিন্তু একটি তন্দ্রার মোহ শরীরটাতে জড়িয়ে থাকে। সেই আধ জাগা আধ ঘুমের আবছায়ায় সৌদামিনীর সারাটা রাত কেটেছে। রাত তখন কতো সৌদামিনী জানেন না, হঠাৎ ছুরির মতো ধারালো একটা চীৎকার এল। তারপর শুধু ঝড়ের শোঁ-শোঁ গর্জন আর বৃষ্টির ঝম্-ঝম্ শব্দ।

বিকেল থেকেই ঝড়বৃষ্টি বেশ চেপে এসেছিল। যখন তিনি বিছানায় শুতে যান সেই সময়ে একটা বাজ পড়ল দূরে বিলের ধারে একটা নারকেল গাছেব মাথায়। সমস্ত আকাশ চিরে নামল আলোর একটা শীর্ণ রেখা—গাছের মাথায় আগুন ধরে গেল। কিন্তু এত ঝড়-বৃষ্টির মধ্যেও সৌদামিনী কাফ্রর গান ও তাড়ি খেয়ে হল্লার চীৎকার শুনেছিলেন।

সুন্দরবন অঞ্চলের এই রায়বংশ বহু প্রাচীন। সৌদামিনী শুনেছে এই রাজবাড়ী প্রায় চার শো বছরের পুরোনো। ইংরাজী আমলে রায়েরা বিদেশী শাসন মেনে নিতে

কালীশঙ্কর ইংরেজদের সঙ্গে যুদ্ধ চালিয়েছিলেন, কিন্তু শেষে পালিয়ে যান। তারপর তাঁর আর খোঁজ পাওয়া যায়নি। তখন তাঁর ছেলে শিবনারায়ণের হাতে সম্পত্তি আসে। প্রকাণ্ড সাত মহলা বাড়ী। দুপাশে হাতীশালা ও ঘোড়ার আস্তাবল, পাইক্-দারোয়ানদের ঘর ও সামনে কাছারি বাড়ী ছিল। হাজার হাজার প্রজা, লাঠিয়াল, সড়কিদার বরকন্দাজ, মাহুত, সহিস, ঝি চাকরে বাড়ী ও মাঠ ভরে যেত। কিন্তু সেদিন আর নেই, জমিদারি সমস্তই গেছে।

আজ বাড়ীর তিন চারটে মহল একেবারে ভেঙে পড়েছে। পেঁচা, চামচিকা ও সাপে বাড়ী আজ বোঝাই। সারারাত শুধু এদেরই শব্দ, এদেরই চলা ফেরা। ভাঙা দেয়ালে, উঠানে, ফাটা ছাতে আগাছা জন্মেছে, বট অশথের শেকড় নেমেছে। বাড়ীর চারধারে কোমর-উঁচু সবুজ ঘাসের বন, হাওয়া দিলে ঘাসে সপ্ সপ্ শব্দ হয়। বড় বড় গাছ দীর্ঘ ডালপালার বাহু মেলে এই জীর্ণ বাড়ীটিকে আঁকড়ে ধরে আছে। দিনে রাতে সব সময়েই অন্ধকার। মোটা মোটা দেয়ালের পেছনে ঘরগুলো ধুলো ও আবর্জনায় ভর্তি, স্যাঁতসেতে ভিজে। রাত্রে লণ্ঠন হাতে সৌদামিনী যখন ঘরের পেছনের দালান দিয়ে যান, মনে হয় বড় বড় ঘরের জানলার গরাদের পেছন থেকে কারা যেন হাতছানি দিয়ে ডাকে, কাদের যেন চাপা হাসিতে তাঁর গা শিউরে ওঠে। লণ্ঠনের মিটমিটে আলোয় দেয়ালের গায়ে বিকটাকার ছায়া পড়ে আর দোলে। সামনের অন্ধকার যতোই সরে ততোই মনে হয় যেন কারা সরে গেল সিঁড়ির কোনে, থামের আড়ালে, দালানের বাঁকে। পেছনে তাকাবার সাহস হয় না, মনে হয় কতো নিঃশব্দ প্রাণী সার বেঁধে পেছনে পেছনে চলেছে, কখন বুঝি ঠাণ্ডা আঙুলের ছোঁয়া লাগবে পিঠের ওপর। তার

পর হাত থেকে খসে পড়বে লণ্ঠন, হঠাৎ চারদিকের ছায়ার দল এক-সঙ্গে তালগোল পাকিয়ে ছাত পর্যন্ত লাফিয়ে উঠবে। তারপর অন্ধকার—সামনে, পিছনে, পাশে শুধু অদৃশ্য কঙ্কাল, আর মড়ার খুলির ভেতর থেকে ঝলকে ঝলকে অনেক দিনের বাসি ঠাণ্ডা হাওয়া।

রহস্যময় এই বাড়ী: মাকড়সার জালের মতো অসংখ্য সুড়ঙ্গ চলে গেছে দেয়াল থেকে দেয়ালে, ঘর থেকে মাটির নিচে, মাঠ থেকে বনের মধ্যে, এমন কি নদীর ধারে। বাড়ীর সামনের অংশ খুব উঁচু, গড় বলা হয়। দোতলা পর্যন্ত সিঁড়ি পাথরের, তারপর কাঠের। সৌদামিনী এই অংশে থাকেন সিঁড়ি দিয়ে উঠেই তাঁর শোবার ঘর, পাশে পূজোর ঘর। পেছনে দালান ধরে চলে গেলে বা দিকে আরো কয়েকটা ঘর পড়ে। বন্ধই থাকে, ব্যবহার হয় না। সব শেষে তেতলায় ওঠবার আর একটা সিঁড়ি, তার পরেই দেয়াল খুব উঁচু। এখানে সৌদামিনীর অংশ শেষ হয়েছে, তার পেছনেই নাটমন্দিরের উঠান।

বাড়ীর বাইরে পূব দিকে যেখানে আগে হাতীশালা ও আস্তাবল ছিল সেখানে ঘরগুলো প্রায় সব ভেঙে পড়েছে। যে দুটো-তিনটে ঘর এখনো কোনোমতে বটগাছের আড়ালে দাঁড়িয়ে আছে তাতে থাকে কার্ফু, লেহাই আর দুনিয়া। কার্ফুর পূর্বপুরুষ ছিল পোর্তুগীজ জলদস্যু, বিয়ে করেছিল এক আরাকানী মাল্লার মেয়েকে। এরা ছিল রাজবাড়ীর বজরা ও ছিপের সদার। লেহাই ছিল হাতীর মাহুত, পরে হয় দারোয়ান। এরা আজও বন-জঙ্গলের মধ্যে বাস করছে রাজবাড়ীর অবস্থাবিপর্যয় সত্ত্বেও। এদের সামান্য জমি আছে—কালীশ্বরী ও সৌদামিনীর কাযও করে। বাড়ীর কাছাকাছি কোনো প্রতিবেশী নেই। ষ্টীমার-ঘাট থেকে কিছু দূরে কয়েক ঘর লোকের বাস।

কালীশ্বরী যে অংশে থাকেন ঠিক তার পেছন থেকেই বাড়ীটা ধ্বসে পড়েছে। বড় বড় শালের কড়ি ঝুলছে, কখন খসে পড়ে তার ঠিক নেই। অনেক দরজা-জানলা পড়ে গেছে, দেয়ালের মাঝে মাঝে শূন্যতা হাঁ করে আছে। রাত্রে বড় বড় বট-অশথের মাথায় যখন চাঁদের ফালি দেখা যায় তখন আলো-অন্ধকারের মধ্যে এই ভাঙা অংশটি বীভৎস হয়ে ওঠে। শুধু ছায়া, সারি সারি নিশ্চল ছায়া। হাওয়া উঠলেই ভাঙা দেয়ালের মধ্যে অদ্ভুত শব্দ হয়। হয়ত বাদুড়গুলো পাখা ঝট্‌পট্‌ করে, একদল চামচিকা উড়তে থাকে। তাদের শব্দে ঘুমন্ত সাপ জেগে ওঠে।

পেছন দিয়ে চলে গেছে ডাইনীর খাল -বেশি চওড়া নয়, পঞ্চাশ-ষাট হাত হবে কিন্তু বর্ষায় যখন খাল জলে ভরে ওঠে তখন জল হয় খুব গভীর। ডাইনীর খাল এঁকে বেঁকে গিয়ে পড়েছে লখাই নদীতে। আগে এর একটা শাখার সঙ্গে সাগরের যোগ ছিল। সৌদামিনীর ঠাকুরমা বজরায় চড়ে এই শাখা দিয়েই সাগরে রুপোর পালকিতে বসে স্নান করেছিলেন। এই ডাইনীর খালই ছিল রায়েদের যাতায়াতের প্রধান পথ। গভীর রাতে সরু সরু লম্বা ছিপের ওপর বসে জলপথে তাঁরা যেতেন অপকর্ম করতে যেতেন। অনেক অত্যাচার, অনেক ডাকাতি, অনেক নরহত্যা তাঁরা করেছেন। বলিষ্ঠ মাঝিদের হাতে দাঁড়ের টানে কালো জলে ছপ্‌ছপ্‌ শব্দ করে ছিপগুলো তীরের মতো ছুটে চলত। এখন এই খালে কখনো কখনো খড়-বোঝাই বা নুন-বোঝাই নৌকা দিনের বেলায় চলে। কিন্তু রাত্রে প্রায়ই খালের জল হয় সজাগ। তখন কালীশ্বরীর অংশের পেছনের দিকের ভাঙা দেয়ালের আড়ালে লুকিয়ে থাকলে দেখা যায় সরু সরু ছোট নৌকায় মাথা নিচু করে দাঁড় টানছে মাঝিরা। শুধু

জলের ওপর দাঁড়ের শব্দ, মাঝে মাঝে হয়ত ফিস্‌ফিস্‌ করে কথা, হয়ত একটা ইতর গালি, কিংবা এক টুকরো হাসি। কখনো কখনো ফস্‌ করে দেশলাই জ্বলে ওঠে, দু-এক সেকেণ্ডের জন্য খালের অন্ধকার আলোয় ঝলসে যায়, ছইয়ের ধারে কোনো চীনা বা ইহুদির মুখ জ্বলজ্বল করে, তারপর আবার অন্ধকার ঝাঁপিয়ে পড়ে। এসব নৌকায় যায় চোরাই মদ, আফিম, কোকেন। নৌকাগুলো ডাইনীর খাল বেয়ে বৈরাগীর মাঠের ধার দিয়ে সুন্দরবন-অঞ্চলের ঘন জঙ্গলের ছায়ায় ছায়ায় লুকিয়ে কোন গোপন ঘাটে যে বোঝা নামায় তা কেউ জানেনা।

রায়েরা ছিলেন ঘোর তান্ত্রিক, শবসাধনা ছিল তাঁদের অনেকেরই নেশার মতো। রাজা বাসবনারায়ণের সময় থেকেই জমিদারির অধঃপতন আরম্ভ হয়। এক সঙ্গে অনেকগুলি দুর্ঘটনা ঘটে : বাসবনারায়ণ আত্ম-হত্যা করেন, তাঁর বড় ছেলে দেবনারায়ণের মৃত্যুও অস্বাভাবিক। ছোট ছেলে সূর্যনারায়ণ তন্ত্রসাধনা আরম্ভ করেন। তাঁরও মৃত্যু ঘটে শোচনীয় ভাবে। তিনি নাকি সুন্দরবন-অঞ্চলের বুনো জাতের এক কুমারী মেয়েকে বলি দিয়েছিলেন। শ্মশানেই তাঁর মৃতদেহ কিছু দিন পরে দেখা যায়, কিন্তু দেহে মুণ্ড ছিল না। এই সূর্যনারায়ণই কালীশ্বরীর স্বামী। সৌদামিনী বলেন যে একদিন সন্ধ্যায় নাটমন্দিরের পাশ দিয়ে যেতে যেতে তালাবন্ধ ঘরে জানলার পেছনে একটি মেয়েকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখেন। খুব সুন্দর চেহারা, কিন্তু রং মিশমিশে কালো। মেয়েটি মাথা হেলিয়ে চুল আঁচড়াচ্ছিল। চুলের জটে চিরুণি আটকে যেতেই হঠাৎ বিরক্ত হয়ে সে নিজের ঘাড় থেকে মাথাটা হাতে তুলে নিয়ে আবার চুল আঁচড়াতে লাগল। এই দৃশ্য দেখে সৌদামিনী ছুটে পালিয়ে আসেন, তারপর বহুদিন ফিটের অসুখে ভোগেন।

ভোরের দিকে ঝড় অনেক কমে গেল, বৃষ্টিও। কিন্তু আকাশে এমন মেঘের ঘটা যে ভোর বেলায় যেন গভীর রাতের অন্ধকার। সৌদামিনী নিজের অংশের উঠানে নেমে কুয়োর ধারে স্নান করে পূজোয় বসলেন। পূজো শেষ করে যখন উঠলেন তখন ঝড়ের বেগ কমে গেছে, ফোঁটা ফোঁটা বৃষ্টি পড়ছে।

আজ মন কেমন অস্থির, শরীরও অসুস্থ লাগছে। কানে শুধু বাজছে কাল রাত্রের ঝড়জলের শব্দ আর সেই ভয়ানক একটা চীৎকার। জানলার বাইরে তাকিয়ে দেখলেন ঝড় থেমেছে, কিন্তু কেমন একটা থমথমে ভাব। পূজোর বাসি ফুলগুলো কুড়িয়ে নিয়ে পেছনের সিঁড়ি দিয়ে সৌদামিনী গড়ের ছাতে উঠলেন। যতো দূর চোখ যায় শুধু গাছের মাথা আর জল। অন্ধকার আকাশের তলায় অনেক দূরে স্টীমার-ঘাট দেখা যাচ্ছে। অনেকগুলো গাছ ভেঙে পড়েছে। সৌদামিনী ছাতটায় ঘুরে বেড়াতে লাগলেন। কানে বাজছে কাল রাত্রের সেই চীৎকার। নাটমন্দিরের উঠানের দিকে এগিয়ে এলেন। জায়গায় জায়গায় প্রাচীর ভেঙে গেছে। ঝুঁকে নিচের দিকে তাকালেন। প্রায় একশ ফিট্ নিচে উঠান। হঠাৎ চীৎকার করে উঠলেন, আবার তাকালেন, মাথাটা ঘুরে উঠল।

কুয়োর ধারে যেখানটা ভাঙ্গা সেখানে উপুড় হয়ে কে যেন পড়ে আছে! পিঠে ঘাড়ে গভীর ক্ষত হাঁ করে আছে। কে? কে ওখানে শুয়ে? কাঁপতে কাঁপতে সৌদামিনী সিঁড়ির দিকে এগোতে লাগলেন। মাথার মধ্যে হাজার হাজার চাকা এক সঙ্গে ঘুরে চলেছে!

সৌদামিনী অজ্ঞান হয়ে বিছানার ওপর পড়ে গেলেন। মুনিয়া

ছুটে এল। অসুস্থ শরীরে হঠাৎ উত্তেজিত হবার ফলে অজ্ঞান হয়ে গেছেন। অনেক কষ্টে যখন জ্ঞান হল তখন মুনিয়াকে তাঁর কাছে রেখে আমরা বেরিয়ে এলাম।

বৃষ্টি তখন থেমে গেছে, কিন্তু হাওয়ার জোর আছে। সৌদামিনীর সব কথা শুনে মনে হল এই হত্যার মূলে কোনো গভীর রহস্য রয়েছে।

আমরা ঠিক করলাম অমরবাবুর জন্য অপেক্ষা করাই ভালো। কাফু ও লেহাইকে বললাম তারা যেন খুব সাবধানে থাকে। আমরা থানায় ফিরছি, ইন্‌স্পেক্‌টর্‌ সাহেব এলেই তাঁকে নিয়ে আবার আসব; সৌদামিনীর শরীর খারাপ হলে তখনই যেন আমাদের খবর দেওয়া হয়। আমরা সকলে ধরাধরি করে লাস নিয়ে গেলাম উঠানের ধারে একটা ঘরে। মরচে-ধরা পুরোনো তালটা কাফু এক মোচড়েই ভেঙে ফেলল। অন্ধকার ঘর, আকাশের মেঘে আরো অন্ধকার হয়ে উঠেছে। কতো বছর যে সে ঘরে লোক ঢোকেনি তার ঠিক নেই, মেঝে ধূলোয় পা ডুবে যায়। সেখানে শুয়ে রইলেন বহুপ্রাচীন এক অভিজাত বংশের শেষ বধূ রাণী কালীশ্বরী।

মাঠের জল ভেঙে আবার ঢুকলাম বনের আঁকাবাঁকা পথে। আর একটা রাস্তা আছে—অনেক ঘুরে স্টীমার ঘাটের সামনে বেঁকে বাংলোর দিকে গেছে। কিন্তু তাতে অনেক দূরত্ব বাড়ে।

দুজনে নীরবে পথ চলেছি, মন সমস্যার ভারে ক্লান্ত। সৌদামিনীর কথা থেকে অনেক কিছুই জানা গেল। অদ্ভুত পরিবার! রাজা বাসব-নারায়ণ, তাঁর দুই ছেলে—সকলেরই মৃত্যুর ওপর রয়েছে এক অদৃশ্য ছায়া। কালীশ্বরী, সৌদামিনী এঁরাও ঠিক স্বাভাবিক নন। কোথায় যেন জটিলতা আছে। কালীশ্বরীর মৃত্যু—কী এ রহস্য! একজন অভিজাত বংশের বয়স্কা বিধবা ও নিঃসন্তান মহিলাকে কে এভাবে হত্যা করল? সৌদামিনীর কথা থেকে মনে হল কালীশ্বরীর সঙ্গে তাঁর বিশেষ সদ্ভাব ছিল না। দুজনে একা একা নিজের অংশে থাকতেন কেন? কালীশ্বরীর চেহারাও মনে পড়ল ভীষণ মূর্তি! সৌদামিনী যে চীৎকার শুনেছিলেন কার? কালীশ্বরীর? কিন্তু নাটমন্দিরের উঠান থেকে কোনো চীৎকারই সৌদামিনীর ঘরে আসতে পারে না। সেদিকে উঁচু দেয়াল গড়ের ছাত পর্য্যন্ত উঠেছে। খুনের তদন্ত সম্বন্ধে সৌদামিনী এত নিরুৎসাহ কেন? তিনি যেন ধরে নিয়েছেন এ বংশের ধারাই এই রকম, তদন্তে কোন ফল হবে না।

কাফুকে আমার ভাল লাগেনি। লোকটা যেন কেমন হিংস্র জন্তুর মতো! সেই কি খুন করেছে? কিন্তু কেন? তাছাড়া লেহাই বলে রাত্রে কাফু ঘরেই ছিল সৌদামিনীও তার আরাকানী গান শুনেছেন। অবশ্য পরেও সে এ কায করতে পারে। দরজা খোলা ছিল, বাড়ীর পেছন দিকও ভেঙে পড়েছে, বাইরের লোক ঢুকতে পারে। কিন্তু খুন হল কেন?

সারা পথ এই ভাবতে ভাবতে চলতে লাগলাম। মাঝে মাঝে দুজনে আলোচনা করলাম। বাংলোর কাছাকাছি এসে হঠাৎ রবিশঙ্কর বলল : "বিভূতি, ষ্টীমার-ঘাটের কাছে যে লোকটা তোমার গায়ে এসে পড়েছিল তাকে মনে পড়ছে ?"

আমি একটু আশ্চর্য হয়ে বললাম . "কেন বলো তো ?"

রবিশঙ্কর বলল : "কারণ আছে। আমার মনে হচ্ছে ষ্টীমার-ঘাটের সামনের রাস্তা দিয়ে তাকে আসতে দেখিনি। কিন্তু তা হলে সে এল কোথা থেকে ? ঐ তো একমাত্র রাস্তা ! আমার মনে পড়ছে তাকে আমি শুধু রাস্তা পেরিয়ে আসতে দেখেছি।"

সত্যিই তো ! লোকটা যদি রাস্তা দিয়ে আসত তাহলে তাকে দূর থেকেই দেখা যেত। আমি বললাম : "ধরো, সে যদি বনের ভেতর থেকে বেরিয়ে এসে থাকে !"

রবিশঙ্কর বলল : "ঠিক বলেছ। কিন্তু বনের মাঝ দিয়ে কোনো পথ ষ্টীমার-ঘাটের সামনে নেই। তাহলে পথ নেই বনের এমন কোনো জায়গা থেকে সে বেরিয়েছে। কেন ? লোকটার খুব তাড়াও ছিল। সুট্-কেস্ হাতে নিয়ে কী রকম ছুটেছিল মনে আছে ?"

আমার সন্দেহ হল, বললাম : "খুনের সঙ্গে লোকটার কোনো সম্পর্ক আছে নাকি ?" রবিশঙ্কর হাসল, কিন্তু আমি বললাম : "না, ধরো লোকটা যদি রাত্রে খুন করে বনের মধ্যে লুকিয়ে থাকে। তারপর কাপড় চোপড় বদলে সুট্-কেসে পুরে ষ্টীমারে উঠে পালিয়ে গেছে।"

রবিশঙ্কর বলল : কিন্তু কেন ? কেন সে এ কাজ করল ?" চুপ করে রইলাম, কিন্তু মনে সন্দেহ রইল।

থানায় এসে শুনলাম লাহিড়ি তখনো ফেরেননি। বেলা তখন দুটো।

লাহিড়ির বেয়ারা আমাদের জন্য রেঁধে রেখেছে। স্নানাহারের পর রবি শঙ্কর বলল: "চলো, বিভূতি, একবার বনের ভেতরটায় ঘুরে দেখে আসি।" আবার দুজনে বেরিয়ে পড়লাম। ষ্টীমার ঘাটের কাছে আসতেই বৃষ্টি নামল। কাছাকাছি জনপ্রাণী নেই, শেডের তলায় গিয়ে ঢুকলাম পায়ের শব্দে ভবতারণবাবু চটের পর্দাটি সরিয়ে বেরিয়ে এলেন। আমরা ভেতরে চেয়ারে বসলাম, ভদ্রলোক তাঁর খাটিয়ায়।

ভবতারণ বললেন: "কাষ বেশি পড়লে আমি এখানেই থাকি থানার বেয়ারা বেঁধে খাওয়ায়। হাঁ মশায়, রাজবাড়ীতে নাকি খু হয়েছে?" গলার স্বর এতো নিচু হয়ে গেল যে আমাদেরও শোনা কঠিন। "বেয়ারা বলল আপনারা নাকি তদন্তে বেরিয়েছিলেন?" বুঝলা লাহিড়ির বেয়ারাই এই খবর দিয়েছে।

রবিশঙ্কর একটু হেসে বিনীতভাবে বলল "সে কিছু নয়।"

"কিছু নয় কি মশায়?" ভবতারণ উৎসাহের সঙ্গে বলতে লাগলে "কিছু নয়? শুনলাম আপনারা কলকাতার পাকা ডিটেক্‌টিভ আমারও আবার এদিকে একটু সখ আছে কিনা, তাই বলছি। এককা ডিটেক্‌টিভ উপন্যাস খুবই যত্ন নিয়ে পড়েছি, এখন এইখানে এসে··

রবিশঙ্কর বাধা দিল: "বেশ, বেশ! খুবই ভালো কথা। ত কোনো কথা এখানকার কারো কাছে প্রকাশ করবেন না। ব্যাপার জটিল।"

একটি চোখ টিপে মৃদুস্বরে ভবতারণ জিগেস করলেন: "কা সন্দেহ করছেন, স্যার?"

কথা চাপা দেবার জন্য আমি রবিশঙ্করকে বললাম: "সৌদামিনী যে রকম অবস্থা তা থেকে শক্ত কোনো অসুখ হয়েছে বলে মনে হয়

শিলার কাছে টেলিগ্রাম করা উচিত—যদি ওর পিসিমাকে সঙ্গে নিয়ে আসতে পারে।”

ভবতারণ তখনই বললেন যে টেলিগ্রামের কায তাঁরই কাছে। জানা গেল তিনি পোষ্ট, টেলিগ্রাফ, ষ্টীমার ও হোমিওপ্যাথি সংক্রান্ত সব কাজই করেন। শিলার কাছে টেলিগ্রামের ব্যবস্থা করে আমরা বেরিয়ে পড়লাম।

বাইরে বৃষ্টি তখন থেমে গেছে। এদিক ওদিক তাকিয়ে রাস্তা পার হয়ে আমরা বনের মধ্যে ঢুকলাম অতি কষ্টে। চারদিকে সারি সারি গাছ, কাঁটার ঝোপ আর উঁচু ঘাস। এখানে পায়ের দাগ বা অন্য কোনো চিহ্ন খুঁজে বার করা অসম্ভব। আশেপাশে অনেক দূর লক্ষ্য করতে করতে এগিয়ে গেলাম। ঘুরতে ঘুরতে এসে পড়লাম একটা সরু পথে—এই পথটাই রাজবাড়ী পর্যন্ত গিয়েছে। ঐ পথ ধরেই বাংলোয় আবার ফিরে এলাম। তখন প্রায় সন্ধ্যা। পরে অনুতাপ করতে হয়েছিল, কারণ সেদিন রাত্রে রাজবাড়ীতে থাকলে খুনের কিনারা হয়ত সহজেই হতে পারত। এমন এক ব্যাপার ঘটল যাতে সমস্ত ঘটনাটা হয়ে গেল আরো জটিল, রহস্যময়।

লাহিড়ি তখনো আসেননি। সব কথা জানিয়ে শিলাকে একখানা চিঠি দিলাম সন্ধ্যার ষ্টীমারের পোষ্টে।

পঞ্চম অধ্যায়

শিলা সেনের ডায়ারি

মাথার কাছে টেবল্-ল্যাম্পটা জ্বেলে শিলা সেন বিছানায় উপুড় হয়ে পড়ল। শুতে যাবার আগে ডায়ারি লিখবে।

লি

আমরা প্রত্যেকেই অপরাধী, মনের দিক দিয়ে। এমন কি খুন করবার ইচ্ছা ও ক্ষমতা সকলেরই আছে উত্তেজনার সময়ে। এ কাজ ঘটে ওঠে না শুধু সুবিধা ও উত্তেজনার অভাবে। তাছাড়া শাস্তির ভয় ও পারলৌকিক চিন্তাও অনেকটা বাধা দেয়।

কিন্তু আমাদের মধ্যে আবার শিকারপ্রবৃত্তি আছে, ন্যায়ের প্রতি অনুরাগ আছে। ফলে মনে মনে আমরা সকলেই ডিটেক্‌টিভ্। তা ছাড়া কোনো রহস্য ভেদ করতে হলে যে বুদ্ধি, যুক্তি ও সাহসের দরকার হয় তাও আমাদের ভালো লাগে।

অর্থাৎ, আমরা একাধারে অপরাধী ও ডিটেক্‌টিভ্। সেই জন্য আমরা ডিটেক্‌টিভ্ গল্প পড়তে ভালোবাসি, কারণ এখানে আমাদের অপরাধ করা ও শিকার ধরার প্রবৃত্তি দুই-ই সার্থক হয়।

আজ কয়েকখানা বই কিনতে কলেজ স্ট্রীটের দোকানে গিয়েছিলাম। প্রেসিডেন্সি কলেজের রেলিঙে যেখানে পুরোনো বই বিক্রি হয় সেখানে দেখি ইউনিভার্সিটির এক অধ্যাপক আগাথা ক্রিস্টির একটি ডিটেক্‌টিভ্ নভেল নিয়ে দর কসছেন। তাঁর দুই কাঁধের ওপর ঝুঁকে বইটির দিকে লুব্ধ নয়নে তাকিয়ে আছেন একটি টাক-ওয়ালা উকিল ও একটি গোঁফ-ওয়ালা ডাক্তার। ফেরবার পথে ধর্মতলা স্ট্রীটে নামলাম পিসিমার জন্য একটা ওষুধ কিনতে। দোকানে ঢুকল খুন-ও-ভূতের গল্পের একটি সঞ্চয়ন

হাতে নিয়ে এক কলেজী মেয়ে ও তার ছোট ভাই—বোধ হয়, সে স্কুলে পড়ে।

আজ শঙ্কর ও বিভূতির টেলিগ্রাম্ ও লম্বা চিঠি পেলাম। কী যেন গণ্ডগোলের জন্য দুটোই এল আজ—মাত্র কয়েক ঘণ্টার তফাৎ। আমাকে ওরা যেতে লিখেছে পিসিমাকে সঙ্গে নিয়ে। কিন্তু পিসিমার আজ দুদিন বাতের অসুখ বেড়েছে, আর তা ছাড়া খুনজখমের ব্যাপারে তিনি নিশ্চয়ই যাবেন না, আমাকেও যেতে দেবেন না। দরকার নেই ওঁকে কিছু বলে। ভজুয়াকে নিয়েই চলে যাব—অচেনা জায়গায় কাযে লাগতে পারে। রিভল্‌ভারটা নেব নাকি? থাক, বুদ্ধিই আসল অস্ত্র।

ব্যাপারটা চিঠিতে জানলাম। ওরা কিন্তু কাফু, লেহাই ও লুনিয়াকে বিশেষ কিছুই জিগেস করেনি। আমার মনে হয় ভবতারণবাবু গল্পবাজ লোক, ওঁর কাছ থেকেও অনেক খবর পাওয়া যেতে পারে। দেখি, কাল সকালেই যাব। চিঠিটা পথে আবার ভালো করে…………

শিলা ফাউন্টেন্ পেন্ হাতে নিয়েই ঘুমিয়ে পড়ল। টেব্‌ল্-ল্যাম্পের আলোয় দেখা গেল শুধু একরাশ চুল ও ঘাড়ের কাছে একটি বড় তিল।

পাশের ঘরে দয়াময়ী বাতের তাড়নায় মাঝে মাঝে গোঙাতে লাগলেন।

লাহিড়ী এলেন রাত বারোটায় ঝড়বৃষ্টির মধ্যে। আমরা তার আগেই শুয়ে পড়েছিলাম। একে অচেনা জায়গা, তার ওপর খুনের সমস্যা' একেবারেই ঘুম এল না। লাহিড়ি আসতেই উঠে বসলাম।

অমরবাবুর বয়স প্রায় পঞ্চাশ, কিন্তু স্বাস্থ্য আশ্চর্য রকমের ভালো রেখেছেন। মাথার চুল ছোট করে ছাঁটা, নাকের তলায় ছোট একটি গোঁফ, চোখদুটি একটু কটা। কথায় ও ব্যবহারে বেশ ভদ্র, মুখে হাসি, নিচু গলায় কথা বলেন। উনি নিজেই সারা দিনের তদন্তের খবর দিলেন। বললেন: "তোমরা যদি আরো আগে আসতে তাহলে আমার সঙ্গে দেখা হত। অবশ্য, আমার সঙ্গে বেরিয়েও লাভ হত না। আজ দিনটা একেবারে নষ্ট হয়েছে।" শুনলাম যে ঘাঁটির সন্ধানে উনি বেরিয়েছিলেন তার কোনো চিহ্নই দেখতে পাননি। পথে ওঁর নৌকা ভেঙে গিয়েছিল। মেরামত করে ও সারা পথ জল ছেঁচে আসতে হয়েছে বলে এতো দেরি হল।

অমরবাবু আহারাদি করে যখন শুলেন তখন আমরা খুনের কথা তাঁকে বললাম। ষ্টীমার-ঘাটের লোকটার ব্যাপারও জানালাম। লাহিড়ি বললেন কাল ভোরেই রাজবাড়ীতে যাবেন। লাসের কাছে একজন চৌকিদার রাখতে পারলে ভালোই হত। কিন্তু সে উপায় ছিল না চৌকিদারেরা সকলেই ওঁর সঙ্গে বেরিয়ে গিয়েছিল। শিলাকে টেলিগ্রাম করার কথা শুনে বললেন যে সৌদামিনীকে দেখবার সুবিধা তাতে হবে কিন্তু খুনজখমের ব্যাপারে মেয়েদের না আসাই ভালো। আমরা তাঁকে

বোঝালাম যে শিলাব সম্বন্ধে তিনি নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন। তার মতো সাহসী ও বুদ্ধিমতী মেয়ে দেখা যায় না।

লাহিড়ি ঘুমিয়ে পড়লেন, কিন্তু আমাদের ঘুম এল না। ঘবে লণ্ঠনের মিটমিটে আলো, বাইবে পুকুবের জলে বৃষ্টির শব্দ, ঝড়েব শোঁ-শোঁ আওয়াজ। বাব বাব বাজবাড়ীব কথা মনে হতে লাগল: সেখানে না জানি এখন কী হচ্ছে। একতলার অন্ধকাব ঘবে ধূলোয় পড়ে আছে কালীশ্ববীর মৃতদেহ: পিঠে ও ঘাড়ে দারুণ ক্ষত। সৌদামিনীব কথা মনে পড়ল: অস্থিব দৃষ্টি, বিবর্ণ মুখ, হয়ত আবাব অজ্ঞান হয়ে গেছেন। মনে পড়ল ডাইনীব খাল: আজো কি সেখানে কালো জলে ঢেউ তুলে ঝড়বৃষ্টির মধ্যে অন্ধকাবে নৌকা চলেছে?

ভোবের দিকে ঘুম এল, স্বপ্ন দেখলাম। বাজবাড়ীর একতলাব অন্ধকাব ঘবে কালীশ্ববীব মৃতদেহ উঠে দাঁড়িয়েছে, মাথা মুখ সাবা শবীব রক্তে ভেসে যাচ্ছে। মাথা নেড়ে সে কী ভীষণ হাসি! মাতালেব মতো টলতে টলতে মৃতদেহ এগিয়ে চলল, আমিও যেন এক অদৃশ্য শক্তিব টানে পেছনে চললাম। উঠানে নেমে ওপবেব দিকে তাকিয়ে দেখলাম অনেক উঁচুতে অন্ধকাব আকাশেব তলায় গড়েব ছাতেব প্রাচীবেব ওপব একটা অসুস্থ, বিবর্ণ মুখ। হঠাৎ একটা দমকা হাওয়াব মতো হাসিতে মুখটা কী রকম অদ্ভুত হয়েই মিলিয়ে গেল। সামনেব দিকে চেয়ে দেখলাম বিবাট ভাঙা বাড়ী সবে গিয়ে পথ কবে দিচ্ছে। টলতে টলতে মাথা নেড়ে, এদিক ওদিক পা ফেলে চলেছে কালীশ্বরীর মৃতদেহ। যেন কোন প্রেতাত্মা ভব কবেছে! সামনে এল-ডাইনীব খাল। একটা কুৎসিত হাসিতে মৃতদেহটা থরথর করে কেঁপে খালের জলে ঝাঁপিয়ে

জলের তলায় একসঙ্গে কারা যেন হাত

ঘুম থেকে ঠেলে তুললেন লাহিড়ি। "বিভূতি, ওঠো, এখনি রাজবাড়ীতে যেতে হবে। সৌদামিনীর আবার অসুখ হয়েছে।"

তাড়াতাড়ি উঠে কোনো মতে চা-টুকু শেষ করেই বেরিয়ে পড়লাম। লেহায়ের কাছে জানা গেল শেষ রাতে সৌদামিনী খুব অসুস্থ হয়ে পড়েন। মুনিয়া তাঁর ঘরেই মেঝেয় শুয়ে ছিল, হঠাৎ কিসের শব্দে জেগে উঠে দেখে সৌদামিনী মেঝের ওপর পড়ে আছেন। বোধ হয় অসুস্থ অবস্থায় খাট থেকে নেমে আসতে গিয়ে পড়ে গেছেন। লেহাই সিঁড়ির কাছে শুয়েছিল। ওরা সৌদামিনীকে বিছানায় তুলে শুইয়ে দেয়। ওরা আর ঘুমোয়নি, ভোরের জন্য অপেক্ষা করছিল। সকাল হতেই মুনিয়াকে রেখে লেহাই এসেছে খবর দিতে।

আমি জিগ্‌গেস করলাম, "সৌদামিনী আছেন কেমন?"

লেহাই জানাল যে তিনি এখনো প্রায় অজ্ঞানের মতোই হয়ে আছেন। মাঝে মাঝে চোখ খুলে দু-একটা কথা বলছেন, কিন্তু কিছুই বোঝা যাচ্ছে না।

আমরা চুপ করে এগোতে লাগলাম বনের পথ দিয়ে। পেছনে একজন চৌকিদারও আসছে। নানা চিন্তায় মনটা ভার হয়ে আছে। বার বার স্বপ্নের কথা মনে হল। অনেক চেষ্টা করেও কালীশ্বরীর রক্তে ও হাসিতে বিকৃত মুখ ভুলতে পারলাম না। বুঝলাম ঘুমের ঘোরে এ সবই বিকৃত কল্পনার সৃষ্টি। তবু মনে অস্বস্তি হতে লাগল। কাল রাতের ঝড়ে আরো কয়েকটা গাছ ভেঙে পড়েছে। বৃষ্টি নেই, কিন্তু গাছের ভিজে পাতা থেকে আমাদের মাথায় টপ্‌টপ্‌ করে জলের ফোঁটা ঝরছে। সমস্ত বনভূমি নিস্তব্ধ: শুধু ভেজা ঘাসে আমাদের পায়ের শব্দ আর

আমি বললাম: "কারণ নিশ্চয় আছে, আমবা এখনো জানতে পারিনি। আমরা এখনো তো কিছুই জানতে পাবিনি।"

লেহাই কুয়োব ধারে বসে ছিল। তাকে ডেকে এনে অনেক জেরা করা হল, কাফু্র্ব সম্বন্ধেও অনেক কথা জিগ্‌গেস কবলাম। শুধু জানা গেল কাফু্র্ মাতাল ও বদমেজাজি লোক ছিল। কিন্তু কালীশ্ববী তাকে খুব পছন্দ কবতেন।

লাহিড়ি টর্চেব আলোয় ঘবটা ভালো কবে দেখলেন। এক কোণে কতগুলো আবর্জনা জড়ো হয়ে আছে, একটা ভাঙা তক্তা-পোষেব ওপব কয়েকটা ভাঙা চেয়াব, একটা টেবিল ও খাটিয়া। ঘবে ভিজে স্যাঁতসেঁতে গন্ধ। একদিকেব দেয়ালে মেঝে থেকে খানিকটা ওপরে একটা লোহাব দরজা, বোধ হয় আগেকাব দিনের বড়ো দেয়াল-সিন্দুকেব। হাতলটা ভাঙা, চেষ্টা কবেও দবজা খোলা গেল না। ধুলোয় অনেক পায়ের দাগ, কিন্তু কোনো দাগই স্পষ্ট নয়। আরো অনেক দাগ দেখলাম—যেন একটা ভাবি জিনিষ এদিক-ওদিক টেনে নিয়ে যাওয়া হয়েছে।

ঘবেব কোণে একটা ছোট লণ্ঠন তখনো মিট্‌মিট্ কবে জ্বলছে। কাফু্র্ব বিছানাও একদিকে পড়ে আছে, তার ওপর বয়েছে লাস-ঢাকা কাপড়খানা। আমার কাল বাত্রের কথা মনে পড়ল। যখন বাংলোয় আমরা শুয়েছিলাম তখন এই ঘরে লণ্ঠনের ময়লা আলোয় না জানি কী ব্যাপাবই ঘটেছে! মনে পড়ল স্বপ্নের কথা: কী অদ্ভুতভাবে কালী-শ্বরীর মৃতদেহ দাঁড়িয়ে উঠেছিল! ভৌতিক ব্যাপার নাকি? একটা অজানা ভয়ে শরীরে কাঁটা দিয়ে উঠল।

...ন: "চলো, কুয়োটা দেখি। এইখানেই

পড়েছিল না? হয়ত কুয়োর ভেতরেই কেউ ফেলে দিয়েছে।" উঠানের ওপর প্রায় শুয়ে পড়ে লাহিড়ি কুয়োর ভেতরে টর্চের আলো ফেললেন। লেহাই বলেছিল কুয়োটা ব্যবহার করা হয় না। এ কথা ঠিক: টর্চের আলোয় কাদা-গোলা জল চক্‌চক্ করে উঠল—সামান্য জল, আর কিছুই নেই। লাহিড়ি নিরাশ হয়ে বললেন: "না, এখানে আর কিছু দেখবার নেই। বরং চলো বাড়ীর ভাঙা অংশটা ভালো করে দেখা যাক।"

নাটমন্দিরের পেছনে একটা ছোট উঠান, তার শেষ থেকেই ভাঙন ধরেছে। তিন-চারটা মহল একেবারেই ভেঙে পড়েছে। এই ধ্বংসস্তূপের মধ্যে দাঁড়িয়ে বেশ বোঝা গেল এখানে খুনের সূত্র খুঁজে বেড়ানোর কোনো মানেই হয় না। তবু অনেকক্ষণ আমরা ঘুরে ঘুরে দেখতে লাগলাম। কতো যে ঘর তার আর সংখ্যা নেই! ছাত পড়ে গেছে, দেয়াল ঝুলে আছে। এখানে চলা-ফেরা খুবই বিপজ্জনক।

একটা ঘরের পেছন থেকে রবিশঙ্কর চেঁচিয়ে উঠল। আমরা তাড়া-তাড়ি সেখানে গেলাম। ছাতটা ধ্বসে পড়েছে, এক দিকের দেয়ালও গেছে, রবিশঙ্কর এক কোণে দাঁড়িয়ে মন দিয়ে শুনছে। ইসারায় সে আমাদের এগিয়ে আসতে বলল। "শুনতে পাচ্ছ না?"

লাহিড়ি বললেন: "হাঁ, মেঝের তলায় জলের শব্দ।" আমিও শুনতে পেলাম।

রবিশঙ্কর বলল: "সৌদামিনী বলেছিলেন যে বাড়ীর তলায় অনেক সুড়ঙ্গ আছে। মনে পড়ছে?"

লাহিড়ি বললেন: "হয়ত এইরকম কোনো সুড়ঙ্গের মধ্যে খালের জল ঢুকেছে। ঘরের তলায় নিশ্চয় কোনো সুড়ঙ্গ আছে।"

"যে রকম করেই হোক এ সুড়ঙ্গ আমাদের খুঁজে বার করতে হবে," আমি বললাম। লাহিড়িরও সেই ইচ্ছা। কিন্তু রবিশঙ্কর বিশেষ উৎসাহ দেখাল না। সে বলল সুড়ঙ্গ নিশ্চয় অনেক আছে কিন্তু এই ধ্বংসস্তূপের মধ্যে আজ আর খুঁজে বিশেষ লাভ হবে না। অনেক দেরিও হয়ে গেছে। আমরা তখন চললাম খালের ধারটা দেখতে।

অতিকষ্টে ইট-কাঠের অরণ্য পার হয়ে খালের ধারে এসে দাঁড়ালাম। জলের স্রোত রাজবাড়ীর গা ঘেঁসেই প্রায় চলেছে, সুড়ঙ্গের মধ্যে জল ঢোকা খুবই স্বাভাবিক। সেইজন্যই হয়ত একতলার অনেকগুলো ঘ' এতো ভিজে। খালের ওপারে ঘন বন, কিছুই দেখা যায় না। যে কোনো লোক সাঁতার দিয়ে ওপারের বনের ভেতরে পালিয়ে যেতে পারে। কিন্তু খালের জলের দিকে তাকালে ভয় করে। স্বপ্নের কথ আবার মনে পড়ল। জলের তলা থেকে কারা যেন হাতছানি দিয়ে ডাকছিল। কার ডাক এল ? সূর্যনারায়ণের—এই খালের ধারের শ্মশানে যাঁর মৃতদেহ পড়েছিল ? হয়ত সেই কালো মেয়ে—যাকে সৌদামিনী দেখে ছিলেন—ডেকে নিল জলের তলায়। আকাশে মেঘ পুরু কালো কম্বলের মতো বিছিয়ে পড়ল। ছায়া পড়ল খালের জলে, কালো জল হল আরে কালো। ওপারের বন থেকে হাওয়া উঠছে। যেখানে জলের স্রোত বেঁকে গেছে তার ওপারে আর বন নেই, ধূ-ধূ করছে বৈরাগীর মাঠ। আমর তাড়াতাড়ি খালের ধার থেকে ফিরে এলাম।

নাটমন্দিরের উঠানে আসতেই চৌকিদারটি লাহিড়িকে বলল যে খানিকক্ষণ আগে থানা থেকে লোক এসে বলে গেছে তাঁকে শীঘ্র যেতে। কলকাতা থেকে একজন ইন্স্পেক্টর্ এসেছেন জরুরি খবর নিয়ে লেহায়ের কাছে শুনলাম সৌদামিনী এখন একটু ভালো আছেন, ঘুমিয়ে

পড়েছেন। চৌকিদারকে বাড়ীর ওপব নজব রাখতে বলে আমবা থানায় ফিবলাম।

আহারাদির পর লাহিড়ি বললেন যে তাঁকে এখনি বেবোতে হবে বিশেষ কাযে কলকাতার ভদ্রলোকটিকে সঙ্গে নিয়ে। মাইল দশেক দূবে একটা ডাকাতি হয়েছে। একজন লোক ধবা পড়েছে, তাব কাছে আফিম ও কোকেনেব ঘাঁটিব খবব পাওয়া যেতে পারে। ডাকাতিবও তদন্ত কবতে হবে। দু-একদিনেব মধ্যে ফিবে আসাব সম্ভাবনা কম। আমাদেব যথেষ্ট উপদেশ দিয়ে তিনি চলে গেলেন।

কাল বাতে মোটেই ঘুম হযনি, আজ পবিশ্রমও হয়েছে খুব। প্রায় সন্ধ্যা পর্যন্ত ঘুমিয়ে নিলাম, বাত্রে বাজবাড়িতে পাহাবা দেব। সন্ধ্যাব আগেই কিছু খেয়ে বেবিয়ে পড়লাম। শিলা হয়ত কালভোবে আসবে, লাহিড়ির বেয়াবাকে বলে গেলাম সে যেন ভোব বেলায় ষ্টীমাব ঘাট থেকে শিলাকে বাংলোয় নিয়ে আসে।

পিসিমার সঙ্গে প্রায় হাতাহাতি করে শিলা এসে উঠল মোটরে, সঙ্গে ভজুয়া। মোটর ছুটল ষ্টীমার ধরতে।

দয়াময়ী রাগ করে বললেন : "যাচ্ছ যাও, কিন্তু কোমরের ব্যথাটি কম্‌লেই আমিও যাব নৈহাটিতে।" নৈহাটিতে তাঁর শ্বশুরবাড়ী, সেখানে যাবার কথা রাগ হ'লেই বলে থাকেন। অল্প বয়সে বিধবা হয়ে ভায়ের বাড়ীতে আছেন। ছেলেপুলে নেই, মা-মরা ভাইঝিটিকে মানুষ করেছেন। ছোট্ট মেয়েটি বড়ো হল, হল বিত্তের জাহাজ। দয়াময়ী আনন্দে কেঁদেই অস্থির। শিলা এখন বড়ো হয়েছে, বিয়ে করে সংসারী হোক। কিন্তু তার সেদিকে মন দেখা যাচ্ছে না। খালি ঘুরে বেড়াবার সখ। না, নৈহাটিতে এবার তিনি যাবেনই : দেওর অনেকদিন থেকে লিখছে।

ষ্টীমারে শিলা চিঠিটা আবার ভালো করে পড়ে ভাবতে লাগল। খুনের সময় বাড়ীতে কে ছিল? কালীশ্বরী একাই ছিলেন। কার্ফু, লেহাই, মুনিয়া, সৌদামিনী—এদের কারো দ্বারা খুন হওয়া স্বাভাবিক নয়, কিন্তু অসম্ভবও নয়। ষ্টীমার-ঘাটের লোকটা কে?

খুন হল কেন? কালীশ্বরীর জীবনে নিশ্চয় কোনো গোপন রহস্য আছে, খুনের কারণ সেইখানে। কালীশ্বরী কেন কা'কেও বাড়ীর ভেতরে থাকতে দিতেন না? সৌদামিনীই বা হঠাৎ এরকম অসুস্থ হয়ে পড়লেন কেন? এঁরা দুজনেই কিছু অস্বাভাবিক। অবশ্য এরকম বাড়ীতে দিনের পর দিন একা থাকলে যে কোন লোকের মন অস্বাভাবিক হবেই। মৃতদেহটা কুয়োর ধারে পড়ে ছিল কেন?

শিলা ভাবতে লাগল গালে হাত দিয়ে। জল কেটে ষ্টীমার চলেছে

দুই তীরের গাছপালাকে পেছনে ফেলে। রেলিঙের ওপর ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে ভজুয়া। হাওয়ায় শিলার চুল উড়ছে। হঠাৎ তার মুখে একটা চমক এল। থাক্, সে এখন কিছু বলবে না।

ষ্টীমার ছুটে চলল। ডেক্-চেয়ারে শুয়ে নিবিষ্ট মনে শিলা সেন মাথার কাঁটা দিয়ে নথ খুঁটতে লাগল।

সন্ধ্যার পর রাজবাড়ীতে এসে পৌঁছলাম। আজ সারাদিন বৃষ্টি প্রায় পড়েনি, ঝড়ও বিশেষ ছিল না। আকাশও অনেকটা পরিষ্কার। শুধু ভিজে হাওয়ায় একটু অস্বস্তি লাগছে। এক ফালি চাঁদ উঠেছে, তার মলিন আলোয় রাজবাড়ীটাকে কেমন অদ্ভুত দেখাচ্ছে। অচেনা জায়গায় চাঁদের আলোয় দাঁড়িয়ে বার বার মনে হল আমরা যেন জোর করে এই বাড়ীতে অনধিকারপ্রবেশ করছি।

আর একটা কথা মনে হল: যে অদ্ভুত রোমাঞ্চকর নাটকের অভিনয় চলেছে আমাদের সামনে তাতে এই রাজবাড়ী শুধু পটভূমি নয়, যেন একটি প্রধান চরিত্র। দীর্ঘ অতীতের স্মৃতি নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে এই জরাজীর্ণ প্রাসাদ। কালীশঙ্কর, শিবনারায়ণ, বাসবনারায়ণ, তাঁর ছেলেরা, কালীশ্বরী, সৌদামিনী, কাফু—এরা যেন পুতুল। এদের নাচিয়ে চলেছে এই বাড়ী অদৃশ্য অঙ্গুলিসঞ্চালনে, নির্মম হাতে ঠেলে নিয়ে চলেছে একটির পর একটি চরিত্রকে ভয়ানক ধ্বংসের দিকে। তারপর একদিন কোনো এক দুর্যোগের রাতে এই বাড়ী ধ্বসে পড়বে, কয়েক শতাব্দীর মূক রহস্যকে মাটির পৃথিবী নিজের বুকে টেনে নেবে।

গড়ের দোতলায় উঠে এলাম। সৌদামিনী তখনো ঘুমিয়ে আছেন দুনিয়ার কাছে শুনলাম। সারাদিন তিনি সামান্য একটু দুধ খেয়েছেন। শরীর এখনো বেশ দুর্বল। লেহাই আর দুনিয়া আমাদের জন্য কোথা থেকে দুখানা ইজিচেয়ার এনে দিল ঘরের সামনের দালানে। দুনিয়া আহারাদির পর এসে ঘরের মেঝেয় শুল। আমরা লেহাইকে চৌকিদারের সঙ্গে লণ্ঠন নিয়ে উঠানের ঘরে থাকতে বললাম। ঠিক হল বারোটার পর আমরা নিচে যাব, তখন সে ঘুমোবে, তার আগে নয়।

সৌদামিনীর ঘরে এক কোণে লণ্ঠন জ্বলছে : খাটের ওপর অন্ধ
শুধু দূর থেকে বোঝা যায় তিনি শুয়ে আছেন।

রবিশঙ্কর বলল সে আজ সকালে কুয়োর একটা বৈশিষ্ট্য
করেছে। লাহিড়ির সামনে কিছু বলেনি, পাছে তিনি হেসে উ
দেন। সে বলল : "কঠিন বাঁধা কায করে পুলিসের লোকেদের ম
অবস্থা এমন হয যে তাঁরা কল্পনার ধার দিয়েও যান না। অবশ্য,
সময়ে দরকারও হয না। কিন্তু আমরা যে খুন নিয়ে তদন্ত করছি
সাধারণ ব্যাপার নয়, এখানে যুক্তি ও কল্পনার সমান প্রয়োজ
দুজনে মিলে অনেকক্ষণ পরামর্শ করলাম।

রাত প্রায় বারোটা হবে, এমন সময়ে সৌদামিনী একবার চীৎ
করে উঠলেন। ছুটে গিয়ে দেখলাম খুব অস্থির হয়ে পড়েছেন,
মাথার ভেতরে যন্ত্রণা হচ্ছে। চোখদুটি স্থির, যেন দৃষ্টিশক্তি
বিকারের ঘোরে জড়ানো গলায় হঠাৎ বলে উঠলেন : "ছোট বউ,
ছাড়ো, মরবে তুমি।" বুঝলাম সৌদামিনী কালীশ্বরীকে কথা
বলছেন—শরীর অস্বস্তিতে শিউরে উঠল। চোখদুটি আমাদের দিকে
এল, তারপর স্পষ্ট সহজ গলায় আওয়াজ : "আপনারা এ
কেন ?" প্রশ্নটা এতো আকস্মিক যে আমরা চমকে গেলাম। রবি
বুঝিয়ে দিল তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েছেন, তাই আমরা তাঁর
রয়েছি। আর কোনো কথা না বলে সৌদামিনী পাশ ফিরে শুয়ে ঘু
পড়লেন।

লণ্ঠনটা ঘরে রেখে বাইরে এলাম। কী রহস্য? সৌদা
কালীশ্বরীকে সাবধান করছিলেন কেন ?

ঘড়িতে দেখলাম বারোটা অনেকক্ষণ বেজে গেছে। জুনিয়ার

অতি কষ্টে তাকে তুলে বললাম সজাগ থাকতে : সৌদামিনীর শরীর প হয়েছে। কিন্তু সে জেগে থাকবে বলে মনে হল না। নিচে নেমে দেখলাম আকাশে মেঘ নেই, বড় বড় গাছের পাতার ফাঁকে এক চাঁদের মরা আলো গড়ের দরজার সামনে এসে পড়েছে।

নাটমন্দিরের উঠানে এসে দেখি ঘরে লেহাই ঘুমিয়ে পড়েছে, দারটিও লণ্ঠন ও লাঠি পাশে রেখে ঢুলছে। পায়ের শব্দে উঠে য়ে সে জানাল যে সন্দেহজনক কিছুই তার চোখে পড়েনি। স্বাভাবিক, চোখ তার খোলা ছিল না! রবিশঙ্কর তাকে কূয়োর লণ্ঠনটা আনতে বলল। "তোমার পাগড়ি খুলে লণ্ঠনে বেঁধে র নিচে আলো নামাও।"

রবিশঙ্কব বলল : "বিভূতি, কূয়োর বৈশিষ্ট্য এখন ভালো করে লক্ষ্য ।"

লণ্ঠনের আলোয় কূয়োর ভেতরে অনেকটা দেখা গেল। "সত্যিই এটা তো সকালে দেখিনি!" কূয়োর গর্তটা খাড়া সোজাভাবে নিচে র ওঠেনি, যেন একদিকে ঝুঁকে উঠেছে। রবিশঙ্কব লোহাব আংটা-ও লক্ষ্য করতে বলল। দেখলাম দু সারি অনেকগুলো আংটা যেন ধাপে নিচের দিকে নেমে গেছে। এতো আংটা আব এইভাবে নো আংটা কূয়োয় থাকে না।

রবিশঙ্কর বলল : "অমব বাবু শুধু কূয়োর তলাটাব দিকেই লক্ষ্য ছেন। আর একটা কথা : কূয়োটা মোটেই গভীর নয়, মানে গভীর খোঁড়াই হয়নি। কূয়োটা ব্যবহার করা হোতো জলের জন্য নয়, কারণে। আমার বিশ্বাস এখানেই সুড়ঙ্গের একটা মুখ। এইজন্যই সুড়ঙ্গ খুঁজতে আমার বিশেষ উৎসাহ ছিল না।"

আমি একটু চুপ করে থেকে জিগ্‌গেস করলাম : "তাহলে এ কী করবে ?"

উত্তর এলো : "এই কুয়োর মধ্যে নামবো।"

মনটা একবার ভয়ে ও অস্বস্তিতে দুলে উঠল, তারপর এগি এলাম। চৌকিদারকে রবিশঙ্কর বুঝিয়ে দিল যে আমরা কুয়োয় নাম সে যেন লণ্ঠন নিয়ে বসে থাকে। যদি আমাদের ফিরতে দেরি তাহলে লেহাইকে থানায় পাঠিয়ে আরো চৌকিদার এনে আমা খোঁজ করবে। লোকটা ভয় পেয়ে আমাদের বার বার কুয়োর ম নামতে বারণ করল।

রাত তখন ঠিক একটা। সমস্ত বাড়ী নিস্তব্ধ, উঠানে চাঁ ম্লান আলো। রবিশঙ্কর টর্চ নিয়ে ঝুঁকে পড়ল : লোহার আংটায় দিলাম। নামতে লাগলাম—প্রথমে আমি, তারপর রবিশঙ্ক হঠাৎ জলকাদায় পা ডুবে গেল, বুঝলাম মাটিতে নেমেছি। দৃষ্ট ওপরের দিকে তাকালাম, মনে হল যেন অনেক উঁচুতে চৌকিদা ফ্যাকাশে মুখ ও হাতের লণ্ঠন। লণ্ঠনের হলদে আলোয় তার মু যেন অদ্ভুত দেখাচ্ছে। মনে হল চৌকিদারের মাথার ঠিক ওপর গড়ের ছাতের প্রাচীর আর তার গায়েই চাঁদ।

রবিশঙ্কর ঠেলা দিয়ে বলল : "বিভূতি সামনের দিকে চেয়ে দেখ টর্চের আলোয় দেখলাম সামনেই বুক-সমান উচু সুড়ঙ্গের গর্ত। কুয়ে ওপর থেকে এর অস্তিত্ব কিছুতেই বোঝা যায় না। মাথা নিচু ক রবিশঙ্কর সুড়ঙ্গের গর্তে ঢুকল। আমি আর একবার ওপরের দি চেয়ে তার পেছনে সুড়ঙ্গের মধ্যে ঢুকলাম : চেনা পৃথিবী মিলিয়ে গে

সৌদামিনী পাশ ফিরলেন, ঘুম ভাঙল। মাথার যন্ত্রণাটা আর
ই, কিন্তু মাথার ভেতরে কতগুলো চিন্তা পাক খাচ্ছে। ছোট বউ
হয়েছে, না? কে খুন করল? কে? কতো সাবধান করেছিলেন,
শোনেনি। বেশি কিছু বলতে পারেননি, ওকে ভয় হয়।
করলো কে? হঠাৎ একটা চিন্তা ঘুরতে ঘুরতে মাথার মধ্যে
য় গেল, হল একটা ছবি। সেই ছবির দিকে তাকিয়ে সৌদামিনীর
শাদা হয়ে গেল। না, না, তা কখনো সম্ভব নয়! সৌদামিনী
হাতে মাথা চেপে ধরলেন: চিন্তার চাকা আবার ঘুরছে।
নিস্তব্ধ থেকে খানিকক্ষণ পরে সৌদামিনী চোখ মেললেন।
য়ালের খানিকটা জায়গায় আলো পড়েছে। মুনিয়া বেশ ঘুমোচ্ছে।
দলেন। সেই ছেলেদুটি কোথায়? কেন এসেছে ওরা? মনে
ড়ছে, কথা শুনল না ওরা। বলেছিলেন খুনের তদন্তে কোনো
হবে না। তবু ওরা শুনলনা, ছোট বউও শোনেনি তাঁর কথা।
ন কোথায় সে? গভীর নিঃশ্বাস ফেলে সৌদামিনী ঘরের পেছনের
লানের দিকে তাকালেন, একদৃষ্টে তাকিয়ে রইলেন। মুখের বিবর্ণ
ব কেটে গেল, চলে গেল অসুস্থতার ছাপ। মাথার মধ্যে হাজার
ন্তার চাকা ঘুরছে তীব্র বেগে, শিরায় শিরায় রক্তের ঢেউ!
ৗদামিনী বিছানায় উঠে বসলেন। ইজিচেয়ার দুটো খালি—হঠাৎ
কথা মনে হল। না, আর সময় নেই, সময় নেই। বিছানা
কে নামবার জন্য সৌদামিনী পা বাড়ালেন। মাথার ভেতর
কোগুলো একসঙ্গে আর্তনাদ করে উঠল।

কেবিনের বিছানায় শিলা সেন পাশ ফিরল। হাতের বইটা

করে পাশেই রেখে পা দুটি ছড়িয়ে শরীরে একটা মোচড় দিল। সারাটি বিকেল ঘুমিয়েছে, এখন সহজে ঘুম আসবে কেন ?

চিঠিটা শিলা আরো দু বার পড়েছে, যতো বার পড়ে ততোই তার ভালো লাগে। শিলা চিঠিটা আবার খুলে পড়তে পড়তে এক জায়গায় এসে থামল : মুখে তার বিস্ময়ের ছাপ। চিঠিটা ফেলে সে বইয়ের পাতা ওলটাতে লাগল—এই বইখানাই সেদিন কলেজ ষ্ট্রীটের দোকান থেকে কিনেছে। বইয়ের একটা জায়গা পড়ে শিলা উত্তেজনায় বিছানার ওপর উঠে বসল।

কেবিনের বাইরে দরজার কাছে ভজুয়া সর্বাঙ্গ মুড়ি দিয়ে ঘুমোচ্ছে। তার নাকের শব্দ ষ্টীমারের ইঞ্জিনের আওয়াজকেও প্রায় ছাড়িয়ে গেছে। বাইরে চাঁদের আলো ষ্টীমারের ডেকে, নদীর জলে এসে পড়েছে। অচেনা জায়গায় চাঁদের আলোও যেন অচেনা লাগছে। শিলা চিঠিটা হাতে নিয়ে আবার সেই জায়গাটা পড়ল। করুণায় তার মুখ কোমল হয়ে উঠেছে।

আলো নিভিয়ে শিলা শুয়ে পড়ল—এবার ঘুমোবেই।

প্রায় দশ বারো হাত মাথা নিচু করে হাঁটবার পর সুড়ঙ্গের ছাত উঁচু হতে লাগল। সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে বুঝতে পারলাম জমি ঢালু হয়ে চলেছে। মাটি আলগা, ভিজে ; দুদিকের দেয়ালও স্যাঁতসেঁতে, ঠাণ্ডা ; দেয়ালে, ছাতে শ্যাওলা, এমন কি আগাছাও জন্মেছে। টর্চের আলোয় সামনের জমাট অন্ধকার ঠেলে আমরা এগোতে লাগলাম।

সুড়ঙ্গটা খুব বেশি চওড়া নয় : দুজন লোক ভালো করে একসঙ্গে যেতে পারে না। কয়েক মিনিট সোজা চলে দেখলাম রাস্তা আঁকাবাঁকা হতে আরম্ভ করেছে। পেছনের দিকে তাকালাম, সামনের অন্ধকার সরে গিয়ে পেছনে জমাট বেঁধেছে, তাকাতে ভয় করে। সাবধানে পা টিপে টিপে খানিকটা চলবার পর একটা গোল জায়গায় এসে পড়লাম : টর্চের আলোয় দেখলাম এর চারিধারে শাখা বেরিয়ে গেছে। সৌদামিনী ঠিকই বলেছিলেন, মাকড়সার জালের মতো সুড়ঙ্গটা ছড়িয়ে রয়েছে।

বিপদ হল : কোন পথে এগোবো ? রবিশঙ্কর ডান দিকের শেষ সুড়ঙ্গটা ধরে চলতে লাগল, কিন্তু খানিকটা এগিয়েই আমরা বুঝলাম এ পথে আর চলা যাবেনা। ছাত এক জায়গায় ধ্বসে পড়েছে, পথ বন্ধ। ফিরে এলাম গোল জায়গায়। আমি বললাম : "এসো বাঁ দিকের প্রথম গলিটা ধরো।" এতো সরু পথ যে চলতে বেশ কষ্ট হচ্ছে, দম বন্ধ হয়ে আসছে। টর্চের আলোয় দেখলাম খানিকটা দূরে ছাতের আগাছা নড়ছে। সাবধানে এগিয়ে এসে দেখলাম ভয়ের কিছু নেই, একটা গর্তের ভেতর দিয়ে ওপরের হাওয়া এসে আগাছায় নাড়া দিচ্ছে।

রবিশঙ্কর বলল : "বিভূতি, পথের বাঁক এলেই মনে রেখো, না হলে

এমন কোনো চিহ্ন নেই যা দেখে চিনে বাখা যায়। শুধু অঙ্কেব জোরে মনে রাখতে হবে। আবার ওপরে কোথা থেকে ফুরফুর করে হাওয়া নামছে। রবিশঙ্কর বলল : "বিভূতি, আমরা বোধ হয় রাজবাড়ীর ভাঙা অংশটাব তলায় এসে পড়েছি।"

আর একটু এগিয়েই দেয়ালের ওপব আছড়ে পড়লাম, পথটা এখানে হঠাৎ বেঁকে গেছে। কিন্তু আব বেশি দূব এগোতে হল না, টর্চেব আলোয় দেখলাম সুড়ঙ্গের দুপাশেব দেয়ালে সাবি সাবি কয়েকটা দবজা। দুজনে থমকে দাঁড়িয়ে পড়লাম : মাটিব তলায এই ঘবগুলিতে না জানি কী বহস্যই লুকিয়ে আছে! আলকাতবা মাখানো বহুপুবোনো ভারি দরজা : মবচে-ধরা মোটা মোটা তালা ঝুলছে। ববিশঙ্কব একটা দবজা ঠেলে ধবল, সামান্য একটু ফাঁকেব ভেতব দিয়ে এক ঝলক ঠাণ্ডা হাওয়া এসে আমাদের মুখে লাগল, শিউরে উঠলাম। সুড়ঙ্গের বাঁ দিকের দেয়ালে পর পর তিনটা দবজা। প্রথম দুটো দবজা ঠেলে ফাঁকেব মধ্যে আলো ফেলে কিছুই দেখা গেল না। তৃতীয় দবজাব সামনে এসে চমকে গেলাম, প্রায় নতুন আজকালকার তালা ঝুলছে। কিন্তু দবজা ঠেলে বিশেষ কিছু ফাঁক হল না।

হাতের ঘড়িতে দেখলাম প্রায় দুটো, একঘন্টা সুড়ঙ্গের গলিতে গলিতে ঘুরছি। ভয়ে-বিস্ময়ে মনটা ভাবি হয়ে উঠল। ববিশঙ্কবকে একবার বললাম : "চলো এবার ফেবা যাক।" সে কথা শুনল না। ডানদিকের দরজাগুলো দেখতে আবম্ভ করলাম। এদিকে চারটি দরজা, তাবপরেই পথ বেঁকে ঘুরে গেছে। প্রথম তিনটে দরজা ঠেলে কিছুই দেখা গেল না। শেষ দরজার দিকে পা বাড়িয়েছি, হঠাৎ সুড়ঙ্গ অন্ধকার হুংকার করবার আগেই রবিশঙ্কর বলল : "বিভূতি,

সামনের দিকে দেখ।" বুঝলাম সে ইচ্ছে করেই টর্চটা নিভিয়েছে। দেখলাম দরজার ফাঁক দিয়ে সুড়ঙ্গের অন্ধকারে আলো আসছে।

এই অন্ধকারের রাজ্যে মাটির তলায় নির্জন প্রেতপুরীতে এ আলো কেন? উদ্বেগে যেন দম বন্ধ হয়ে গেল। কাল রাতের স্বপ্নের কথা মনে হল, মনে হল এ বাড়ীর সব কিছুই রহস্যময়। একবার ভাবলাম এখনো সময় আছে ফিরে যাবার, কিন্তু কৌতুহলও হল। অতি সাবধানে রবি-শঙ্কর দরজাটা ঠেলল, ফাঁকেব মধ্য দিয়ে দেখলাম ঘরটা অন্ধকার। কিন্তু ঘরের অপর দিকের দেয়ালে একটা দরজা অনেকটা খোলা, সেখান থেকে আলো আসছে। বোঝা গেল পিছনে আর একটা ঘর রয়েছে।

রবিশঙ্কর চাপা গলায় বলল: "বিভূতি, আমার পাশে এসে দেখ।" পেছনের ঘরে নিশ্চয় কোথায় একটা লণ্ঠন বসানো আছে: ঘরের দেয়ালে একটা লম্বা ছায়া পড়ল প্রায় ছাত পর্যন্ত। দেয়ালের একধারে কতকগুলো কাঠের বাক্স সাজানো রয়েছে। মাথায় হাজার চিন্তা তাল-গোল পাকাতে লাগল, মাথা ধরে উঠল এই বদ্ধ জায়গায় দাঁড়িয়ে। ঘরগুলোয় কী আছে? কারা ব্যবহার করে? কেন? কোথা দিয়েই বা এরা আসে? কাফ্রি কি এদেরই দলের লোক? একবাব মনে হল কাফ্রিই বোধ হয় এ ঘরে আছে। কিন্তু দরজায় বাইরে থেকে তালা লাগানো কেন? হয়ত কালীশ্বরীর মৃতদেহ এই ঘরেই লুকোনো আছে। একটা বিশ্রী গন্ধও নাকে এল। উত্তেজনায় শরীর কাঁপতে লাগল। কারো মুখে কথা নেই, নিশ্চল হয়ে দাঁড়িয়ে দেখছি। জমাট অন্ধকারের মধ্যে ছুরির ফলার মতো শুধু এক ঝলক আলো। কানে আসছে ঘড়ির টিক্‌টিক্ শব্দ।

হঠাৎ রবিশঙ্কর কাঁধে হাত রাখল। "বিভূতি, শোনো।" হুদূরে কোথা থেকে বাঁশীর শব্দ আসছে। ভয় হল: যদি কেউ {ড়ঙ্গের মধ্যে এগিয়ে আসে। কালীশ্বরীর মতো নিষ্ঠুর মৃত্যু আছে াকি অদৃষ্টে? যে আসছে বাঁশীব আওয়াজেব সঙ্গে সে যদি কোনো প্রতাত্মা হয়! হয়ত কালীশ্বরীর মৃতদেহই এগিয়ে আসছে: মুখে সই কুৎসিত হাসি, সেই বিশ্রী চলার ভঙ্গী! বাঁশীর সুরটা অদ্ভুত, নে যেন কল্পনায় বিষণ্ণ ছবি জেগে ওঠে: জলাভূমিব ওপব মেঘেব ায়া পড়েছে, চাবদিকে অন্ধকার, নলখাগড়া-বনের দমকা হাওয়া াডার খুলিতে অবসন্ন উদাস সুব তুলে চলেছে। বাঁশীব শব্দ ধীবে াবে মিলিযে গেল।

দূবে একটা দবজা খোলাব আওয়াজ হতেই পেছনেব ঘবেব দয়ালে একটা ছায়া লাফিয়ে উঠল। টর্চ জেলে দেখলাম সুড়ঙ্গের ধ্যে কেউ নেই। যে দরজাব সামনে দাঁড়িয়ে ছিলাম তাব ওপব গালো পড়তে চমকে গেলাম। এতোক্ষণ অন্ধকাবে চোখে পড়েনি! াড়ো অক্ষবে সাদা খড়িতে লেখা: এই দবজা।

রবিশঙ্কর বলল: "এব মানে?" চুপ করে বইলাম। দুজনেই াবার লেখাটা ভালো করে দেখলাম, মনে হল কা'কে যেন এই দবজা দিয়ে ঢোকবাব ইঙ্গিত করা হচ্ছে। লেখাব পাশে খড়িব আবো তকগুলো আঁচড় রয়েছে, বুঝলাম না, কিন্তু মনে হল এবও অর্থ আছে। বিশঙ্কর হাফ্-প্যান্টের পকেট থেকে এক টুকবো কাগজ বাব করে পন্সিল্ দিয়ে আঁচড়গুলো এঁকে নিল। পবে ভেবে দেখা যাবে।

টর্চ নিভিয়ে দিয়ে শুনলাম পেছনেব ঘরে শব্দ হচ্ছে। দরজার

দয়ালের দিকে এগিয়ে গেল, হাতের

বাক্‌সটা নামিয়ে রাখল। তার পেছনে আর একটা লোক, এর কাঁধে একটা লম্বা বাক্‌স। সে বাক্‌সটা নামিয়েই চলে গেল। প্রথম লোকটা লণ্ঠন নিয়ে এসে লম্বা বাক্‌সের ডালাটা খুলে ফেলল লণ্ঠনের আলোয় তার মুখটা এবার দেখা গেল।

দুজনে এক সঙ্গে চমকে উঠলাম। লোকটা এক চীনে কুলি: মুখে ভীষণ বসন্তের দাগ, একটা কান কুঁকড়ে আছে, চুল ছোট করে ছাঁটা। একটা চোখও নষ্ট হয়েছে, বোধহয় বসন্তেই। এতো কুৎসিত মুখ সহজে চোখে পড়ে না। পরণে নীল পাজামা, গায়ে কিছু নেই। দেখেই বোঝা যায় গুণ্ডা গোছের লোক। টলতে টলতে চীনেটা ঘরের অন্য দিকে চলে গেল, একটা দরজা বন্ধ করার শব্দ হল। বুঝলাম ঘর থেকে বেরোবার অন্য পথও আছে।

লোকটা ফিরে এসে বাকসের ভেতর থেকে কী যেন দু হাতে তুলল। প্রথমটায় চোখে আড়াল পড়ায় ভালো করে দেখতে পাইনি; তারপর লণ্ঠনের আলোয় স্পষ্ট দেখা গেল। শরীর কেঁপে উঠল, দেখলাম একটা কুৎসিত বিকলাঙ্গ ছেলের দেহ। চোখ নেই, সে জায়গায় কালো কালো মাংসের ডেলা। দাঁতগুলো খুব ছোট, দূর থেকে করাতের মতো দেখাচ্ছে। পায়ের কাপড় সরে যেতেই দেখা গেল পা-দুটো প্রায় কাঁধের তলা থেকেই নেমেছে। ডাক্তারি বইতে অনেক বিকলাঙ্গ মূর্তির কথা পড়েছি, কিন্তু চোখে এ রকম বীভৎস চেহারা দেখিনি। দেহটা একটু একটু কাঁপছে, বুঝলাম কোনো মাদক ওষুধের ফলে এ রকম হয়েছে। কিন্তু সবচেয়ে ভয় হল যা দেখে। সেটা হচ্ছে ছেলেটার মুখের শয়তানি হাসি, মুখের পাশবিক বিকৃতি। চীনাটা একটু হেসে ছেলেটাকে শুইয়ে দিল, বাক্সের ডালা খোলাই

রইল। লণ্ঠনটা হাতে নিয়ে সে চলে গেল। একটু পরেই দরজা বন্ধ হওয়ার শব্দের সঙ্গেই ঘর অন্ধকার হয়ে গেল।

টর্চ জ্বেলে রবিশঙ্কর বলল: "চলো বিভূতি, দেখি এ ঘরে ঢোকার অন্য কোথায় পথ আছে।"

আমার দেহমন বিদ্রোহ করে উঠল, বললাম: "শঙ্কর, এক রাত্রের পক্ষে যথেষ্ট কায হয়েছে, আর নয়। চলো, এবার ফিরি, ফিরতেও তো সময় লাগবে। আর বেশি এগোলে হয়তো পথ হারিয়ে ফেলব।" পথ-হারানোর কথা মনে হতেই বুকের ভেতরটা ঠাণ্ডা হয়ে গেল।

কিন্তু রবিশঙ্করের তখন জেদ হয়েছে, সে চলল, আমিও বাধ্য হয়ে এগোলাম। আবার বললাম: "শঙ্কর, এখনো ফেরো।"

আবার সুড়ঙ্গের আঁকাবাঁকা পথ, জায়গায় জায়গায় আগাছার ঝোপ। এ পথে লোকচলাচল ঘটে বোঝা গেল, মাঝে মাঝে মাটিতে ছোট বড় পায়ের দাগ। এক জায়গায় সুড়ঙ্গের দেয়ালের গা দিয়ে ফোঁটা ফোঁটা জল গড়িয়ে পড়ছে। প্রতি মুহূর্তেই মনে হতে লাগল এখনি হয়ত কে এসে সুড়ঙ্গের পথ আগলে দাঁড়াবে। যদি স্বপ্নে-দেখা সেই মৃতদেহ···সে বীভৎস মূর্তি আবার দেখবার কথা ভাবলেও ভয় হয়।

পথটা একটা বাঁক নিয়েছে, হঠাৎ পায়ে পাথরের চোট লেগে আছড়ে পড়লাম। রবিশঙ্কর টর্চ নিয়ে ঘুরে দাঁড়াল। "কি, বিভূতি, লেগেছে?" মাটি থেকে উঠতে যাব, মনে হল দূরে কে যেন দাঁড়িয়ে। মুখ দিয়ে একটা অস্পষ্ট স্বর বেরিয়ে গেল। রবিশঙ্কর তাড়াতাড়ি ঘুরেই আলো ফেলল—এক মুহূর্তের জন্য বাঁকের মুখে একটা শাদা মূর্তি দেখা গেল, তারপর শুধু শ্যাওলায় ঢাকা সুড়ঙ্গের দেয়াল!

"বিভূতি, চলো।" রবিশঙ্কর পাগলের মতো বেপরোয়া

হয়ে ছুটতে লাগল, আমিও তার পেছনে। তারপর আরম্ভ হল সে রাত্রির ভয়াবহ দুঃস্বপ্ন : সরু পথ দিয়ে ছুটে চলেছি দুজনে, পথ আর শেষ হয় না! পড়ছি, উঠছি, আবার ছুটে চলেছি নেশার ঘোরে, আগাছায় শরীর ছড়ে যাচ্ছে। বাঁকে বাঁকে পায়ের শব্দ, যেন আমাদের আগে আগে পালিয়ে চলেছে! শুনেছি আলেয়ার আলো অন্ধকার রাতে পথিককে পথ ভুলিয়ে মৃত্যুর পথে টেনে আনে। আমাদেরও হল তাই এক মুহূর্তের দেখা এক মূর্তি মুহূর্ত থেকে মুহূর্তে, জীবন থেকে মৃত্যুতে টেনে নিয়ে চলল। ক্লান্তিতে পা আর চলে না, সুড়ঙ্গের মায়াজালে কোথায় যে পথ হারিয়ে গেল তার ঠিকানা নেই। তবু চলেছি। হে ঈশ্বর, দুঃস্বপ্নের শেষ করো। মনে হল ওপরের মাটি ফেটে যাক, ওপরের পৃথিবীর আলো-হাওয়া নেমে আসুক এই সুড়ঙ্গে, উড়িয়ে নিয়ে যাক বহু বছরের অন্ধকার, পুঞ্জিত বিষ-বাষ্প। ছুটে চললাম বিভীষিকার মধ্য দিয়ে, মনে শুধু যান্ত্রিক আশা যে এইবার বোধ হয় পথ শেষ হবে।

চলতে চলতে মনে হল অন্ধকার যেন ক্রমেই বেড়ে চলেছে, যেন ঘন হয়ে আমাদের ঘিরে ফেলছে। টর্চের আলোয় অন্ধকার আর দূর করা যায় না। হঠাৎ হাতের টর্চের দিকে তাকিয়ে রবিশঙ্কর চেঁচিয়ে উঠল : “বিভূতি, আলো ফুরিয়ে এসেছে।”

তারপরেই টর্চ নিভল। সঙ্গে সঙ্গে দূরে বাঁকের মুখে জেগে উঠল একটা ধূর্ত হাসির কলরোল। চিন্তার ক্ষমতা আর নেই, সময়ও নেই। চারদিক থেকে ঢেউয়ের মতো অন্ধকার আমাদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল, দেহ মন যেন অন্ধকারে ভরে গেল। থর্‌থর্ করে কাঁপতে কাঁপতে দুজনে বসে পড়লাম। পৃথিবীর সূর্য নিভে গেছে, এবার আসুক কুৎসিত মৃত্যু, তিলে তিলে ভয়াবহ মরণ

চৌকিদার রামভকত্ আজ বহুদিন পুলিসে কায করছে। ছাপরা জেলায় বাড়ি। ঘরে ভঁইস্ আছে, বোঙ্ আছে। কিছুদিন আগে দুটো ভাগলপুরী গরুও কেনা হয়েছে উপরির পয়সায়। একটা লেড়কি ছিল, মারা গেছে। দুঃখ নেই তার জন্য রামভকতের, ভগওয়ান্ আবার দেবেন।

অনেকদিন থেকেই একবার দেশে যাবার ইচ্ছে, কিন্তু লাহিড়ি সাহেব বারণ করছেন, বলছেন: "রামভকত্, তোমাকে ছাড়া আমার এখন চলবে না। মিশির, তেওয়ারি, সীতারাম—এদের কারো তোমার মতো সাহস নেই।" রামভকত লাঠিটা একবার কুয়োর ধারে ঠুকে নিল। তবে দুঃখের কথা, তাকে এখনো জমাদার করা হচ্ছে না। মনের কষ্টে রামভকত খৈনি টিপতে লাগল।

বাবুরা কখন ফিরবেন কে জানে? পেছনে তাকিয়ে সে দেখল ঘুটঘুটে অন্ধকার। চারদিক নিস্তব্ধ, আকাশে চাঁদও দেখা যাচ্ছে না। রামভকত্ লণ্ঠনের আলোটা একটু বাড়িয়ে একবার ডাকল: "লেহাই!" নিজের গলার শব্দে নিজেই চমকে উঠল। না, জায়গাটা ভালো ন। কুয়োর ধারেই খুন হয়েছে, লাস্ ভি হারিয়ে গেছে, এক আদমি, পত্তা নেই।

রামভকতের গা ছম্‌ছম্ করতে লাগল। ভয় তার নেই, তবে ভূতে কথা আলাদা! ভূতের কাছে মানুষ সাহস দেখিয়ে কী করবে, রামভকত্ একবার ভাবল লেহায়ের কাছে উঠে যায়। কিন্তু বাবুরা এ যদি কুয়োর তলা থেকে আলো না দেখতে পায় তাহলে রেগে যা, লাহিড়ি সাহেবকে বলে দেবে। আবার সে ডাকল: "এ ভেইয়া,

লেহায়ের সঙ্গে তার বেশ ভাব হয়েছে, লেহায়ের ভগ্নীপতি তার বৌয়ের মামা!

কোনো সাড়া এল না। লাসের কথা আবার রামভকতের মনে হল। হিন্দুর লাস পোড়ানো হয়নি, শেষে না ভূত হয়ে যায়! এই চিন্তাটাতেই রামভকতের হাত-পা ঠাণ্ডা হয়ে এল! ভূত! যদি পেছন থেকে আসে? আর একবার লেহাইকে ডাকবার চেষ্টা করল গলার আওয়াজ তেমন খুলল না, গলা শুকিয়ে গেছে।

হঠাৎ অন্ধকার ঘরের মধ্যে কিসেব যেন আওয়াজ হল। প্রথমে সে মনে করল বোধহয় লেহাই ঘুমের মধ্যে পাশ ফিবেছে। আবার আওয়াজ, কে যেন পা টিপে ঘরের মধ্যে চ.লছে! ভয়ে রামভকত্ মাথাটি হাঁটুছুটোব মধ্যে গুঁজে বসে রইল। পেছনে অন্ধকার ঘরের কথা মনে হওয়ায় তার পিঠটাও শিউরে উঠল। পায়ের আওয়াজ এগিয়ে আসছে—আরো·········আরো! ঘাড়ের ওপর কার নিঃশ্বাস পড়ছে। ছুটো ঠাণ্ডা হাত হঠাৎ তাব গলা চেপে ধরল, শিরাগুলো যেন একসঙ্গে মাথার মধ্যে লাফিয়ে উঠল। কোনো শব্দ না করে রামভকত্ উঠানের ওপর গড়িয়ে পড়ল, তার পা লেগে লণ্ঠনটা কূয়োর তলায় জলকাদায় পড়ে নিভে গেল।

আমরা যে ঘুমের মধ্যে একেবারে অচৈতন্য হয়ে পড়ি না তা অনেক ময়ে বেশ বোঝা যায়। ঘুমের মধ্যেই হঠাৎ স্মৃতিব চমক লাগে, নে পড়ে যে আজ খুব ভোরে ওঠার কথা আছে। ঘুমেব মধ্যেই নিয়ার মনে পড়ল বাবুরা বলেছিলেন সজাগ থাকতে। দুনিয়া াখ মেলে চাইল, মনে হল চার দিক অন্ধকার, মনে হল সে যেন চোখ

বুজিয়ে আছে। সে আবার মুখে গুঁজে শুল। আবাব চমক এল খানিক পরে। না, জেগে উঠতে হবে। ঘুমের ঘোবেই সে সৌদামিনীব বিছানায পাশ ফেরার শব্দ শুনল। চোখ রগড়ে নুনিয়া জোর কবে উঠে বসল, দেখল লণ্ঠনটা ঘরেব কোনে জ্বলছে। একটু আশ্চর্য লাগল, খানিক আগেই যেন মনে হয়েছিল খব অন্ধকাব। নিশ্চয় সে চোখ বুজেই ছিল। না, এরকম ভুল হওয়া ঠিক নয়। নুনিয়া উঠে দাঁড়াল। একেবাবেই হাওয়া নেই, সব নিস্তব্ধ।

খাটের কাছে এসে নুনিযা ঝুঁকে পড়ল। সৌদামিনীব মুখ শুকনো, কপালে ঘাম, ঘন ঘন নিঃশ্বাস পড়ছে। নুনিযা একবাব ডাকল, কোনো সাড়া নেই। আবাব ডাকল, এবাব সৌদামিনী অস্পষ্ট স্বরে কী যেন বললেন। ইজি-চেয়াবছটো বাইবেব দালানে খালি পড়ে রয়েছে, বাবুবা এখনো ফেরেনি। হঠাৎ সহজ স্পষ্ট গলায় ডাক এল : "নুনিয়া।" সৌদামিনী একদৃষ্টে বাইবেব দালানেব দিকে তাকিয়ে আছেন। "একটু জল দে।"

জল খেয়ে সৌদামিনী একটু চুপ কবে বইলেন। বাবুবা কোথায় আছে?" নুনিয়া বলল সে জানে না। সৌদামিনী হাসলেন, মিছে খোঁজ করছে ওবা। বাইবে একটা কাক ডেকে উঠল।

"নুনিয়া, ছোটবউকে কে খুন করেছে জানিস?" নুনিয়া একটু ভয় পেয়েই বলল সে জানে না।

বোধহয় ক্লান্তিতে ও দুর্বলতায় গলাটা একটু কেঁপে গেল : "আমাব মনে হচ্ছে আমি বোধহয় জানি। কিন্তু আমাব মাথাটা গুলিয়ে যাচ্ছে, ঠিক বুঝতে পারছি না। মাথাটা আমাব সারিযে দিতে পারিস?"

নুনিয়া অবাক হয়ে চুপ করে রইল। সৌদামিনী আবার ঘুমিয়ে পড়লেন।

অন্ধকারে দুজনে অনেকক্ষণ বসে রইলাম। প্রতি মুহূর্তেই আশঙ্কা যে এবার ভয়ঙ্কর একটা কিছু ঘটবে। কিন্তু কিছুই হল না। এখন এখান থেকে বেরোব কী ভাবে? আমাদের সামনে পেছনে রাশি রাশি অন্ধকার, অন্ধকারে মানুষ যে কতো অসহায় হয়ে পড়ে তা বুঝলাম এখন। এক হাত দিয়ে দেয়াল ধরে, অন্য হাত সামনের দিকে বাড়িয়ে অন্ধের মতো এগোতে লাগলাম। মাঝে মাঝে মনে হয় যদি কেউ অন্ধকারে হাত ধরে টানে! সেই বিশ্রী হাসির অপেক্ষায় কানদুটোও সজাগ হয়ে আছে।

সুড়ঙ্গটা এখানে ভীষণ আঁকাবাঁকা, যেন গোলোক-ধাঁধায় ঘুরছি। হঠাৎ মনে হল রবিশঙ্কর যেন পাশে নেই। পাগলের মতো দু হাত বাড়িয়ে তাকে খুঁজতে লাগলাম, চীৎকার করলাম। দেয়ালে লেগে কপালটা ফুলে উঠল। না, রবিশঙ্কর নেই। কোথায় গেল সে? অন্ধকারে না জানি আবার কী ঘটল! তারপর মনে হল সুড়ঙ্গের বাঁকে হয়ত সে অন্য কোনো দিকের পথে চলে গেছে। সেও নিশ্চয় আমাকে খুঁজছে। চীৎকার করতে লাগলাম: "শঙ্কর! শঙ্কর!" প্রতিধ্বনি ঘুরতে লাগল, মনে হল অনেক দূর থেকে যেন সাড়া আসছে। তাকে দাঁড়াতে বলে ছুটলাম, দুজনে ছুটোছুটি করলে আর কোনো উপায় থাকবে না। ভয় ভাবনা ছেড়ে এগোতে লাগলাম। পায়ের আওয়াজও পেলাম। হঠাৎ মনে হল যে আসছে সে যদি শঙ্কর না হয়! পা দুটো আমার ভয়ে থেমে গেল। পায়ের আওয়াজ এগিয়ে আসছে…এগিয়ে আসছে।

খুব কাছ থেকে ডাক এল: "বিভূতি।" দু হাত দিয়ে শঙ্করকে জড়িয়ে ধরলাম।

এবার দুজনে হাত ধরাধরি করে চলেছি। জলের ওপর পা পড়ঃ আরো দু-চার পা এগিয়েই বুঝলাম জল বাড়ছে সামনের দিবে রবিশঙ্কর বলল : "বুঝতে পারছ ? খালের জল সুড়ঙ্গে এসে ঢুকে এই জলের শব্দই আজ সকালে মাটির ওপর থেকে শুনেছি।" ঠি কথা, খালেরই জল।

রবিশঙ্কর উৎসাহে বলে উঠল : "বিভূতি, চলো, এই জলে সাঁত দিয়ে খালে গিয়ে পড়ি।"

একটু ভাবলাম, বললাম : "না, তা সম্ভব নয়। জমি এখানে ঢ বলেই সামনের দিকে জল ক্রমেই উঁচু হয়ে যাচ্ছে। আরো খানিব এগোলেই দেখবে জল ঠেকেছে সুড়ঙ্গের ছাতে। জলের ওপর ভে সাঁতার কাটবার জায়গাও পাবে না। খাল কত দূর জানি না—ডুবসাঁত দিয়েও লাভ হবে না। চলো, এদিক থেকে ফিরি।"

নিরাশ হয়ে দুজনে ফিরলাম। দেয়ালে হাত দিয়ে যেতে যে একটা ফাঁক পেলাম, এখানে সুড়ঙ্গের আর একটা শাখা বেরিয়ে এগিয়ে চললাম এই পথে। পায়ের তলায় জমি আর ঢালু নয়, কোথ সমান, কোথাও ধীরে ধীরে উঠেছে। অনেক দূর গিয়ে আর সোজা হ দাঁড়ান গেল না, মাথায় ছাত ঠেকছে। পথও খুব সরু হয়ে এ গুঁড়ি মেরে, বুকে হেঁটে, আঙুলের জোরে কোনোমতে উঠছি। ' চলেছি প্রাণের দায়ে দম বন্ধ করে। মাঝে মাঝে থেমে নিঃশ্বাস নি আবার উঠি। একবার মনে হল এই পথের শেষে যদি বেরোবার না থাকে তাহলে ইঁদুরের মতো মরতে হবে।

হঠাৎ ওপর থেকে এক ঝলক তাজা হাওয়া এসে চুলে লাগ শিরায় শিরায় রক্তের ঢেউ উঠল, আশার ঢেউ। এবার, এবার ে

য় মুক্তি এল। আঙুলে ঘাসের ছোঁয়া পেলাম। অতি কষ্টে মাথা লোলাম, অন্ধকারের মধ্যে বাইরের জগতের ম্লান আলোতেও চোখ যেন ন্ধ হয়ে গেল। কারো মুখে কথা নেই, পিপাসী চোখ দুটো প্রাণ ভরে ালো পান করতে লাগল। পাগলের মতো দু হাত তুলে শরীরটাকে র্তের বাইরে টেনে এনে ঘাসের উপর উপুড় হয়ে পড়লাম। একটা পা কান্নায় দুজনের শরীর থরথর করে কাঁপতে লাগল।

কতো অন্ধকার, কতো ভয়, কতো মুহূর্তের মৃত্যু পার হয়ে আবার সেছি আমাদের চেনা পৃথিবীতে। সমস্ত শরীর দিয়ে আলো-হাওয়া নুভব করছি। দুজনে উঠে দাঁড়ালাম। চারদিকে বড় বড় গাছ, ঘন । কিন্তু তবু খোলা আকাশ থেকে কতো আলো ঝরছে। ঠাণ্ডা ওয়ায় শরীর যেন ঝিমিয়ে পড়ল। গাছের পাতার ফাঁক দিয়ে থলাম আকাশে চাঁদ প্রায় অস্ত গেছে, ধীরে ধীরে দিনের আলো সছে। হঠাৎ একটা গাছের ফাঁকে নদীর জল চোখদুটোকে চমকে ল। কোথায় এলাম? দু হাত দিয়ে গাছের নিচু ডালগুলো সরিয়ে স দাঁড়ালাম ষ্টীমার ঘাটের রাস্তায়। ভোরের আলোয় দূরে, অনেক র, ষ্টীমারের বাঁশী বাজল।

থানার বাংলো থেকে ফিরলাম ষ্টীমার ঘাটে। কে জানত আমরা াবে আসব শিলাকে আনতে? রবিশঙ্কর একবার বলল: াকটা তাহলে ঐ সুড়ঙ্গের ভেতর দিয়েই বেরিয়েছিল।" চুপ করে লাম: প্রাণ নিয়ে যে বেরোতে পেরেছি এই যথেষ্ট। শিলাকে সব া না বলা পর্যন্ত মনে শান্তি হচ্ছে না।

ভবতারণ বাবু আমাদের দেখে

"এই যে আসুন। লাহিড়ি তো শুনলাম আপনাদেরই ওপ
সব·

হেসে বাধা দিলাম। ভবতারণ আবার আরম্ভ করলেন : "এতে
ভোরে যে? ষ্টীমারের ওপর নজর রাখছেন? কারো ওপর সন্দেহ
আছে নাকি, স্যার্?"

জানালাম সন্দেহের কোনো কারণ নেই, একটি পরিচিত মহিল
আসছেন। ষ্টীমার এল, এক মুখ হাসি নিয়ে শিলাও নামল, 'শিবির
আবার সম্পূর্ণ হল। ভবতারণবাবুর সঙ্গে শিলার পরিচয় করিয়ে আমর
সকলে রাজবাড়ীর দিকে এগোলাম।

পথে যেতে যেতে শিলাকে সব কথা খুলে বললাম। সব শুনে
শিলা বলল : "তোমাদের যথেষ্ট সাবধানী হওয়া উচিত ছিল
তোমরা সুড়ঙ্গ আবিষ্কার করে এতই অধীর হয়ে পড়লে যে দ্বিতী
একটা টর্চ বা লণ্ঠন নেবার কথা তোমাদের মনেই রইল না! দো
অবশ্য শঙ্করেরই বেশি। সুড়ঙ্গের ঘরের ব্যাপার দেখে তোমাদে
আরো সাবধানে থাকা উচিত ছিল। শুধু কপালজোরে তোম
বাইরে আসতে পেরেছ।"

গল্প করতে করতে বনের পথে রাজবাড়ীতে এসে পৌঁছলাম
গড়ের সামনেই দেখা হল নুনিয়ার সঙ্গে, সে আমাদের দেখে নে
এসেছে। সৌদামিনীর অসুখ শেষ রাত থেকে বেড়েছে। প্রচণ্ড জ্বর
মাঝে মাঝে ভুল বকছেন। নুনিয়া বলল শেষ রাতের দিকে
সৌদামিনী একবার বলেন তাঁর মনে হচ্ছে কে খুন করছে তা তিনি
জানেন। আমাদের খুব আশ্চর্য লাগল প্রথমটায় : আমাদের কাছে
তো কিছুই বলেননি, বরং তদন্তে যেন একটু বাধাই দিয়েছিলেন। কিন্

রপর মনে হল সৌদামিনীর কথায় আশ্চর্য হবার কিছু নেই। লীশ্বরী সম্বন্ধে তিনি নিশ্চয়ই অনেক কিছু জানেন, পারিবারিক াপন কথা আমাদের জানাননি। কিন্তু নিজে হয়ত কাকেও সন্দেহ েছেন। কা'কে? শিলা খুব মন দিয়ে নুনিয়াব কথা শুনল, ন্তু কিছু বলল না।

নুনিয়া শিলাকে দেখে একটু আশ্চর্য হল, কিন্তু খুসীও হয়েছে বলে ন হল। সৌদামিনীব ঘরে এসে দেখলাম তিনি ঘুমিয়ে আছেন। ঝে মাঝে মাথা নাড়ছেন, বোধ হয় যন্ত্রণা হচ্ছে, জ্বরও বেশ। াপটি দিয়ে মাথায় হাওয়া কববাব ব্যবস্থা হল। শিলা মাথায় হাত নিয়ে দিতে লাগল।

নাটমন্দিবেব উঠানে এসে দেখি সেখানে আব এক ব্যাপার। ানেই চৌকিদাব বামভকত্ লম্বা হয়ে শুয়ে আছে। লেহাই বলল সে ভোরেব দিকে ঘুম থেকে উঠে উঠানে নেমে দেখে রামভকত্ জ্ঞান হয়ে পড়ে আছে। জ্ঞান হবাব পর বামভকত্ কোনো কথাই ছে না, শুধু বলছে তাকে ভূতে ধরেছিল। রামভকত্ একবার য়েই চোখ বুজল। বুঝলাম কোনো কাবণে দারুণ ভয় পেয়ে তার অবস্থা হয়েছে। কিন্তু একটা জিনিষ দেখে মনে খট্‌কা গল। চৌকিদারের গলায় বেশ স্পষ্ট আঙ্গুলের দাগ রয়েছে।

দুনিয়াই রান্না করে আজ আমাদের খাওয়াল। রামভকত্‌কে থানায় পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে, তার জায়গায় এসেছে সীতারাম।

দুপুরের দিকে গড়ের মাঠে গাছতলায় অধিবেশন সুরু হল। শিলার কাছে সমস্ত ঘটনাটা আবার ভালো করে বললাম। রবিশঙ্কর বলল: "এবার আমাদের জেরা করো।"

শিলা একটু ভেবে জিগেস করলো: "আচ্ছা, গড়ের দিক দিয়ে নাটমন্দিরের উঠানে আসা যায়?"

আমি বললাম: "তুমি তো বাড়ীটা এরই মধ্যে একবার দেখেছ। এ রকম কোনো পথ দেখিনি।"

শিলা চোখ বুজিয়ে মনে মনে ছবি এঁকে বলতে লাগল: "পূব দিক দিয়ে উঠানে আসবার পথ, পশ্চিমে কয়েকটা ঘর, মধ্যে উঠান। প্রথম ঘরটার প্রায় সামনেই কূয়ো, এখান থেকেই লাস হারিয়ে গেছে। আচ্ছা, এই ঘরের সঙ্গেও গড়ের কোনো সংযোগ নেই? এর পাশ দিয়েই তো গড়ের দেয়াল ছাদ পর্যন্ত উঠেছে।"

রবিশঙ্কর বলল: "হয়ত থাকতে পারে, কিন্তু এ রকম পথ চোখে পড়েনি।"

"আচ্ছা, বিভূতি, খুনটা ঠিক কখন হয়েছিল?" শিলা জিগেস করল, "রাত তখন ক'টা হবে?"

"ঠিক বলা যায় না। বোধ হয়, বারোটা থেকে দুটো-তিনটের মধ্যে হয়েছিল।"

"সৌদামিনী রাত দুটো নাগাদ চীৎকার শুনতে পান, খুন এই সময়েই ত পারে। চীৎকার করল কে? খুব সম্ভব, কালীশ্বরী।"

রবিশঙ্কর বলল : "কিন্তু এ চীৎকার, বিশেষত ঝড়জলের মধ্যে, গ.ড়ব দোতলায় আসা অসম্ভব। তিনি অন্য কোনো চীৎকার শুনেছিলেন।"

শিলা একটু হেসে বলল : "কিংবা তাঁর কল্পনা। আচ্ছা, চীৎকার থাক। মৃত্যু কী ভাবে হয়েছিল ?"

"নিশ্চয় কোনো ভারী অস্ত্রের কোপে—যেমন, ধবো, কুড়ুল।"

"আচ্ছা, লাসটা ওরকম ঝোলান অবস্থায় কেন ছিল বলো তো ?"

রবিশঙ্কব বলল : "আমার মনে হয কেউ খুন কবে লাসটা ফেলে দিতে চেয়েছিল কূয়োর মধ্যে। হয়ত কোনো কারণে বাধা পড়ে।"

শিলা বলল : "কিন্তু ঐ ভাবে কেউ লাস কূয়োব মধ্যে ফেলে নাকি ! পা দুটো ধবে ঝুঁকে কূয়োর মধ্যে ফেলবার চেষ্টা কেউ করে না। আমার থিয়োরি অন্যরকম, হয়ত তোমাদের পছন্দ হবে না। আমার মনে হয় কালীশ্বরী কূয়োয় নামছিলেন বা কূয়ো থেকে উঠছিলেন এমন সময় কেউ তাঁকে হত্যা করে। কিংবা কূয়োর তলায় তাঁকে খুন কববাব চেষ্টা হয়, অজ্ঞান হয়ে পড়েছিলেন। জ্ঞান হলে কূয়ো থেকে উঠছিলেন, কিন্তু প্রচুর বক্তক্ষয়ে মারা যান।"

"তোমার এ রকম ধারণা হল কেন ?" জিগেস কবলাম।

শিলা বলল সে লেহাইকে খানিক আগে জিগেস করেছিল। সে বলে লাসের পা দুটো কূয়োব আংটায় লেগে ছিল। আমরা চুপ করে রইলাম।

রবিশঙ্কর বলল : "কিন্তু শেষের কথাটা আমার পছন্দ হচ্ছে না। ঐ রকম ক্ষত পিঠে ও ঘাড়ে নিয়ে কূয়ো থেকে ওঠা যায় ?"

"একেবারে অসম্ভব নয়," আমি বললাম। "কালীশ্বরীর শরীরে বিলক্ষণ শক্তি ছিল : একথা সকলেই বলেছে। আচ্ছা, শিলা, কালীশ্বরী বাড়ীতে কা'কেও রাত্রে থাকতে দিতেন না কেন ?"

"এখন বেশ বোঝা যাচ্ছে : ঐ কূয়ো দিয়ে নিচের সুড়ঙ্গে কোনো গোপন কাযে তিনি যাতায়াত করতেন। নিচের সুড়ঙ্গের ঘরের ব্যাপার দেখে তোমাদের কী মনে হয় ? এটা ঠিক যে পেছনের ঘর দিয়ে বাইরে যাওয়া যায়, কিন্তু সে দরজা তোমরা দেখতে পাওনি। আমার মনে হয় এ ঘরে আসবার পথ চলে গেছে খালের দিকে, আরো উঁচুতে। এরকম একটা সুড়ঙ্গ তোমরা দেখেছিলে—যেখানে জল ছিল। বাইরের লোক খাল দিয়ে ঢোকে—কিন্তু কেন ?"

তিনজনে ভাবতে লাগলাম। হঠাৎ রবিশঙ্কর লাফিয়ে উঠল। "বুঝেছি, শোনো। আমার বিশ্বাস, ঐ ঘরে আফিম-কোকেনের ঘাঁটি। বাক্সগুলোয় নিশ্চয় ঐ সব আছে। বোধ হয় ঐ চীনেটা পাহারা দেয়। সৌদামিনীও বলেছিলেন খালের নৌকায় অনেক সময়ে চীনে লোক দেখা যায়।"

রবিশঙ্করের কথা আমার বেশ পছন্দ হল। বললাম : "ষ্টীমার ঘাটের দিক দিয়ে সুড়ঙ্গের মধ্যে লোক আসে মাল নিতে। সেইজন্যই বোধ হয় দরজায় খড়ি দিয়ে লেখা : 'এই দরজা'। যখন যে লোক আসে তার কাছে চাবি থাকে, সে-ই তালা খোলে। কী বলো, শঙ্কর ?"

"ব্যাপারটা এবার স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে। কালীশ্বরী যে ভীষণ প্রকৃতির লোক ছিলেন তাতে তাঁর সঙ্গে এই দলের—ধরো ব্যবসাঘটিত—সম্পর্ক থাকা মোটেই অসম্ভব নয়। হয়ত কাফ্রু ও এই দলেই ছিল। কোনো কারণে মনোমালিন্য হয়, হয়ত কালীশ্বরী ভয় দেখান। এরাই তাঁকে খুন করে, এরাই লাস লুকিয়ে ফেলে। সৌদামিনী কালীশ্বরীর এই নীচ-সংসর্গের কথা জানতেন, সাবধানও করেছিলেন, কোনো ফল হয়নি। খুনের পর তিনি সবই বুঝতে পারেন, কিন্তু পারিবারিক কলঙ্ক

লুকোবার জন্য আমাদের কাছে সব কথা বলেননি, তদন্তেও একটু বাধা দিয়েছিলেন। একেই শরীর অসুস্থ ছিল, তারপর এই সব ব্যাপার—এখন শয্যাশায়ী হয়ে পড়েছেন।"

"শঙ্কর, ঠিক ধরেছো। আমার মনে হয় খালের ধারে গিয়ে দেখা যাক কোথায় সুড়ঙ্গের পথ। বরং থানা থেকে চৌকিদার নিয়ে ঢুকে এদের গ্রেপ্তার করা যাক।" রবিশঙ্করেরও সেই মত।

কিন্তু শিলা বাধা দিল: "অতো ব্যস্ত হোয়োনা। কাল রাতের কথাটা মনে কোরো। তাছাড়া লোকগুলো ঐ ঘরে এখনো না থাকতে পারে। বেশি ব্যস্ততা দেখাতে গিয়ে প্রাণ হারাবে? আর গ্রেপ্তার করবার আইনতঃ তোমাদের কোনো অধিকার নেই। বরং পুলিশে খবর দিতে পারো, কিন্তু লাহিড়ি তো এখানে নেই।"

রবিশঙ্কর বলল: "বেশ, আমরা দুজনেই যাবো ভজুয়া আর লেহাইকে সঙ্গে নিয়ে।" কিন্তু শিলা বার বার বাধা দিল। তার মতে যে কোনো রকম বিপদ হতে পারে, হয়ত অপরাধীও পালিয়ে যেতে পারে। শিলার আপত্তি মেনে নিলাম।

শিলা বলল: "ষ্টীমার ঘাটের লোকটার চেহারা কী রকম? ওর ওপর নজর রাখতে হবে—ও নিশ্চয় আবার আসবে।"

স্পষ্ট করে লোকটাকে আমরা দেখিনি। দুজনে চেষ্টা করলাম মনে করতে। বললাম: "মাথার চুল ছোটো, বড়ো গোঁফ—এইতো মনে পড়ছে।"

শঙ্কর বললো: "লোকটা একটু খোঁড়া—বাঁ পা—শেডটা তার বাঁ দিকেই ছিল।"

"বেশ, মনে রেখো। ইচ্ছে করো তো ভবতারণবাবুকেও বলতে

পারো এরকম লোকের ওপর নজর রাখতে। বেশি কিছু বোলোনা। আমার মনে হয়, ভবতারণবাবু কাছ থেকে অনেক খবর পাওয়া যেতে পারে।" আচ্ছা, শঙ্কর, তুমি না কাগজে কতগুলো খড়ির আঁচড় এঁকে নিয়েছিলে সুড়ঙ্গের দরজা থেকে? কোথায় সেটা?"

রবিশঙ্কর কাগজটা রেখেছিল হাফ-প্যান্টের পকেটে, পরে কাপড় বদলে রেখেছিল সার্টের পকেটে, এখন বেরোল। আমরা সকলেই কাগজটার ওপর ঝুঁকে পড়লাম। মনে হল যেন গাছের পাতার ছবি: কোনো সাঙ্কেতিক অর্থ আছে নাকি?

রবিশঙ্কর বলল: "হয়ত বোঝানো হচ্ছে দরজার সামনের পথ কোনো গাছের তলায় গিয়ে পৌঁছেছে।"

শিলা হেসে উঠল: "তাতে লাভ? সে লোকটা, যাকে বোঝানো হচ্ছে, সুড়ঙ্গের পথ তো চেনেই। আচ্ছা, এর পাশে ঠিক কী লেখা ছিল?"

"এই দরজা।"

"কী ভাষায়?"

"বাংলায়।"

শিলা আঁচড়গুলোর দিকে তাকিয়ে আবার জিগেস করল: "শঙ্কর, তুমি ঠিক এঁকেছো তো?" রবিশঙ্কর ঘাড় নাড়ল।

খানিক পরে শিলা হঠাৎ হেসে উঠল: "আরে এ তো চীনে হরফ্!" আমরা ভালো করে দেখলাম: ঠিক কথা! বৌবাজারে অনেক চীনের দোকানের সাইন বোর্ডে এরকম আঁচড় দেখেছি।

শিলা বলল: "এখন উপায়? এ তো শুনেছি ভয়ানক ভাষা। হয়তো এখানে এমন কিছু লেখা আছে যা আমাদের জানা বিশেষ দরকার।"

শঙ্কর একটু ভেবে বলল : "তাহলে কলকাতায় যেতে হয়। সুটারকিন ষ্ট্রীটে আমাদের যে চীনে ভাড়াটে ছিল লাও-টুং তার সঙ্গে দেখা করতে হয়। কিন্তু, শিলা, ঠিক চীনে হরফ্ তো ?"

শিলা বলল তার কোনো সন্দেহ নেই। রবিশঙ্কর বলল তাহলে সন্ধ্যার ষ্টীমারে সে রওনা হবে। শিলা আমাকেও যেতে বলল। আমরা আপত্তি করলাম। এরকম জায়গায় তাকে একা রেখে যাওয়া ঠিক হবে না। হয়তো আমাদের অনুপস্থিতিতে সে সুড়ঙ্গে ঢুকবে, কিংবা অন্য কোনো বিপদ বাধাবে।

শিলা কিন্তু শুনল না, বলল : "না, বিভূতি যাক। হয়তো চীনে হরফে কোনো গুপ্ত আড্ডার সঙ্কেত দেওয়া আছে, হয়তো কলকাতাতেই তার খোঁজ করতে হবে। তোমাদের একসঙ্গে থাকাই ভালো। আমার জন্যে তোমাদের ভাবনা নেই। আমি তোমাদের চেয়ে অনেক বেশী সাবধানী। তাছাড়া, ভজুয়া রইল, লেহাই, মুনিয়া, সীতারাম চৌকিদার। দরকার হলে থানা থেকে আরো দু-একজন লোককে আনানো যাবে। ভবতারণবাবু আছেন। ঠিক কথা, ভবতারণবাবুকে একবার আসতে বোলো তো। নিশ্চয়ই ভদ্রলোক আসবেন। ওঁর না ডিটেক্‌টিভ হবার সখ আছে ?"

শিলার কথায় অনিচ্ছা সত্ত্বেও রাজি হতে হল। বললাম : "বেশ, যখন কলকাতায় যাচ্ছি, একবার ডক্‌টর্ মিত্রের সঙ্গে সৌদামিনীর অসুখ সম্বন্ধে আলোচনা করে আসব। অসুখটা জটিল। ডক্টর মিত্র নার্ভ, ব্রেন্ সংক্রান্ত অসুখে স্পেশ্যালিষ্ট।"

সন্ধ্যার আগেই বেরিয়ে পড়লাম সকলকে খুব সাবধানে থাকতে

বলে। যাবার সময় রবিশঙ্কর বলল : "তাহলে খুনের ব্যাপারটা স্পষ্ট বোঝা গেল।"

শিলা হেসে বলল : "এতো সহজ? সুড়ঙ্গের মূর্তি? বাঁশীর শব্দ? বাকসের ভেতরে সেই ছেলেটা? ফিরে এসো, অনেক কথা আছে।"

আবার মনটা খারাপ হয়ে গেল। শিলাকে আবার সাবধান করে আমরা চলে এলাম। ষ্টীমারে এসে দুশ্চিন্তা হতে লাগল : না জানি আবার কী ঘটে!

সকালে একবার দেখেছে, কিন্তু সন্ধ্যার আগেই শিলা আবার ঘুরে দেখে এল—কালীশ্বরীর শোয়ার ঘর, উঠান, কুয়োর ধার, উঠানের ঘর। গড়ের একতলাটাও ভালো করে দেখে সে উঠে এল ওপরের দালানে। থানা থেকে চৌকিদার এসেছিল—সীতারাম—লেহাই হল তার সঙ্গী। রাত্রে তারা থাকবে উঠানের ঘরে লণ্ঠন ও লাঠি নিয়ে, পালা করে জাগবে আর পাহারা দেবে। শিলা বলে দিল কুয়োর ওপরও তারা যেন নজর রাখে। গড়ের সিঁড়ির দরজা বন্ধ করে সামনের দালানে থাকবে মুনিয়া, পেছনের দালানে ভজুয়া। সৌদামিনীর ঘরে থাকবে শিলা নিজেই।

বিকালের দিক থেকে সৌদামিনী একটু ভালো আছেন, দুধ খেয়েছেন। শিলার সঙ্গেও তাঁর পরিচয় ও কথা হয়েছে। এই অনাত্মীয়া মেয়েটির মধুর ব্যবহারে সৌদামিনী মুগ্ধ হয়ে গেছেন। সন্ধ্যার পরেই দুর্বল শরীরে সৌদামিনী ঘুমিয়ে পড়লেন। ভজুয়াকে সেখানে রেখে শিলা নেমে এল রাজবাড়ীর পূবদিকে—যেখানে মুনিয়া, লেহাই, কার্ফু থাকে।

কার্ফুর ঘর ফাঁকা পড়ে আছে, বিশেষ কিছুই নেই, একটা তক্তা-পোষ, একটা ভাঙা টেবিল, একটা বেঞ্চি, কতকগুলো কাপড় চোপড়। ঘরের সামনেই খানিকটা ঘাসের জমি, তারপরেই উঠানে যাবার দরজা। শিলা গেল আবার নাটমন্দিরের উঠানে। ঘরে ঢুকে আবার লণ্ঠনের আলোয় কী যেন দেখতে লাগল। লোহার দরজাটায় দু-একবার ঘা দিল, কান পেতে শুনল। দরজার তলায় দেয়ালের গা বেশ ভালো করে সে লক্ষ্য করল।

নুনিয়া তার রান্নাঘরে মহা উৎসাহে আহারের আয়োজন করছে : শিলা তার অতিথি, তাছাড়া ভজুয়া ও চৌকিদার আছে। শিলার কথায় ও ব্যবহারে তার ভারি ভালো লেগেছে। একটা চৌকি টেনে শিলা তার সঙ্গে গল্প করতে বসে গেল।

"আচ্ছা, নুনিয়া, তোমার দিদিরাণী সৌদামিনীর অসুখ কতদিন হয়েছে ?"

নুনিয়া বেশ বাংলা বলে, বলল: "তিন-চার বছর আগে একবার ফিটের অসুখ হয়েছিল। এখন অসুখ হয়েছে মাসখানেক—খুব বেশি প্রথমে হয়নি। ঘুমের ঘোরে কথা বলতেন, দু-একবার অজ্ঞান হয়ে গিছলেন। সেইজন্যে রাতে আজকাল আমি তার কাছে থাকি।"

"খুনের রাতেও ছিলে ?" শিলা জিগেস করল। নুনিয়া জানাল সেদিন খুব ঝড়বৃষ্টি ছিল; দিদিরাণী বলেছিলেন বৃষ্টি যদি বাড়ে তাহলে তাকে আসতে হবে না। দিদিরাণী লোক খুব ভালো, কিন্তু ছোট বৌরাণী কালীশ্বরী ভারি রাগী ছিলেন। গায়ে জোয়ান মরদের মতো জোর ছিল, সকলেই ভয় পেত। একবার একদল বেদে ও বেদেনী এসে বনের মধ্যে তাঁবু ফেলে, তাদের একটি ছোট মেয়ে হারিয়ে যায়। কাফুকে সন্দেহ করে তারা রাজবাড়ী চড়াও করে, কিন্তু বৌরাণী একাই চাবুক মেরে তাদের হটিয়ে দিয়েছিলেন। কাফুকে তিনি খুব পছন্দ করতেন।

"কেন ?" শিলা জিগেস করল। নুনিয়া সঠিক কিছু বলতে পারল না। বলল বৌরাণী খুন হতে কাফু খুব রেগে গিয়েছিল।

থানায় ছিলেন, নুনিয়া উঠছিল গড়ের সিঁড়ি দিয়ে।

সে দেখে কাফুর্ নেমে আসছে রাগে গজ্‌-গজ্‌ করতে করতে। বোধহয়, দিদিরাণীর সঙ্গে তদন্তের ব্যাপার নিয়ে তর্ক করছিল।

শিলা আশ্চর্য হল: কাফুর্ সৌদামিনীর সঙ্গে দেখা করেছিল একথা সে শোনেনি, বিভূতিরাও নিশ্চয় জানে না। হুনিয়ার সঙ্গে এমন আলাপ জমিয়ে কেউ বোধহয় গল্প করেনি। সে আপন মনে কথা বলতে লাগল।

"আচ্ছা, হুনিয়া, তোমার বৌরাণী রাত্রে কা'কেও বাড়ীতে থাকতে দিতেন না কেন জানো?" হুনিয়া ঠিক বলতে পারল না। একটু ভেবে সে বলল কাফুর্ একবাব খুব মাতাল হয়ে লেহায়ের কাছে বলেছিল বৌরাণী নাকি কখনো কখনো সারারাত পূজো করেন। শিলা মন দিয়ে শুনল।

"তোমার বৌরাণীর সঙ্গে দিদিরাণীর খুব ভাব ছিল?"

হুনিয়া বলল ভাব মোটেই ছিল না, বৌরাণী প্রায়ই ঝগড়া করতেন। কিন্তু দু-তিন মাস থেকে দুজনের মধ্যে অনেকটা ভাব হয়েছিল। এমন কি দিদিরাণী তিন-চারদিন রাতে বৌরাণীর কাছে ছিলেন। শিলা আবার আশ্চর্য হল: হঠাৎ দুজনের বিরোধ মিটে গেল কী করে? হুনিয়া আপন মনেই অনেক কথা বলে চলল: তার বিশ্বাস: রাজবাড়ীতে শাপ লেগেছে, দিদিরাণীও বাঁচবেন না। তাহলেই এ বাড়ীব সঙ্গে তাদের সম্পর্ক ঘুচে যায়, সে দেশে চলে যাবে। দিদিরাণীর কে এক দূর সম্পর্কের আত্মীয় হবে বাড়ীর মালিক।

হঠাৎ কী ভেবে শিলা বলল: "হুনিয়া, তুমি নাটমন্দিরের উঠানে বা বাড়ীর ভেতরে কখনো বাঁশীর শব্দ শুনেছিলে?"

হুনিয়া চমকে শিলার দিকে তাকাল। "তুমি কী করে জানলে,

দিদি ?" একটু থেমে সে বলল লেহাইও এই শব্দ শুনেছে। আওয়াজটা যেন কূয়ো থেকে ওঠে। লেহাই এ কথা কাফু´র কাছে বলতে কাফু´ ভয়ানক রেগে গিয়েছিল। কাফু´ লোক ভারি খারাপ। নুনিয়ার ধারণা : এ বাড়ীতে ভূত আছে, ভূতই বৌরাণীকে খুন করেছে, কাফুকেও খুন করেছে।

নুনিয়া উনুনের ধারে বসে রুটি সেঁকছে। শিলা ভাবতে লাগল : কে বাঁশী বাজায় ? কে রামভকতের গলা চেপে ধরেছিল ? সুড়ঙ্গে বিভূতিরা কাকে দেখলো ? এরা কি একই লোক ? খড়ির আঁচড়ের সঙ্কেত থেকে কি এসব সমস্যা বোঝা যাবে ? কী যেন মনে হল, শিলা জিগেস করলো : "নুনিয়া, তোমার দিদিরাণী খাট থেকে পড়ে অজ্ঞান হয়ে গিছলেন তো ? তোমাকে ডাকেন নি ?"

নুনিয়া বলল হয়তো তিনি ডেকেছিলেন। কিন্তু তার ঘুম বড়ো বেশি, শুনতে পায়নি। কাল রাতে বাবুরা তাকে সজাগ থাকতে বলেছিলেন, কিন্তু তবু সে ঘুমিয়ে পড়ে। কাল অবশ্য ঘুম খুব গভীর হয়নি —একবার জেগে তার মনে হয়েছিল ঘর যেন অন্ধকার, হয়ত চোখ বুজিয়ে ছিল।

শিলা খুব মন দিয়ে কথাগুলো শুনল, আবার জিগেস করল : "অজ্ঞান হয়ে দিদিরাণী কোথায় পড়ে ছিলেন ?" নুনিয়া বুঝিয়ে দিল : খাট থেকে একটু দূরে সৌদামিনী উপুড় হয়ে শুয়ে ছিলেন, পা দুটি পেছনের দরজার দিকে, মাথাটি খাটের দিকে। পড়ে গিয়ে মাথায় চোট লেগেছিল, হাত ছড়ে গিছল।

শিলা ভাবছে, চিন্তাগুলো যেন এলোমেলো হয়ে আসছে।

সারাদিন আজ আকাশ বেশ পরিষ্কার ছিল, রাত্রে কিন্তু মেঘ এল

আহারাদির পর গড়ের দোতলায় শিলা,ভজুয়া ও মুনিয়া যখন সমবেত হল, তখন বৃষ্টিও সুরু হয়েছে। রাত যতো বাড়তে লাগল হাওয়ার জোরও বাড়ল। সৌদামিনী ঘুমিয়ে আছেন, শিলা গায়ে হাত দিয়ে দেখল জ্বর প্রায় নেই। ঘরের কোণে লণ্ঠনটা কমিয়ে বসানো আছে।

মুনিয়া ও ভজুয়াকে ঘুমোতে বলে শিলা ইজিচেয়ারে বসে রইল। কী হবে? কী করে এই সর্বনেশে রহস্যের শেষ হবে? একটা ভয়ানক সন্দেহ শিলার মনে ধোঁয়ার মতো জমে উঠল। মনে হল স যেন অনেকটা আন্দাজ করতে পারছে। কিন্তু তার সন্দেহ যদি সত্যি হয় তাহলে কী ভয়ানক ব্যাপার!

রাত অনেক হয়েছে, ঘর নিস্তব্ধ, সকলে ঘুমোচ্ছে। শিলার কিন্তু ঘুম এল না। কোথায় যেন গোঙানির শব্দ হচ্ছে—বোধহয়, কোনো পাখীর ডাক। শিলার বুকটা একবার কেঁপে উঠল। হঠাৎ কী ভেবে মনে জোর করে টর্চটা হাতে নিয়ে সে পেছনের দালানে চলে গেল।

টর্চের আলো ফেলে শিলা এগোতে লাগল, একবার ভাবল ভজুয়াকে ডাকে, আবার এগিয়ে গেল। বাঁ দিকে ঘরের পর ঘর চলে গেছে উত্তর দিকে, ডান দিকে কয়েকটা জানলা, নিচে সৌদামিনীর উঠান। উঁচু দরজাগুলোয় পুরু ধুলো জমে আছে, ঘরগুলো ব্যবহার হয় না। এই অংশের শেষে ছাতে ওঠবার সিঁড়ি। সিঁড়িটা কাঠের, তিন দিকেই দেয়াল। উত্তর দিকের দেয়াল বন্ধ, তার পরেই নাট-মন্দিরের উঠান। নিচে একতলায় বা ওপরে কোনোখান দিয়েই সদিকে যাওয়া যায় না। ঘরগুলোয় তালা লাগানো, কয়েকটা জানলা

খোলা। টর্চের আলোয় কিছুই চোখে পড়ল না। শিলা সিঁড়ি দিয়ে উঠতে লাগল।

বাড়ীর চারধারের গাছগুলো ঝড়ে যেন ক্ষেপে উঠেছে, বৃষ্টির শব্দে কানে তালা লেগে যায়। মেঘের ডাকে শিলার রক্তে যেন উত্তেজনার ঢেউ উঠল। সিঁড়িটা সোজা উঠে যেখানে বাঁক নিয়েছে সেখানে অনেকটা জায়গা। সেখানে পা ফেলেই শিলা চমকে উঠল। কী রকম যেন একটা ফাঁপা আওয়াজ, যেন কাঠের তলাটা ফাঁকা। শিলা কাঠের ওপর টর্চের আলো ফেলে লক্ষ্য করতে লাগল। বেশ বড়ো জায়গা: সাত-আট জন লোক বসতে পারে। কাঠের প্রায় মাঝামাঝি কয়েকটা কবজা এক লাইনে পাশাপাশি রয়েছে। শিলা তাড়াতাড়ি নিচের ধাপে নেমে ঝুঁকে পড়ল, দেখল নিচের ধাপের খাড়া গায়ে বাক্সের ডালার মতো ছিট্‌কিনি লাগানো রয়েছে। ওপরের ধাপের কাঠের খানিকটা কবজায় লাগানো ডালার মতো খোলা যায়। উত্তেজনায় শিলা কাঁপতে লাগল: নিশ্চয় সুড়ঙ্গের একটা গুপ্ত পথ।

শিলা একবার ভাবল ফিরে যায়, একবার ভাবল ভজুয়াকে ডেকে আনে। কিন্তু ধৈর্য রইল না, তাড়াতাড়ি ছিট্‌কিনি খুলে ডালাটা সে তুলে দিল। এক ঝলক বদ্ধ হাওয়া মুখে এসে লাগল। টর্চের আলোয় চোখের সামনে একটা সিঁড়ি। শিলা কেমন অন্যমনস্ক হয়ে পড়ল, মনটা উদাস হয়ে গেল। কিছু মনে রইল না, শুধু মনে হতে লাগল এই জরাজীর্ণ বাড়ীটার কথা, কতো বছরের কতো গোপন রহস্য নিয়ে এ বাড়ীটা দাঁড়িয়ে আছে! শিলার মনে হল কোথা থেকে একটা শব্দ আসছে—অদ্ভুত, উদাস একটা সুর। সুরটা যেন মাটির নিচ থেকে সিঁড়ি বেয়ে উঠে আসছে। কী অদ্ভুত সুর! মনে যেন

মোহ আনে, যেন সুরের মধ্যে অজস্র মৃত্যুর ইঙ্গিত ঝরে পড়ে। বাইরের ঝড়জলের শব্দ ও মেঘের ডাক হয়ে গেল পটভূমি, কানে বাজতে লাগল বহুদূর থেকে ভেসে আসা মৃত্যুর এই ক্ষীণ সঙ্গীত: জলাভূমির ওপর মেঘের ছায়া নেমেছে, হাওয়ার পাকে পাকে বিষণ্ণ সুর।

মন্ত্রমুগ্ধের মতো শিলা টর্চ হাতে নামতে লাগল। সরু সিঁড়ি ঘুরে ঘুরে নেমে চলেছে। শিলার শরীর টলছে, তবু সে নেমে চলল দোতলা থেকে একতলায়, একতলা থেকে মাটির নিচে। বাঁশীর আওয়াজ মিলিয়ে গেছে, শুধু তার নিজের পায়ের খস্ খস্ শব্দ। সিঁড়ির ধাপ শেষ হয়ে ভিজে মাটি আরম্ভ হল। খানিকটা দূর সুড়ঙ্গের পথে এগিয়ে শিলা থমকে দাঁড়াল, দেখল জায়গায় জায়গায় রক্তের দাগ শুকিয়ে উঠেছে। শরীরটা হঠাৎ দুর্বল হয়ে গেল, আর এগোবার সাহস হল না। শিলা ফিরে চলল, মনে হল পেছনে অনেক দূরে কার যেন পায়ের শব্দ। ভয়ে শিলার শরীর হিম হয়ে এল, তারপরেই সে যন্ত্রের মতো সিঁড়ির দিকে ছুটল পেছনে পায়ের শব্দও ছুটে আসছে। পাগলের মতো শিলা সিঁড়ির দিয়ে উঠতে আরম্ভ করল। পালাতে হবে, পালাতে হবে, পেছনে তাকাবার সময় নেই। টর্চের আলো লাফিয়ে লাফিয়ে উঠছে, কখনো সিঁড়ির ধাপে, কখনো সিঁড়ির ছাতে। সিঁড়ির পাশের দেয়ালে একটা লোহার দরজা—শিলা বুঝল। পায়ের শব্দ আরো কাছে এসে গেছে, নিচ থেকে একটা হিংস্র নিঃশ্বাসের আওয়াজ আসছে। হঠাৎ ছুরির ফলার মতো ধারালো একটা চিন্তা শিলার মনকে যেন কেটে দিল: যদি কেউ সিঁড়ির পথ বন্ধ করে দেয়, যদি কেউ অন্ধকারে দোতলার সিঁড়ির কাছে তার জন্য অপেক্ষা করে! শিলার পা দুটো থর্‌থর্ করে কাঁপতে লাগল। কিন্তু ভাববার সময়

নেই, পেছনে কে যেন লাফিয়ে লাফিয়ে এগিয়ে আসছে। আর একটু ···আর একটু···। হঠাৎ একটা বিশ্রী হাসির শব্দে শিলার যেন দম বন্ধ হয়ে গেল।

সিঁড়িব ধাপটা থেকে লাফিয়ে বাইরে এসেই শিলা কাঠের ডালাটা ফেলে দিল। এক মুহূর্তের জন্য টর্চের আলোয় সুড়ঙ্গের সিঁড়ির কয়েক ধাপ নিচ থেকে একটা কুৎসিত হাত দেখা গেল। কাঁপতে কাঁপতে কোনোমতে ছিটকিনিটা লাগিয়েই শিলা ছুটে দালানে নেমে এল।

খোলা জানলা দিয়ে দালানে শিলাব মাথা মুখ ঝড়েব ঝাপটায় বৃষ্টির জলে ভিজে যাচ্ছে। তখনো সে ছুটে চলেছে। দূবে সৌদামিনীর ঘরের আলো। একটাব পর একটা দরজা। বাইরে শোঁ-শোঁ শব্দে হাওয়া পাক খাচ্ছে, মেঘের ডাকে আকাশ ভেঙে পড়ছে। গাছের পাতায়, মাটিতে, দেয়ালে, ছাতে বৃষ্টিব ঝম্‌ঝম্ শব্দ। কোনোমতে ঘরে ঢুকে শিলা ইজিচেয়ারে এলিয়ে পড়ল। সৌদামিনী ঘুমের ঘোবে অস্পষ্ট স্বরে কী যেন বলে বিছানায় পাশ ফিবলেন।

শিবিরের অফিসে উঠে রবিশঙ্করকে সেখানে রেখেই গেলাম ডাক্তার মিত্রের সঙ্গে দেখা করতে। সৌদামিনীর রোগ সম্বন্ধে অনেকক্ষণ আলোচনা হল। কিন্তু এঁর ব্যক্তিগত জীবন সম্বন্ধে এতো কম জানি যে এই মনস্তত্ত্বঘটিত ব্যাধির সুবিধামতো বিধান করা গেল না। ডাক্তার মিত্র কয়েকটা ওষুধের নাম করলেন, কিন্তু বিশেষ করে বললেন সৌদামিনীর শারীরিক ও মানসিক পরিবর্তনের ওপর নজর রাখতে।

আহারাদির পর বিশ্রাম করে আমরা ছাতাওয়ালা গলির চীনে পাড়ায় যখন এসে পৌঁছলাম তখন সন্ধ্যা হয়ে গেছে। দুদিকে দোকানের সারি : রাস্তার ওপরেই চীনে মেয়েরা দাঁড়িয়ে গল্প করছে। ছোট ছোট চীনে ছেলে মেয়েরা রঙীন ছিটের কোর্তা ও পাজামা পরে ছুটোছুটি করছে। একটা হোটেলের সামনে এসে রবিশঙ্কর দাঁড়াল। কাঁচের জানলার পেছনে অনেক রকম পশুপক্ষী ছাল-ও-পালখ”ছাড়ানো অবস্থায় ঝুলছে পথিকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। দরজার ঠিক ওপরেই একটি পরিচ্ছন্ন সাইন বোর্ডে ইংরাজীতে লেখা : মান্দারিন্ কাফে। ইলেকট্রিকের আলোয় ছোট ঘরটি ঝকঝক করছে। ফিকে সবুজ রঙের দেয়ালের ধারে সাদা মার্বেলের ছোট ছোট টেবিল।

দুজনে ঢুকলাম ভেতরে। ঘরের শেষ দেয়ালে একটা দরজা : পর্দা ঝুলছে, পেছনে বোধ হয় রান্নার আয়োজন। ভালো মাখন ও মুর্গি সংযোগে কোনো উপাদেয় খাদ্যের গন্ধ বাতাসে ভেসে এল। পর্দার পাশেই কাউন্টারের কাছে একরাশ ফুলের পেছনে বসে একটি ছোট চীনে-মেয়ে মোজা বুনছিল, আমাদের দেখে এগিয়ে এল।

রবিশঙ্কর বলল : “কাটলেট আর কফি। তোমাদের এখানে

লাও-টুং থাকে? ডেকে দাও তো।” মেয়েটি একটু হেসে শাদা কাঠিতে বেঁধা পশমের গোলা ও মোজাটি নিয়ে পর্দা ঠেলে ভেতরে ঢুকে গেল। ঝকঝকে কাঁচের জার, বোতল ও প্লেটের সারি চোখে পড়ল।

একটু পরেই মধ্যবয়সী একটি চীনে স্ত্রীলোক খাবার নিয়ে এসে জানাল লাও-টুং আসছে। কাটলেটে কামড় দিয়েছি এমন সময়ে লাও-টুং পর্দা ঠেলে ঘরে ঢুকল। রবিশঙ্করের সঙ্গে ভাঙা হিন্দিতে সে বেশ গল্প জুড়ে দিল। আমরা তাকে খেতে বললাম। খেতে খেতে সে অনেক কথা বলতে লাগল। হোটেলওয়ালা তার ভগ্নীপতি, নাম চাং-টু। চীনে মহলে চাং-টুকে সকলেই চেনে, সে চীনে স্কুলের একজন মেম্বার।

আরো দু-চার কথার পর রবিশঙ্কর পকেট থেকে চীনে হরফের কাগজখানা বার করল। বলল: “টুং, এ কাগজে কী লেখা আছে বল তো? আমার এক বন্ধু তোমাদের ভাষা শিখছে, আমার কাছে এটা লিখে পাঠিয়েছে। কিছু বুঝতে পারছি না।”

লাও-টুং কাগজটা দেখে একটু অবাক হয়ে গেল। উত্তেজনায় আমাদের বুক কাঁপছে। রবিশঙ্কর আবার জিগেস করল: “কী লেখা আছে?”

টুং একটু চুপ করে থেকে আমাদের মুখের দিকে তাকিয়ে বলল: “ভালো কথা নয়। ‘মুচি ও দরজি ওয়াং-ফুর কাছে যাও।’”

আমি বললাম: “ওয়াং-ফু বলে সত্যিই কেউ আছে নাকি?”

রবিশঙ্কর বলল: “ভালো কথা নয় কেন?”

টুং বলল সে নিজে কাঠের কায করে, ওয়াংকে ভালো করে চেনে না। তবে একজন ওয়াঙের কথা শুনেছে—সে লোক খারাপ।

তার ভগ্নীপতি চাং-টু ঠিক খবর দিতে পারে। টুং উঠে গেল তাকে ডাকতে।

আমি বললাম: "সুড়ঙ্গের ঘরে চীনে কুলির আবির্ভাব বোঝা গেল এবার। কিন্তু তুমি ওয়াঙের খোঁজ কলকাতায় করছ কেন?"

শঙ্কর বলল: "বুঝতে পারছি সুড়ঙ্গের ঘরে আফিম-কোকেনের গুদাম আছে। কোনো চীনে দরজি ও মুচি সুন্দরবন অঞ্চলে থাকে না, তাহলে লাহিড়ি খোঁজ পেতেন। আমার বিশ্বাস ওয়াঙের হাত দিয়েই এসব জিনিষ কলকাতায় ছড়িয়ে পড়ে। চীনে হরফের মানে ত বোঝা গেল। কিন্তু বাক্সের মধ্যে সেই ছেলেটা?"

দুজনে খানিকক্ষণ এই নিয়ে আলোচনা করলাম। সেই ছোট মেয়েটি তার আরো ছোট ভাইটিকে নিয়ে আমাদের কাছে এসে দাঁড়াল—মুখে হাসি। বোধহয় সে জানতে পেরেছে তার মামা টুঙের সঙ্গে আমাদের আলাপ আছে।

একটু পরেই টুং চাং-টুকে নিয়ে এসে আমাদের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিল। চাং-টুর বেশভূষায় মনে হল সে একটু অবস্থাপন্ন চীনে। মোটাসোটা চেহারা, গায়ের রঙও উজ্জ্বল। কোর্তা ও পাজামা দামী কাপড়ের। গোল মুখটিতে ছোট ছোট চোখদুটি প্রায় অদৃশ্য।

পরিচয়ের পালা শেষ হলে রবিশঙ্কর তাকে জিগেস করল সে ওয়াংকে চেনে কি-না। চাং গম্ভীর হয়ে বলল: "কেন বলুন তো? তার সঙ্গে আমার পরিচয় নেই, তবে আমি জানি সে লোক বড়ো খারাপ।"

রবিশঙ্কর আবার জিগেস করল: "খারাপ কেন? সে তো মুচি, দরজির কাযও করে।"

চাং হেসে বলল : "তার বাড়ীর নিচের একটা ঘরে জুতোর দোকান, আর একটা ঘরে দরজির। কিন্তু সে নিজে মুচিও নয়, দরজিও না। তার অন্য ব্যবসা আছে—শুনেছি তার আফিম কোকেনের আড্ডা আছে। তাছাড়া সে গুণ্ডার দলের সর্দার।"

টুং বলল : "এরকম বদমায়েস লোকের সঙ্গে মিশতে যাবেন না, বিপদ হতে পারে।"

চাং আবার বলল : "আমি শুনেছি পুলিশ তার ওপর নজর রেখেছে। শুধু ঘুসের জোরে সে ব্যবসা চালাচ্ছে।"

"আমি একবার তার আফিমের আড্ডায় যেতে চাই, দেখবার বড়ো সখ। কোথায় থাকে সে? যেরকম করে হোক যাবার ব্যবস্থা করে দিতে হবে।" সর্বনাশ! যা ভেবেছিলাম তাই, শঙ্করের জেদ হয়েছে, আর উপায় নেই।

চাং-টু ও লাও-টুং দুজনেই বোঝাতে লাগল, অনেক বারণও করল, কিন্তু কোন ফল হল না। আমি চুপ করে রইলাম, ভাবলাম রাস্তায় বেরিয়ে যদি ওকে বোঝানো যায়।

শেষে চাং বলল : "বেশ, আপনার সখ হয়েছে, যান। তবে খুব সাবধানে থাকবেন। আড্ডায় প্রায় খুন জখম হয়ে থাকে। বৌবাজার স্ট্রীট ও বেন্‌টিঙ্ক স্ট্রিটের মধ্যে ওর কয়েকটা আড্ডা আছে। প্রথমে বেন্‌টিঙ্ক স্ট্রিটে দেখতে পারেন। তবে ঢুকতে পারবেন কি-না জানি না। হয়তো অপরিচিত লোককে ঢুকতে দেয় না। কী ভাবে, কোথা দিয়ে ঢুকতে হয় তাও ঠিক জানি না।" চাং বুঝিয়ে দিল বেন্‌টিঙ্ক স্ট্রী কোথায় গিয়ে ওয়াঙের আড্ডায় খোঁজ নিতে হবে।

খানিক দূর যেতেই চাং ডাকল। কাছে আসতে সে বলল: "একা যাবেন না ওয়াঙের কাছে, গেলেও নিশ্চয় ঢুকতে পাবেন না। বরং এক কাজ করুন। সিন্সাগগ্ স্ট্রিটে ইহুদি জেকব্ সাহেবের বাড়ীতে যান—শুনেছি তার সঙ্গে ওয়াঙেব খুব খাতির আছে। জেকবের এক চীনে চাকর আছে, নাম কাই-লুং। সে প্রায় রোজ ওয়াঙের কাছে যায়। গুণ্ডা হলেও সে আমার পরিচিত; আমি পাঠিয়েছি শুনলে সে নিশ্চয় আপনাদের নিয়ে যাবে। সে সঙ্গে থাকলে কোনো ভয় নেই।"

চাংকে আবার ধন্যবাদ দিয়ে এগোলাম। পথে রবিশঙ্করকে বোঝাতে অনেক চেষ্টা করলাম। সে শুধু বলল: "মুচি ও দরজি ওয়াং-ফুর কাছে যাও।' গিয়ে দেখা যাক কী হয়।"

রাতের পর রাত এক রাশ শুকনো পাতা উড়ে যায়, একটার পর একটা। বহুদিনের পুরোনো বেহালার সুরে রাতের পর রাত শুকনো পাতার আওয়াজ শোনে যোসেফ্ ভাসারমান্। কত আত্মা সারা রাত তাকে ঘিরে থাকে, রাতের শেষে শুকনো পাতার মতো তারা উড়ে যায়। 'জেরুসালেম্,' বেহালার সুরে ভাসারমান্ ডাকে 'জেরুসালেম্!' সেই পবিত্র ভূমি তার স্বপ্নের স্বদেশ।

সন্ধ্যার আহার শেষ করে সরু কাঠের সিঁড়ি বেয়ে ভাসারমান্ যখন নিজের ছোট ঘরটিতে আসে তখনই তার মনে শান্তি নামে। টেবিলের ওপর একটি বড় মোমবাতি সে অন্ধকারেই হাতড়ে হাতড়ে জ্বালে। মোমবাতির সোনালি আলো জ্বলে আর কাঁপে, দেয়ালে দেয়ালে ছায়া নাচে। সহরের অনেক ওপরে চিলকোঠার মধ্যে বসে ভাসারমান

ডাকে : হে প্রভু এলোহিম্, মুক্তি আনো, সময়ের কারাগার থেকে ঊর্ধ্বে ওঠো।

পাড়ার ইহুদিরা বলে অন্ধ পাগল যোসেফ ভবিষ্যৎ দেখতে পায়। সোনালি আলোয় ভাসারমানের মুখে নামে একটি গভীর প্রশান্তি, একটি পরম অপেক্ষার ভাব। ধর্মগ্রন্থ টাল্‌মাড্ থেকে ভাসারমান্ ঈশ্বরের বাণী উচ্চারণ করে যায়, আর তার চারধারে অশরীরী আকাশ-চারী আত্মারা ঘিরে বসে। হে প্রভু এলোহিম্, এলোহিম্, জেরুসালেমের স্বপ্ন সফল করো, ভাঙো মাংসের প্রাচীর, বন্দী মানবকে নিয়ে চলো তোমার জ্যোতির্ময় শূন্যের জগতে।

যোসেফের ভাই জেকব্। জেকব্ কিন্তু পাকা ব্যবসাদার, শাইলকের বংশধর। সিন্যাগগ্ স্ট্রীটে তার বাড়ী রাস্তা থেকে ছোট দেখায়, কিন্তু পেছনে সরু লম্বা। নিচে বাইরের ঘরগুলোয় দোকান করেছে মুসলমানেরা। পাশে সরু একটা দরজা, লম্বা গলির মতো পথ চলে গেছে পেছনের উঠানে। পথের দুধারে শুধু প্যাকিং কেস্ আর খড়ের গাদা।

উঠানে বসে লণ্ঠনের আলোয় কাই-লুং একটা বাক্স খুলছিল। এমন সময়ে আমরা গিয়ে হাজির হলাম। রবিশঙ্কর চাং-টুর কথা বলে ওয়াঙের আড্ডায় যেতে চাইল। লুং বলল একটু পরেই সে জেকব সাহেবের কাছ থেকে একটা চিঠি নিয়ে ওয়াঙের কাছে যাবে, আমাদেরও সঙ্গে নিয়ে যাবে।

কাই-লুঙের সঙ্গে যখন ওয়াং-ফুর বাড়ীর কাছে এসে পৌঁছলাম তখন রাত প্রায় দশটা। বেন্টিঙ্ক স্ট্রীটের কাছে একটা সরু গলিতে

ঘোরাঘুরি করে একটা পুরোনো ভাঙা বাড়ীর সামনে এলাম। এই বাড়ীর মধ্যে যাবার একটি সরু পথ, দুপাশে দুটি দোকান। প্রকাণ্ড বাড়ীর পেছন দিকটা বিশ্রী রকমের ভাঙা, এর সঙ্গে লাগানো আর একটি ভাঙা বাড়ী। জনপ্রাণী নেই, চারদিক অন্ধকার। ঘর থেকে ঘরে, সিঁড়ি দিয়ে উঠে আবার নেমে, বহু আবর্জনা ও ধুলোর গাদার ওপর পা ফেলে টর্চের আলোয় একটা দরজার সামনে আমরা এসে দাঁড়ালাম।

কাই-লুং একটু মুচকে হেসে বলল: "আফিম না কোকেন?"

রবিশঙ্কর তাড়াতাড়ি উত্তর দিল: "আফিম।" বুঝলাম লুং মনে করেছে আমরা নেশাখোর।

লুং দরজায় ধাক্কা দিতেই দরজা ফাঁক করে একটি চীনে মুখ বাড়াল। লুং তাকে চীনে ভাষায় কী যেন বলল, তারপরেই আমরা ভেতরে ঢুকলাম। রবিশঙ্কর জিগেস করল লুং চীনে ভাষায় কী বলল। সে ভাঙা দাঁতগুলো বার করে হেসে বলল: "ওয়াং-ফুর কাছে যাও।" আমরা স্তম্ভিত হয়ে গেলাম: এই কথাই তো সুড়ঙ্গের দরজায় লেখা ছিল।

সামনে একটা লম্বা নিচু ঘর—সিলিং থেকে কয়েকটা লণ্ঠন ঝুলছে। মিটমিটে আলোয় নানা জাতের লোক কয়েকটা টেবিলে কলাই করা থালায় ভাত আর মাংস নিয়ে বসেছে। লুঙের পেছনে এঘর পেরিয়ে আমরা আর একটা ঘরে এলাম। পর্দা ঠেলে তার পাশের ঘরে এসে দেখি চারদিক প্রায় একেবারে অন্ধকার। ঘরের কোণে ছোট একটা লণ্ঠন বসানো আছে। সমস্ত জানালা বন্ধ, পাশের দিকে একটি দরজা খোলা। তার ময়লা পর্দার ফাঁকে ওপরে ওঠবার কাঠের সিঁড়ি দেখা যাচ্ছে। চারটি দেয়ালের ধারে অনেকগুলি বেঞ্চি ও খাটিয়া।

ঘরের মাঝখানে একটা তক্তাপোষের ওপর সরু পাইপ লাগানো কতকগুলো হুঁকোর মত কি যেন রয়েছে। বুঝলাম এইগুলিই নেশার যন্ত্রপাতি।

কয়েকজন লোক নেশায় অবশ হয়ে শুয়ে পড়েছে। ঘরের হাওয়া ভারি হয়ে উঠেছে বিশ্রী গন্ধে ও ধোঁয়ায়। লুং হাতে তালি দিতেই একজন চীনে এসে আমাদের কাছে দুটি আফিমের পাত্র দিয়ে গেল। নিরুপায় হয়ে পাইপ নিয়ে বসলাম বেঞ্চিতে। লুং বলল ওপরে জুয়ার আড্ডা, সেখানে ওয়াং আছে। সে যাচ্ছে ওপরে ওয়াঙের কাছে, একটু পরেই আসবে। পাইপ টানার ভাণ করে দেয়ালে ঠেস্ দিয়ে দুজনে বসে রইলাম।

খানিক পরে একটা লোক ঘরে ঢুকেই সিড়ির দিকে এগিয়ে এল লণ্ঠনের আলো তার মুখে পড়তেই চমকে উঠলাম—ষ্টীমার ঘাটের সেই লোকটা। সে আমাদের দিকে একবার তাকিয়েই ওপরে উঠে গেল। রবি শঙ্কর বলল: "চিনতে পারেনি তো? আমাদের কিন্তু একবার ওপরে যেতেই হবে। সেখানে কী হচ্ছে দেখব। এই লোকটা নিশ্চয় ওয়াঙের সঙ্গে দেখা করতে এসেছে।"

রবিশঙ্করকে জিগেস করলাম ওপরে যাওয়া যাবে কী করে। "কেন লুঙের সঙ্গে জুয়া খেলতে।" মনে ভীষণ অস্বস্তি হতে লাগল। যদি কেউ একবার সন্দেহ করে তাহলে আর রক্ষা নেই। নিরস্ত্র অবস্থায় এরকম জায়গায় আশা উচিত হয়নি।

সিঁড়িতে পায়ের শব্দ হল, লুং নেমে আমাদের কাছে এল। রবিশঙ্কর চোখ মেলে বলল আমরা জুয়ার আড্ডায় যেতে চাই। ভাঙা দাঁতগুলো বার করে হেসে লুং আমাদের নিয়ে চলল ওপরে। সরু

সিঁড়ি প্রায় একেবারে অন্ধকার, অনেক ওপরে একটা লণ্ঠন জ্বলছে। সিঁড়ি দিয়ে উঠেই সামনে একটি ঘর। মাঝখানে টেবিলের ওপর একটা চাকা ঘুরছে, তাতে কতকগুলো নম্বর লেখা। টেবিল ভর্তি, দাঁড়িয়ে খেলা দেখতে লাগলাম। চাকা ঘুরে চলেছে, তাড়া তাড়া নোট হাত বদল হচ্ছে। যে লোকগুলো বসে আছে তাদের মুখে কুৎসিত লোভ। মুখগুলো একবার উজ্জ্বল হয়ে উঠছে আবার কালো হয়ে যাচ্ছে।

কাই লুং বলল সর্দার আছেন পাশের ঘরে—ভারি ব্যস্ত! পাশের ঘর থেকে মাঝে মাঝে গলার শব্দ আসছিল, হঠাৎ গণ্ডগোল আরম্ভ হয়ে গেল। তারপর কয়েকটা চীৎকার, ভারি কতকগুলো জিনিষও যেন ঘরের মেঝেয় গড়িয়ে পড়ল। দরজা খুলে কে যেন ছুটে এল সিঁড়ির দিকে, তার পেছনে একটা চীনে। লণ্ঠনের আলোয় দেখলাম তার কপাল দিয়ে রক্ত ঝরছে। দুজনে জড়াজড়ি করে সিঁড়ির মুখে পড়ে গেল। এক মুহূর্তের মধ্যে কী যে বিপর্যয় ঘটে গেল তা ভাষায় বোঝানো যায় না। চীৎকার, মারামারি, দরজা খোলার শব্দ। আমাদের ঘরেও টাকা নিয়ে গণ্ডগোল বেধে গেল। সিঁড়ির দিকে তাকিয়ে দেখি অনেকেরই হাতে ছোরা, রক্তপাতও আরম্ভ হয়েছে। হঠাৎ লাথি মেরে ঘরের লণ্ঠনটা কে যেন ফেলে দিল, অন্ধকারের মধ্যে তখন বীভৎস কাণ্ড হতে লাগল। তারপর সিড়ির লণ্ঠনও ভাঙল। ভয়ে কাঁপছি, কখন আমার ওপর ছোরা এসে পড়ে! শঙ্কর ও লুংকে বার বার ডাকতে লাগলাম। কিন্তু চারদিকের চীৎকারের মধ্যে তাদের সাড়া পেলাম না।

মনে হল সিঁড়ির কাছ থেকে ভিড়টা যেন অন্য দিকে সরে গেছে। অন্ধকারে হাতড়ে হাতড়ে সাবধানে পা ফেলে নিচে নামতে লাগলাম।

প্রতি মুহূর্তেই ভয়, এবার বুঝি কেউ এসে পড়ে। নেমে দেখি নিচেও গণ্ডগোল। দেয়ালের গা ঘেঁসে সাবধানে এগোতে লাগলাম। খুব কাছেই কে যেন চীৎকার করে পড়ে গেল—আর একটি খুন হল! দাঁড়িয়ে পড়লাম।

হঠাৎ কে যেন হাত ধরে টানল। "বিভূতি নাকি? আমি শঙ্কর, তোমাকে খুঁজছি এতক্ষণ। চল পালাই, ভয় নেই, সঙ্গে লুং আছে। ডান দিকে চল।" অনেক কষ্টে আমরা তিনজনে দরজার বাইরে এলাম। তারপর টর্চের আলোয় কতো ভাঙা ভাঙা ঘরের ভেতর দিয়ে, কত উঠান পেরিয়ে, সিঁড়ি ভেঙে যখন রাস্তায় এসে দাঁড়ালাম তখন রাত একটা। আমরা দুজনেই অক্ষত আছি, কিন্তু কাইলুঙের কপাল ফুলে ঢিপি হয়ে উঠেছে আর তার একটা হাত থেকে সামান্য রক্ত ঝরছে। লুং দাঁত বার করে হেসে জানাল অনেক খুন হয়েছে, কিন্তু ওযাং ঠিক লাস লুকিয়ে ফেলবে।

লুংকে বখশিস্ দিয়ে আমরা শিবিরের অফিসে ফিরলাম। আমি বললাম: "অমরবাবুকে খবর দেওয়া দরকার এই আড্ডার সম্বন্ধে। পুলিস বেণ্টিঙ্ক ষ্ট্রীটের বাড়ীর খোঁজ পেলেই যে রকম করে হোক নিশ্চয়ই এই আড্ডাকে ধরতে পারবে। তা ছাড়া সুড়ঙ্গের ঘরেও অনেক কিছু বেরোবে।"

শঙ্কর বলল: "আমরা কালই চলে যাব। যাবার আগে অমরবাবুর কাছে যাতে খবর পৌঁছয় পুলিস অফিসে সে ব্যবস্থা করে যেতে হবে।"

দিনের আলোয় গত রাত্রির ভয় অনেকটা কেটে গেল। মুনিয়াকে সঙ্গে নিয়ে শিলা আবার সারা বাড়ীটা দেখে বেড়াল। সীতারাম ও লেহাইকে সে জিগেস করল তারা কিছু লক্ষ্য করেছে কি-না। তারা বলল যে ঝড়বৃষ্টির মধ্যে চোখে বিশেষ কিছুই পড়েনি, তবে অনেক রাতে তারা একবার বাঁশীর আওয়াজের মতো শব্দ শুনেছে।

মুনিয়ার সঙ্গে বাড়ীর ভাঙা অংশটা পেরিয়ে শিলা খালের ধারে এসে দাঁড়াল। ওপারে ঘন জঙ্গল, এপারেও বড় বড় গাছ ও ঝোপ সবুজ ঘাসের জমি গড়িয়ে নেমেছে খালের মধ্যে।

মুনিয়া অনর্গল কথা বলে চলেছে। শিলা শুধু মাঝে মাঝে দু-একটা কথা জিগেস করছে, চোখ রয়েছে খালের ধারে। রাজবাড়ী পার হয়ে শিলা এগিয়ে চলল। গত রাত্রের বৃষ্টিতে খালের জল আরো বেড়ে উঠেছে। খালের ধারের জমি কোথাও খুব উঁচু, কোথাও আবার অনেক নেমে গেছে।

মুনিয়া একবার জিগেস করল বাবুরা কবে ফিরবেন। শিলা বলল সে ঠিক জানে না।

এক জায়গায় জমিটা হঠাৎ ঢিপির মতো উঁচু হয়ে উঠেছে, সেখানে প্রকাণ্ড একটা গাছ। ডালপালায় গাছের তলাটা অন্ধকার হয়ে আছে। খালের জল অনেক নিচ দিয়ে চলেছে। গাছের তলা থেকেই জমি ঢালু হয়ে খালের জলে নেমেছে : লম্বা ঘাসগুলো জলের ঘায়ে কাঁপছে। জমির ওপর অনেকগুলো ঝোপ রয়েছে। জল থেকে চার-পাঁচ হাত ওপরে একটা ঝোপের তলায় কাঠের খোঁটা পোঁতা আছে। শিলা থমকে দাঁড়িয়ে অনেকক্ষণ ভাল করে দেখল। মুনিয়াকে গাছতলায়

রেখে সে ঝোপটার কাছে নেমে এল। উঁকি মেরে ঝোপটার ভেতরে ভাল করে দেখে সে ওপরে উঠে এল।

মুনিয়া বলল : "দিদি, এবার ফিরে চল। আবার কখন বৃষ্টি নামবে।"

গড়ের দোতলায় ফিরে এসে শিলা সৌদামিনীর সঙ্গে কথা বলতে লাগল। তাঁকে জানাল যে চিকিৎসার ব্যবস্থা করতে ছেলেদুটি কলকাতায় গেছে, দু-এক দিনের মধ্যেই ফিরবে। সৌদামিনী বেশি কথা বলছেন না, মাঝে মাঝে শিলার দিকে একদৃষ্টে চেয়ে আছেন। মুখের ওপর অসুস্থতার লক্ষণ বেশ স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। কিন্তু মুখটা বিবর্ণ নয়, রয়েছে উত্তেজনার রক্তাভ আভাস।

বিকালের দিকে ভবতারণবাবু এলেন। সামনের মাঠে শিলা তাঁর সঙ্গে খানিকক্ষণ কথা বলল। অনেক কথাই জিগেস করল। "আপনি তো স্টীমারঘাটে রোজই থাকেন, এখানকার কোনো বাসিন্দা নিয়মিত ভাবে স্টীমারে যাতায়াত করে?" শিলা স্টীমারঘাটের সেই লোকটার চেহারার বর্ণনা দিল।

ভবতারণ বললেন : "হাঁ, হাঁ, সে তো প্রায়ই স্টীমারে আসে। এই তো দু-একদিন আগেই গেল।"

"আপনি নিশ্চয় এখানকার অনেক খবরই রাখেন। এ লোকটি কোথায় থাকে বলতে পারেন?" ভবতারণ এবার চিন্তিত হয়ে পড়লেন। এ লোকটা এখানে কোথায় থাকে তিনি জানেন না। এখানকার কোন লোকের সঙ্গে তাকে কথা বলতেও তিনি দেখেননি।

উত্তেজিত হয়ে ভবতারণ এবার জিগেস করলেন: "তাহলে এই লোকটাই খুন······"

শিলা বাধা দিল: "না, খুন জখমের কথা উঠছে না। তবে, এর ওপর একটু নজর রাখতে পারেন যখন একে আবার দেখবেন।" ভবতারণ উৎসাহের সঙ্গেই এ ভার নিলেন।

শিলা জিগেস করল: "এ অঞ্চলে খুনজখম বেশি হয়?"

ভবতারণ জানালেন তিনি যে কয় বছর এখানে কায করছেন তার মধ্যে বেশি খুনজখম হয়নি। তবে বছরখানেক আগে থেকে এই অঞ্চলের আশপাশের ছেলে-মেয়ে চুরি হতে থাকে। লোকে কার্ফুকে কী জানি কেন সন্দেহ করে। কার্ফু ছিল কালীশ্বরীর ডান হাত, সেজন্য লোকে কালীশ্বরীকেও দোষ দিতে থাকে। অনেকে আবার বলে যে বনের ভেতরে নাকি ডাইনীর বাসা আছে, লোকে বনের মধ্যে আলো দেখেছে। মাতাল অবস্থায় কার্ফুকে ঢুকতে দেখেছে অনেকে। এই অঞ্চলের এক আধ-পাগল জংলী, নাম রোহেম, ছিল কার্ফুর বন্ধু। লোকের বিশ্বাস এদের অসাধ্য কুকর্ম নেই।

শিলা আর কিছু বলল না, ভাবতে লাগল। ভবতারণ জিগেস করলেন: "খুনের সম্বন্ধে কী করলেন?"

শিলা একটু হেসে বলল: "দেখুন, হয়তো দু-এক দিনের মধ্যে কিছু জানতে পারবেন?"

সারা সন্ধ্যা শিলার অস্বস্তিতে কাটল। রাত্রির ছায়া ও অন্ধকার যতো ঘন হয়ে আসে তার মনের চঞ্চলতাও ততো বাড়ে। মনে হচ্ছে যেন এই অদ্ভুত রহস্যের ওপর এইবার যবনিকা নামবে: প্রত্যেকটি পলাতক মুহূর্ত ছুটে চলেছে এই মহানাটকের পঞ্চমাঙ্কে। মন

অস্থির, মন চঞ্চল। কিন্তু যা আছে জটিল এবার তা হবে সহজ ও সরল।

মনের মধ্যে একটা সন্দেহ ক্রমে ধারণার আকার নিচ্ছে। মনে হচ্ছে সে বুঝতে পারছে কে এই খুন করেছে। কিন্তু তবু বিভূতিদের খবরের ওপর হয়তো সব কিছু নির্ভর করছে, হয়ত তার ধারণা বদলে যাবে। ছেলে-মেয়ে চুরি হত কেন? লোকে কার্ফুকে সন্দেহ করে? মুনিয়াও বলেছিল একবার একদল বেদে এসে রাজবাড়ী চড়াও করেছিল তাদের মেয়ে হারিয়ে গেছে বলে। কী অদ্ভুত লোক এই কালীশ্বরী। বাঙালীর ঘরে যে এরকম স্ত্রীলোক থাকতে পারে তা বিশ্বাস করাই শক্ত। কিন্তু অবিশ্বাসেরই বা কী কারণ আছে! কতো সময়ে গ্রামে শোনা যায় ডাইনীর কথা: হয়ত কালীশ্বরী এই রকম দুর্দান্ত স্বভাবের লোক ছিলেন।

কালকের মতো আজও রাতের আকাশ মেঘে কালো হয়ে গেছে। আবহাওয়ায় একটা থমথমে ভাব। নিস্তব্ধ ঘরে লণ্ঠনের মিটমিট আলোয় প্রেতপুরীর মতো এই রাজবাড়ীর মূক রহস্য শিলার চারধারে ঘন কুয়াসার মতো ঘিরে এল। সময় নেই, আর সময় নেই প্রত্যেকটি নিঃশ্বাসের সঙ্গে মুহূর্তগুলো তাকে ঠেলে নিয়ে চলেছে কোন চরম পরিসমাপ্তির দিকে। হয়ত আজ রাত আর কাটবে না যদি কাটে, ভোরের আলোয় এ রহস্য মরে যাবে।

সৌদামিনী এখন জ্বরে প্রায় অচৈতন্য হয়ে পড়েছেন। শিলার মনে হল তাঁরও শেষ মুহূর্ত এগিয়ে আসছে: প্রথম থেকেই তার মনে হয়েছে এ অসুখ স্বাভাবিক নয়, এর পরিণতিও স্বাভাবিক হবে না। ক্লান্তিতে শিলার শরীর ভেঙে পড়ছে, খুনের কথা যতো

ভাবছে ততোই তার মনটা খারাপ হয়ে যাচ্ছে। মানুষের জীবনে কখন যেন অদৃশ্য শত্রু আসে, কালপুরুষের ছায়া পড়ে: সহজ স্বাভাবিক জীবন হয়ে ওঠে বিকৃত, পঙ্কিল। সম্পূর্ণ বৈজ্ঞানিক মন নিয়ে শিলা আজ ভাবতে পারছে না। মানুষের অপরাধ-প্রবৃত্তি যে মস্তিষ্কের একরকম বিকার—এই বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা, সন্তোষজনক হলেও, জীবনের দুঃখ ও অশুভ মুহূর্তগুলি দূর করতে পারে না। মানুষের জীবন ও সৃষ্টির জটিল রহস্য হঠাৎ শিলার মনকে অভিভূত, অবসন্ন, অবশ করে তুলল।

ঘুমে চোখ জড়িয়ে আসছে, মাথার ভেতরে একটা অস্বস্তি হচ্ছে। শিলা প্রাণপণ চেষ্টা করল জেগে থাকতে। রাত্রির ব্যাপার লক্ষ্য করাই শুধু তার একমাত্র উদ্দেশ্য নয়, নিঃশ্বাসপতনের সঙ্গে সঙ্গেই আসন্ন বিপদের আভাস আসছে। আবাব ঝড়বৃষ্টি আরম্ভ হল: রাশি রাশি হাওয়া সাবা বাড়ী ঘিবে ফুলে উঠল, আব সেই সঙ্গে মেঘে মেঘে কালপুরুষের পদক্ষেপ। বহুপ্রাচীন জবাজীর্ণ বাড়ীর আত্মা ধীবে ধীরে শিলার ওপব ভর করল!

হঠাৎ চীৎকার করে সৌদামিনী বিছানার ওপরে উঠে বসলেন। অসুস্থ উত্তেজনায় মুখ শাদা হয়ে গেছে, বড় বড় চোখ দুটি বেরিয়ে আসছে। চীৎকার করে উঠলেন: "রক্তে তোমার শরীর ভেসে যাচ্ছে, সরে যাও। হাসছো কেন? কেন?"

শিলা স্তম্ভিত হয়ে গেল, দেখল সৌদামিনী বিছানা থেকে নামবার চেষ্টা করছেন। সমস্ত শরীর থর থর করে কাঁপছে। শিলা ছুটে গেল খাটের দিকে, মনে হল বিছানার ধার থেকে কে যেন সরে দাঁড়াল। সৌদামিনী আবার চীৎকার করে উঠলেন: "দিনের পর দিন তুমি

আমার ওপর অত্যাচার করছ। তোমার কুৎসিত কায়ে রাতের পর রাত আমাকে টেনে নিয়ে গেছ।”

সৌদামিনী বিছানা থেকে নেমে দাঁড়ালেন। জ্বর-বিকারের এই প্রলাপ, ঝড়ের গোঁয়ানি, বৃষ্টির শব্দ—সমস্ত জড়িয়ে একটা ভয়াবহ আবহাওয়ার সৃষ্টি হল। শিলা দেখল নুনিয়া ঘুম থেকে জেগে ভয়ে কাঁপছে। শিলা জোর করে সৌদামিনীকে শোয়াবার চেষ্টা করল। কী অমানুষিক শক্তি—সমস্ত শরীর যেন লোহার মত শক্ত হয়ে গেছে! কিন্তু, আশ্চর্য, গায়ে জ্বর আছে বলে মনে হল না। হাতের ঝাঁকানিতে শিলাকে বিছানার ওপরে ঠেলে ফেলে সৌদামিনী এগিয়ে এলেন। হঠাৎ একটা কুৎসিত হাসির শব্দে চমকে উঠে শিলা দেখল সৌদামিনীর মুখ বিকৃত হয়ে গেছে, শরীর টলছে, হাসির চাপে যেন ভেঙে পড়ছেন। শিলার বুক ঠাণ্ডা হয়ে গেল, মনে হল যেন কোন অদৃশ্য আত্মা এসে ঘরের মধ্যে দাঁড়িয়েছে, হাতছানি দিয়ে ইঙ্গিতে সৌদামিনীকে ডাকছে।

আবার হাসিতে সৌদামিনী ফেটে পড়লেন। “ডাকছো কেন? রোজ তোমার ডাক শুনতে পাই। একা থাকতে পারো না?” গলার স্বর অবসন্ন হয়ে এল: “তুমি যাও, আমি যাবো না।” আবার উত্তেজিত হয়ে উঠলেন: “ভয় দেখাচ্ছো? যাও, যাও, চলে যাও।”

সৌদামিনী ক্লান্ত হয়ে বিছানার দিকে ফিরলেন, চোখ বুজে এসেছে, অন্ধের মত হাতড়ে হাতড়ে এগিয়ে আসছেন। নুনিয়া উঠে এল। ধরাধরি করে সৌদামিনীকে শোয়ান হল। সমস্ত শরীর ঘামে ভেসে যাচ্ছে, থরথর করে কাঁপছেন। অস্পষ্ট স্বরে সৌদামিনী বলতে লাগলেন: “আবার……আবার আসবে……আসবে।” কথা মিলিয়ে গেল।

সোদামিনী আবার অচৈতন্যের মতো হয়ে পড়লেন। শিলা বিছানার ধারে অনেকক্ষণ অপেক্ষা করল, তারপর ইজিচেয়ারে এসে বসল।

"মুনিয়া, আগে ওঁর এরকম কখনো হয়েছিল?"

"না, দিদি। অসুখ বড়ো বেড়েছে, না?"

শিলা ঘড়িতে দেখল রাত প্রায় বারোটা। মুনিয়া খানিকক্ষণ বসে থেকে আবার ঘুমিয়ে পড়ল। একটা চিন্তা সারা দিন শিলার মনে কাঁটার মতো বিঁধে আছে। বার বার নিজের কাছ থেকেও সেটাকে শিলা গোপন করবার চেষ্টা করছে। কাল রাত্রে সুড়ঙ্গের সিঁড়িতে সে কার পায়ের শব্দ শুনেছিল? কার বিশ্রী হাত সে দেখেছিল? হয়ত দৃষ্টিভ্রম। কিন্তু পায়ের শব্দ? হাসির আওয়াজ? বিভূতিরাও শুনেছিল এই হাসি, দেখেছিল এক মূর্তি। যদি সেই হাতটা তার পা চেপে ধরত? শিলা শিউরে উঠল।

শরীর ঘুমে ভরে উঠল, চোখ আর খুলে রাখা যায় না। তবু জেগে থাকতেই হবে। রক্তে সে অনুভব করছে যে আজ রাতেই আসবে সমাপ্তি। হয়তো মৃত্যু আছে অদৃষ্টে, কিন্তু মৃত্যুব চিন্তায় তার ভয় হল না। শুধু এই অপেক্ষা, দেহমন সজাগ রেখে প্রত্যেকটি মুহূর্ত অপেক্ষা করে থাকা—এ বড়ো কষ্টকব। মনটা কেমন বিষণ্ণ হয়ে আসছে, দুর্বল হয়ে আসছে।

শিলা চেষ্টা করল চোখদুটো খুলে রাখতে, কিন্তু ঘুমের মোহে দেহ অবশ হয়ে এসেছে। শিলা ইজিচেয়ারে এলিয়ে পড়ল, ঘুমের ঘোরে কানে এল ঝড়ের গোঙানির সঙ্গে মেঘের ডাক আর বৃষ্টির ঝম্‌ঝম্‌ শব্দ।

মোমবাতির সোনালি আলোয় ভাসারমানের কটা চুল সোনালি হয়ে উঠেছে।

মনে তার আজ শান্তি নেই। বাইরের উন্মত্ত প্রকৃতির সঙ্গে সুর মিলিয়ে ভাসারমান্ ডাকল: হে প্রভু এলোহিম্, পৃথিবীতে ধ্বংস আনো, ভেসে যাক্ এই পাপের জগৎ। আবার আসুক আলোয় উজ্জ্বল, নতুন ঘাসে ভরা নোয়া-র পৃথিবী। হে প্রভু এলোহিম্, জেরুসালেমের স্বপ্ন সফল কর।

ভাসারমানের মন আজ ঝড়ের রাতে অস্থির, চঞ্চল: আত্মারা আজ ফিরে গেছে: ঘরের হাওয়ায় আসন্ন মৃত্যুর পদধ্বনি।

কাঠের সিঁড়ির ধাপে ধাপে কার পা টিপে চলার আওয়াজ। ভাসারমানের সমস্ত ইন্দ্রিয় তীক্ষ্ণ হয়ে উঠল। পুরোনো টালমাডের ওপর হাত রেখে সে উঠে দাঁড়াল: দরজা খুলে কে যেন তার দিকে এগিয়ে আসছে।

পকেটের মধ্যে হাত রেখে ভাসারমান্ নিষ্পলক চোখদুটি তুলে বলল: "কে?"

উত্তর এল: "আমি ওয়াং।"

"তোমাকে চিনি না।" হাসির শব্দে ভাসারমান্ চমকে উঠল।

"আমি তোমাকে চিনে ফেলেছি। তুমিই আসলে এ দলের নেতা। আমরা পুলিশের চোখ এড়িয়ে ব্যবসা চালাই, আর লাভের টাকা তুমি পাঠাও প্যালেস্টাইনে। তোমার ভাই জেকব্ কাল রাতে আমাকে খুন করতে লোক পাঠিয়েছিল। আজ আমি তাকে খুন করেছি। এবার তোমার পালা।"

ওয়াং এগোল, তারপরেই একবার চীৎকার করে পড়ে গেল। ভাসার্‌মানের হাতের ছোরা আলোয় ঝল্‌সে উঠেই লাল হয়ে গেল।

অন্ধ ইহুদি! লোকে তাই জানে, জানুক। হে প্রভু এলোহিম্‌, জেরুসালেমের স্বপ্ন সফল করো। গোপন ইহুদি দলের সর্দার যোসেফ্‌ ভাসার্‌মান্‌ দরজা বন্ধ করে নেমে এল।

সোনালি আলোর শিখা একবার কেঁপেই আবার হল অচঞ্চল। ঘরের হাওয়ায় তখন থেমে গেছে মৃত্যুর পদধ্বনি।

মাটির নিচে ঘন অন্ধকারের জগৎ স্তব্ধ, নীরব। ঘন অন্ধকারের মধ্যে বাঁশী বাজতে লাগল : কতো অজানা ভয় জেগে উঠল বাঁশীর সুরে।

সুড়ঙ্গের খোলা মুখ দিয়ে ঝড়ের হাওয়া এবার দমকে দমকে ঢুকতে লাগল। ওপরের পৃথিবীর মত্ততা এবার সুড়ঙ্গের জগতে নামছে। বাঁশীর আওয়াজের সঙ্গে কে যেন এগিয়ে চলল সুড়ঙ্গের পথে, বাঁক থেকে বাঁকে। হাসিতে তার মুখ উজ্জ্বল, অন্ধকারে তার চোখ জ্বলছে। সে এল কুয়োর তলায়, আবার ঘুরে চলল গোপন সিঁড়ির দিকে। বাঁশীর সুরে সিঁড়ির বদ্ধ হাওয়া কাঁপতে লাগল।

আর ভালো লাগেনা তার ঘুরে বেড়াতে। সে উঠতে লাগল সিঁড়ি দিয়ে : এক ধাপ…আর এক ধাপ…। হঠাৎ ওপরে কিসের শব্দ হল, একবার থমকে দাঁড়িয়েই সে সিঁড়ি বেয়ে নেমে চলল সুড়ঙ্গের পথে—বাঁক থেকে বাঁকে।

আবার অন্ধকারে কাঁপতে লাগল বাঁশীর সুর—বিষণ্ণ, অস্থির, চঞ্চল।

রাশি রাশি চুলের স্রোত। আবার খালের ছবি বদলে গেল। এবার জল ফুলে ফুলে উঠছে। কে যেন সাঁতার দিয়ে চলেছে, একবার মুখ ফেরাল। কী বিষণ্ণ মুখ! মুখটা চেনা-চেনা লাগছে। কার? কার? কী আশ্চর্য্য! এ তো তার নিজেরই মুখ! তার পেছনে সাঁতার দিয়ে চলেছে কে যেন? না, একেও সে চেনে। তার পেছনে আর একজন। দেখতে দেখতে জলের স্রোত ভরে উঠল নরমুণ্ডে।

শিলা স্বপ্ন দেখছে। ঘুমের মধ্যেই শরীরে একটা অস্বস্তি বোধ হল। কে যেন কাছ ঘেঁসে দাঁড়িয়ে সারা গায়ে নিশ্বাস ফেলছে। নিঃশ্বাসের ছোঁয়ায় শরীর অবশ হয়ে আসছে। হঠাৎ যেন দম বন্ধ হয়ে গেল।

জেগে উঠেও শিলার মনে হল সে যেন স্বপ্ন দেখছে। দু হাতে তার গলা চেপে ধরে একটা মূর্তি তার মুখের ওপর ঝুঁকে পড়েছে, খোলা চোখ দুটো থেকে যেন মৃত্যু তার দিকে চেয়ে আছে। শিলা হাত দুটো সরাবার চেষ্টা করল। কী অস্বাভাবিক শক্তি দুটো হাতে! এক ঝাঁকানিতে শিলাকে সোজা দাঁড় করিয়ে সে মূর্তি শিলাকে টেনে নিয়ে চলল পেছনের দালানের দিকে। পলকহীন চোখদুটোর দিকে তাকিয়ে মনের সমস্ত শক্তি শিলার হারিয়ে গেছে। কোনো বাধা না দিয়ে মন্ত্রমুগ্ধের মতো, অন্ধের মতো সে এগিয়ে চলল। দরজার পর দরজা। শিলা অজ্ঞান হয়ে গেল।

ঝড়ের চাপে ষ্টীমার আর এগোয় না। পাছে ষ্টীমার উলটে যায়

কেবিনগুলোর মধ্য দিয়ে ঘুরে বেড়াতে লাগল। আকাশ পুরো অন্ধকারে ঢেকে গেছে, চারদিকে কিছুই দেখা যায় না। ষ্টীমারের তীব্র আলোয় চোখে পড়ে শুধু নদীর জলের অক্লান্ত স্রোত, আর বৃষ্টির অবিরল ধারা।

রবিশঙ্কর ঘুমোতে পারল না, বার বার মনে হচ্ছে রাজবাড়ীর কথা। এই প্রলয়কাণ্ডের মধ্যে সেখানে কী হচ্ছে কে জানে! অমরবাবুর কাছে তদন্তের ফলাফল জানিয়ে এক লম্বা চিঠি সে লিখেছে। দেখা যাক কী হয়।

হঠাৎ ঝড়ের ধাক্কায় ষ্টীমার হেলে পড়ল: নিচ থেকে একটা সোরগোল উঠল। তারপব আবার সব চুপচাপ: খোলা আকাশের তলায় নদীব ওপর ঝড়ের হাহাকার আর বৃষ্টির ঝম্‌ঝম্‌ শব্দ।

শিলা এখন কী করছে?

রবিশঙ্করের শুধু এক চিন্তা: ষ্টীমার যেন ঠিক সময়ে গিয়ে পৌঁছয়। আচ্ছা সৌদামিনীর অসুখটা কী? এর কোনো চিকিৎসা নেই?

বাইরেব দিকে তাকিয়ে দেখল রবিশঙ্কর, মনে হল বৃষ্টিটা যেন একটু কমেছে। ঝড়ের বেগও অনেকটা নেমে গেছে। তাই হোক, তাই হোক, ষ্টীমার যেন সময়মতো পৌঁছয়। রবিশঙ্কব এবার একটু ঘুমিয়ে নেবাব চেষ্টা কবল।

শিলায় যখন জ্ঞান হল তখন দেখল সে একটা পাথরেব বেদীর ওপর শুয়ে আছে : তার হাত-পা বাঁধা। প্রকাণ্ড নিচু ঘর : অন্ধকারের মধ্যে কোথা থেকে আলো আসছে। অনেক কষ্টে মাথা ঘুবিয়ে সে দেখল ঘবের কোণে অনেক দূরে একটা লণ্ঠন জ্বলছে। ঘব নিস্তব্ধ, কেউ নেই। যে অদ্ভুত মোহের মধ্যে সে ঘর থেকে বেবিয়ে এসেছিল সে মোহ এখন কেটে গেছে। কী কবে এল সে এখানে ? কে-ই বা নিয়ে এল ? মনে পড়েছে সেই মূর্তিব কথা। কিন্তু কোথায সে ?

কিন্তু শিলার এখন আব ভয় কবছে না : একবাব বিপদের মধ্যে এসে পড়লে বোধহয় মনেব অবস্থা এই রকমই হয়। আজ সাবা দিন সে রক্তে অনুভব করেছে বিপদেব ইসারা, চেষ্টাও কবেছে সাবধানে থাকতে, কিন্তু হঠাৎ কোন অদৃশ্য শক্তি ব্যর্থ করে দিয়েছে তাব চেষ্টা। মাঝে মাঝে শিলা চমকে উঠছে : সে এখানে কেন ? সে শিলা সেন এই অন্ধকার ঘবে পাথরেব বেদীব ওপব হাত-পা-বাঁধা হয়ে শুয়ে আছে কেন ? কোথায় ক্যামাক্ স্ট্রীট্ আব কোথায় এই বহস্যময় বাজবাড়ী ! মাটিব তলার সুড়ঙ্গের জগৎ শিলাকে বিহ্বল কবে দিল, মাথাব চিন্তাগুলো এলোমেলো হয়ে যাচ্ছে।

দড়ির বাঁধনে হাত-পায়ে বেশ অস্বস্তি আরম্ভ হয়েছে। শিলা পাশ ফেরবার চেষ্টা কবল। হঠাৎ চোখে পড়ল পাশেই এক বিবাট মূর্তি। এতক্ষণ এদিকে তাকায়নি, দেখতেও পায়নি। চোখটা অন্ধকাবে অভ্যস্ত হয়ে এসেছে : একটু ভাল করে তাকিয়ে অন্ধকারেব মধ্যেও সে বুঝতে পারল এটা পাথরের মূর্তি। একরাশ চিন্তা, অনেক শোনা কথা মাথার মধ্যে স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে।

তাহলে আর সময় নেই, সময় নেই। শিলার বুকের ভেতরটা একটু মোচড় দিয়ে উঠল নিষ্ঠুর মৃত্যুর চিন্তায়। তারপর মাথাটা হঠাৎ একেবারে পরিষ্কার হয়ে গেল। না বাঁচতে হবে, পশুর মতো সে প্রাণ হারাবে না। বাঁধন ছেঁড়ার জন্য সে প্রাণপণ চেষ্টা করতে লাগল, কঠিন বাঁধন একটুও আলগা হল না। শিলা ক্লান্ত হয়ে পড়ল।

কই কেউ তো আসে না! খোলা দরজা দিয়ে মাঝে মাঝে হাওয়া আসছে। শিলার শরীর শিউরে উঠল ঠাণ্ডা হাওয়ার ছোঁয়ায়। পাশের মূর্তির দিকে সে আবার তাকাল। নিশ্চল, নিষ্প্রাণ পাষাণ—এ কোন দেবতা? শিলা চেষ্টা করল ভাল করে দেখতে। লণ্ঠনের ক্ষীণ আলোয় সে বুঝল এরকম কোন দেবতার মূর্তি সে আগে কখনো দেখেনি। কী অদ্ভুত উদাস চোখ দুটো—ওপরের দিকে চেয়ে আছে! কালো পাথরের দেহটা বেঁকে গেছে একটা বিশ্রী ভঙ্গীতে। শিলার মনে হল নিশ্চয় এ কোনো আদিম জাতির দেবতা। দেবমূর্তির সামনে প্রকাণ্ড একটা পাথরের পাত্র—রক্তের ছাপ তা'তে।

বেদী থেকে খানিকটা দূরে মাটির একটা গর্ত থেকে শীর্ণ ধোঁয়ার রেখা উঠছে, ধূপ-ধূনো নয়, তবে ঐ রকম কোনো কিছুর কড়া গন্ধে ঘরের হাওয়া ভারি হয়ে উঠেছে। পাষাণ বিগ্রহের মুখে কী যেন মোহ ছিল, শিলা সেদিকে তাকিয়ে চোখ ফেরাতে পারল না। হোমকুণ্ডের ধোঁয়া বাড়তে লাগল…ধীরে ধীরে সমস্ত ঘরটা ধোঁয়ায় ভরে উঠল… লণ্ঠনের আলো যেন নিভে এল। শিলার শরীর শিথিল হয়ে আসছে, ধোঁয়ার কড়া মাদক গন্ধে মাথার মধ্যে অস্বস্তি হচ্ছে: সে প্রাণপণে চেষ্টা করল দেহমন সজাগ রাখতে, বৃথা চেষ্টা! শরীর ঘামে

ধীরে ধীরে

সচেতন মন তলিয়ে গেল অচেতন অন্ধকারে : আমাদের রক্তে বহুশতাব্দীর যে ইতিহাস সঞ্চিত আছে তারই কোন আদিম যুগ ধীরে ধীরে জেগে উঠল মনের অন্ধকার গুহায়। শতাব্দীর পর শতাব্দী, পটের পর পট বদলে চলেছে! মিলিয়ে গেল, হারিয়ে গেল বিংশ শতাব্দীর যন্ত্র ও বিজ্ঞানের জগৎ।

শিলা দেখল :

ম্লান পিঙ্গল আলোয় গভীর অরণ্য ছেয়ে গেছে। চারদিকে শুধু বিরাট গাছের সারি, গাছের ফাঁকে ফাঁকে কতো অদ্ভুত জীব সরে যাচ্ছে। বনভূমি ভেদ করে গাছের তলা দিয়ে নদীর জল বয়ে চলেছে। তারই ধারে পাহাড়, পাথরের ওপরে শিলা বসে আছে।

অনেক দূর থেকে নদীর জলে দাঁড় টানার শব্দ শোনা গেল, সেই সঙ্গে হাওয়ায় ভেসে এল একটা ক্ষীণ বিষণ্ণ সুর : যেন ঘনবর্ষার দিনে নদীর জলে মেঘের ছায়া পড়েছে, হাওয়ায় মেঘের আর্তনাদ, হাওয়ার পাকে পাকে মৃত্যুর অবসন্ন সঙ্গীত। দাঁড়ের ছপছপ শব্দ এগিয়ে আসছে। পিঙ্গল আলোয় যেন কালো পাথরে গড়া কয়েকটা মূর্তি নেমে এল। তিনজন একটা বিকলাঙ্গ শবদেহকে বুকে জড়িয়ে এগিয়ে আসছে, তাদের পেছনে একদল লোক গান গাইছে। গানের কোনো ভাষা নেই, শুধু একটানা একটা গম্ভীর শব্দ পায়ের তালে তালে সঙ্গীত রচনা করে চলেছে।

তারা চলল পাহাড়ের একটা গুহার মধ্যে, শিলাও স্বপ্নের মতো তাদের সঙ্গে মৃত্যুর এই আদিম সমারোহে যোগ দিল। পায়ের তলা দিয়ে একটা ক্ষীণ জলস্রোত চলেছে, গুহার দু পাশের দেয়ালে কতো অদ্ভুত মূর্তি আর ছবি। নিঃশব্দে তারা এগিয়ে চলল।

সামনে খুব বড় একটা গোল জায়গা গুহার ভেতরে। কালো পাথরের এক বিশাল মূর্তি : পৃথিবীর আদিম দেবতা। সামনে পাথরের বেদী, দূরে হোমকুণ্ড জ্বলছে। আগুনের লাল আলো কালো পাথরের মূর্তির ওপর ভয়াবহ ছায়া ফেলেছে। এরা পাথরের বেদীর ওপর শব-দেহটাকে উপুড় করে শুইয়ে দিল, ঘাড়ের কাছে একটি ভীষণ ক্ষত।

আবার সেই বিষণ্ণ সুরে মৃত্যুর গান। আগুনের শিখা লাফিয়ে লাফিয়ে উঠছে, চারদিকের পাথরের দেয়ালে ছায়া নাচছে। চঞ্চল ছায়াগুলোর নাচে সমস্ত জায়গাটা ভরে উঠল। দেবমূর্তি মানুষের মূর্তি, সব সব যেন মিলিয়ে যাচ্ছে। আগুনের শিখা রক্তের মতো লাল হয়ে উঠেছে, নিভে আসছে, চারিদিকের অন্ধকার পা ফেলে এগিয়ে আসছে। শুধু ছায়া, শুধু ছায়া, কালো কালো ছায়া।

কে যেন মন্ত্রের সুরে বলতে লাগল: "পৃথিবীর এই আদিম দেবতা—মৃত্যু। এর কাছে প্রাণ দাও, মৃত্যুই জীবন। চেয়ে দেখ, পৃথিবীতে প্রাণ নেই, মৃত্যুর অন্ধকার। চেয়ে দেখ, আলো নিভে গেছে, তুমিও মৃত্যুর অন্ধকারে মিলিয়ে যাও।"

ধীরে ধীরে একটি ছায়া শিলার দিকে এগিয়ে এল। কী বিষণ্ণ এর মুখ! দৃষ্টির ভঙ্গী কতো অবসাদে ভরা। মুখটা চেনা বলে মনে হল, কিন্তু কিছুতেই মনে পড়ছে না কার মুখ।

ছায়ামূর্তি কথা বলল, প্রত্যেকটি কথা যেন মরণের ইঙ্গিত। বলল: "আমি প্রাণের উপাসনা করেছি, কতো চেষ্টা করেছি এই আদিম মৃত্যুর দেবতাকে দূরে সরিয়ে রাখতে। কোন ফল হল না। ধীরে ধীরে এর বীজমন্ত্র আমার রক্তে উচ্চারিত হয়েছে। মুক্তি নেই। তুমিও এসো, এই মৃত্যুর উৎসবে যোগ দাও, প্রাণের সমাধি করো।"

শিলা চোখ মেলল। মনের জড়তা তখনো কাটেনি। হঠাৎ পাথরের মূর্তি বিশ্রী শব্দে হেসে উঠল। শিলা তখন ভয়ে সজাগ হয়ে কাঁপছে। ঘরে বেশি ধোঁয়া নেই, শুধু দূরে হোমকুণ্ড থেকে একটা ধূসর শীর্ণ রেখা উঠছে, লণ্ঠনের আলোয় কোনোমতে দেখা যায়।

কোথায় সেই নির্জন বনভূমি? অন্ধকার গুহায় আগুনের ধারে ছায়ানৃত্য? আবার হাসির শব্দে শিলা চমকে উঠল। এবার সে দেখল পাষাণ-বিগ্রহের পেছন থেকে গুঁড়ি মেরে কে যেন বেরিয়ে আসছে। শিলা স্তব্ধ হয়ে চেয়ে রইল: অবোধ্য কতকগুলো শব্দ করে লোকটা ঘরের মধ্যে ঘুরে বেড়াতে লাগল। প্রকাণ্ড মাথা, কালো মুখখানা দেখলে ভয় হয়। মাঝে মাঝে ভার বিকৃত হাসি। শিলা এবার বুঝল লোকটা অন্ধ উন্মাদ।

এ কী বিভীষিকা! নিঃশ্বাস ফেলে শিলা চোখ বুজিয়ে অতিকষ্টে পাশ ফিরল: দড়ির বাঁধনে তার হাত-পা অবশ হয়ে গেছে, না, আর সহ্য হয় না। গভীর অবসাদে তার চিন্তা করবার ক্ষমতাও যেন ঝিমিয়ে পড়েছে। মুহূর্তের পর মুহূর্ত এই ভাবে অপেক্ষা করে থাকা আর সহ্য হয় না। এর চেয়ে অনেক ভালো একেবারে অজ্ঞান হয়ে যাওয়া।

কিন্তু আর বেশিক্ষণ অপেক্ষা করতে হল না। শিলা নিজেও বুঝতে পারল সময় যেন হয়ে এসেছে। কোথায় একটা দরজা খোলার শব্দ, তার পরেই পায়ের আওয়াজ। কে যেন পা টিপে আসছে। হঠাৎ খুব কাছ থেকেই কে ডাকল: "বোহেম্"। দূর থেকে হাসির শব্দে একবার শিউরে উঠেই শিলা মাথা তুলে দেখবার চেষ্টা করল।

লণ্ঠনের আলো মুখের ওপর এসে পড়েছে। কী বীভৎস চেহারা। একটা অস্বাভাবিক উত্তেজনায় চোখ দুটো যেন ফেটে পড়ছে। মুখের ওপরে একটা পাশবিক উল্লাসের ছাপ! শিলা মুখ ফিরিয়ে নিল। সামনে যে দাঁড়িয়ে আছে সে সাধারণ জীবনের বাইরে চলে গেছে।

"রোহেম্!" সেই আধ-পাগল লোকটা এগিয়ে এসে লণ্ঠনটা শিলার পায়েব কাছে রেখে হাসতে লাগল।

ভয়ে বিস্ময়ে ও অবসাদে শিলার শরীর অবশ হয়ে গেছে, দড়ির বাঁধনেও ভীষণ কষ্ট হচ্ছে। যন্ত্রের মতো চোখ খুলে সে দেখল মূর্তির হাতে একটা অদ্ভুত রকমেব অস্ত্র—তার লম্বা ফলাটা আলোয় জ্বলজ্বল করছে। মূর্তিটা এগিয়ে এসে হঠাৎ দেবমূর্তির পায়ের কাছে উপুড় হয়ে পড়ল। তাবপর সে কী কান্না: যেন বুক ফেটে ছিঁড়ে যাচ্ছে। বাঁশীব সুর হঠাৎ ভেসে এল কোথা থেকে, স্বপ্নে সে সুব শুনেছে শিলা, সে সুর শুনেছে বিভূতিরা সুড়ঙ্গে। শিলা তাকিয়ে দেখল রোহেমেব মুখে বাঁশী! ঘরের অন্ধকাব আবো গভীব হয়ে উঠল, হোমকুণ্ডেব ধোঁয়ায় মাদক গন্ধে বাতাস ভাবি হয়ে উঠেছে। শিলার মনে হল সে যেন আবার স্বপ্ন দেখছে: কালো আকাশের তলায় নদীর জলে দাঁড়ের শব্দ, গাছের ফাঁকে ফাঁকে নৌকা এগিয়ে আসছে।

হঠাৎ সেই মূর্তি উঠে দাঁড়াল। মুখের দিকে চেয়ে শিলার মনে হল যেন কোন অশুভ আত্মার ভর হয়েছে। সচেতন মনেব কোনো লক্ষণই নেই। মনে হল কে যেন ঘরেব মধ্যে এসেছে, কিন্তু তাকে দেখা যায় না। কোথায় যেন অস্পষ্ট গলায় চীৎকার: "আবার এসেছ? আর হেসো না।"

শিলা যেন পাথর হয়ে গেল।

"রোহেম্!" রোহেম্ তাড়াতাড়ি শিলার বাঁধন খুলতে লাগল। এক মুহূর্তের জন্য শিলার মনে মুক্তির একটা ক্ষীণ আশা হল, কিন্তু তার পরেই সে বুঝল এবার তাকে মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হতে হবে। হঠাৎ আর মনের সব অবসাদ দূর হয়ে গেল, প্রাণের আকাঙ্ক্ষা সে তীব্রভাবে অনুভব করল।

বাঁধন খোলা হতেই শিলা বেদী থেকে লাফিয়ে পড়বার চেষ্টা করল। কিন্তু দড়ির বাঁধনে শরীর এতোক্ষণ অবশ হয়ে ছিল, সে পালাতে পারল না। দুজনে একসঙ্গে শিলাকে চেপে ধরল।

"রোহেম্!" অভ্যস্ত যন্ত্রের মতো রোহেম্ শিলার মাথা বেদীর ওপর চেপে ধরে রইল। শিলার মনে হল ধারালো অস্ত্র ধীরে ধীরে উঠছে। ঝাঁকানি দিয়ে ছাড়াবার চেষ্টা করতেই রোহেম্ তার ওপর ঝুঁকে পড়ল। আর সময় নেই, সময় নেই, এইবার আসছে ভয়ানক মৃত্যু। কানের কাছে রোহেমের বিশ্রী হাসি! চোখের কোণ দিয়ে শিলা দেখল অস্ত্র নামছে। সমস্ত শরীর হঠাৎ প্রাণের আবেগে ভরে উঠল। কী কথা তার মনে হল! প্রাণপণ শক্তিতে পায়ের কাছের লণ্ঠনটায় লাথি দিয়েই শিলা জোর করে গড়িয়ে পড়ল। তারপরেই যেন প্রলয়কাণ্ড। লণ্ঠনের আলো হঠাৎ লাফিয়ে উঠেই নিভে গেল, চারদিকে অনেক ছায়া নেচে উঠল দেয়ালের গায়ে। একটা অস্বাভাবিক চীৎকার করে কে যেন শিলার গায়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে গেল। অগাধ অন্ধকারে শিলা তখন ডুবে গেছে।

ঘাটে ভোরের ষ্টীমার অনেকক্ষণ এসে গেছে। ভবতারণবাবু নানা কাযের ব্যস্ততাব মধ্যেও নজব রেখেছিলেন যাত্রীদের ওপর। সন্দেহ করবার মতো কাকেও পেলেন না, মনটা খারাপ হয়ে গেল। কলকাতার ছোকবাদুটি রাজবাড়ীর দিকে অনেকক্ষণ চলে গেছে, তাদেব বিশেষ জরুরি কায। কাল বাত্রেব দারুণ ঝড়বৃষ্টি সত্বেও ষ্টীমাব বেশি দেরি করেনি : তাতেই তারা খুসি।

ভোব বেলায় ঘুম থেকে উঠে শিলাকে না দেখতে পেয়ে নুনিয়া সাবা বাড়ী খুঁজে বেড়াতে লাগল। শিলাকে কোথাও পাওয়া গেল না।

প্রচণ্ড জ্বরে অচৈতন্যেব মতো সৌদামিনী শুয়ে আছেন। মাঝে মাঝে মাথা নাড়ছেন, বোধহয মাথাব ভেতবে খুব যন্ত্রণা হচ্ছে।

ঘন অন্ধকারে শিলা চোখ মেলল, কিছুই দেখা যায় না। হোমকুণ্ড থেকে একটা কড়া গন্ধ উঠছে।

শিলার মন অবশ, মাথাব মধ্যে একটা যন্ত্রণাব ভার। কয়েক ঘণ্টায় এতোগুলো অভিজ্ঞতা তার মনে ভিড় করে এসেছে যে নিজের অস্তিত্ব সম্বন্ধেও তার কোনো স্পষ্ট ধাবণা নেই। শুধু মনে হচ্ছে সে এখনো বেঁচে আছে।

শিলা খানিকক্ষণ নিস্তব্ধ হয়ে শুয়ে বইল। হঠাৎ মনে পড়ল তার শরীরে আব বাঁধন নেই : কিন্তু তারা গেল কোথায়? মনে পড়ছে সে অজ্ঞান হয়ে গিছল, কিন্তু সচেতন হয়ে সে চিন্তাব সঙ্গতি খুঁজে পাচ্ছে না। তার মৃত্যু হল না কেন? হয়ত এরার হবে।

তবু···শরীরের বাঁধন গেছে। মুক্তির চিন্তায় শরীরে রক্তের ঢেউ জাগল। কিন্তু ওঠবার চেষ্টা করতেই সে বুঝতে পারল কতো দুর্বল হয়ে পড়েছে। পাদুটোও অসম্ভব ভারি হয়ে গেছে, নাড়াতে পারা যাচ্ছে না। আর একবার সে চেষ্টা করল, এবার বুঝল তার পায়ের ওপর ভারী কী যেন একটা পড়ে রয়েছে।

ভয়ে শিলা চমকে উঠল। ঘন অন্ধকারে কিছুই দেখা যায় না। পায়ের দিকের শাড়ী ভিজে উঠেছে। অন্ধকারে হাত বাড়িয়ে সে দেখল বেদীর ওপরটাও ভিজে। প্রাণপণ চেষ্টায় একটা পা সরিয়ে নিতেই কী একটা ভারী জিনিষ বেদীর ওপরেই গড়িয়ে পড়ল। অতিকষ্টে উঠে হাত বাড়াতেই তার হাতে ঠেকল একটা মানুষের দেহ—ঠাণ্ডা, শক্ত মাংসের ছোঁয়ায় শিলা ভয়ে চীৎকার করে উঠল।

সৌদামিনী উঠে বসলেন বিছানায়। মাথার মধ্যে ভীষণ যন্ত্রণা হচ্ছে! ঘরে কেউ নেই: মনে পড়ল অনেকক্ষণ আগে সেই ছেলে দুটি এসেছিল······আরো যেন কারা··· · কাকে খুঁজছিল?

সৌদামিনীর হাসি এল: বারণ করেছিলেন, বাধা দিয়েছিলেন, ওরা শোনেনি। সৌদামিনী উত্তেজিত হয়ে উঠলেন: কে বলেছিল ওদের খুনের ব্যাপারে তদন্ত করতে? তাঁর চিকিৎসা, সেবার ভার নিতেও কেউ বলেনি। মেয়েটির কথা মনে পড়তে সৌদামিনীর মনটা একটু নরম হল। ভারি ভালো মেয়ে—কোথায় সে?

হঠাৎ কী ভেবে উত্তেজিত হয়ে সৌদামিনী হেসে উঠলেন। ওরা

তাঁকে সন্দেহ করেছিল! আবার হাসির বেগে মুখচোখ বিকৃত হয়ে গেল। সন্দেহ করেছিল—এখন ?

একটা তীব্র যন্ত্রণার মতো কালীশ্বরীর কথা তাঁর মনে এল। ভয়ে মুখ শাদা হয়ে গেল, অস্থির হয়ে পড়লেন। মাথার ভেতরে রাশি রাশি চিন্তা জড়িয়ে যাচ্ছে। কে খুন করল কালীশ্বরীকে ? কোথায় সেই মেয়েটি ? ভারি ভালো মেয়ে, তার সঙ্গে তিনি পালিয়ে যাবেন রাজবাড়ী থেকে। এখানে অন্ধকার, এখানে স্মৃতির দীর্ঘশ্বাস, অদৃশ্য আত্মার পদধ্বনি।

কিন্তু কোথায় গেল সেই মেয়ে ? কী হল তার ? হঠাৎ কী কথা মনে হল, শরীর থর্থর্ করে কাঁপতে লাগল। না, না, না ..... তিনি এ কায করতে পারেন না। মাথার মধ্যে লক্ষ লক্ষ চাকা ঘুরছে : চাকার আওয়াজে কিছু শোনা যায় না, কিছু বোঝা যায় না। কে ? কে ? তুমি কে ? কে ডাকছে ?

টলতে টলতে সৌদামিনী বিছানা থেকে নেমে দালানের দিকে এগিয়ে চললেন। আবার হাসির বেগে শরীর কাঁপতে লাগল। চল, চল, কোথায় নিয়ে যাবে চল।

অন্ধকারে শিলা অনেকক্ষণ স্তব্ধ হয়ে বসে রইল। কার মৃতদেহ ? এখানে কেন ? খোলা দরজার কথা শিলার মনে পড়ল। আর সময় নেই, হয়ত এখনি তারা এসে পড়বে। কিন্তু দরজার বাইরেই তো জটিল ধাঁধার মতো অন্ধকার সুড়ঙ্গ। সেখানেও পদে পদে বিপদ, প্রতি মুহূর্তে ভয়। বেদী থেকে নেমে শিলা থমকে দাঁড়াল। না, এখান থেকে বেরোতেই

হবে, বাঁচতে হবে। অন্ধকারে হাতড়ে হাতড়ে শিলা এগোতে লাগল।

হঠাৎ হাতে ঠাণ্ডা মতো কি লাগল। পাথরের মূর্তি! চমকে উঠে শিলা ফিরে চলল। দেয়াল ভিজে ঠাণ্ডা। পা টিপে টিপে অন্ধের মতো সে চলেছে—কোথায় দরজা? মাথা ঝিমঝিম করছে: চারদিকে শুধু দেয়াল—কোথায় দরজা? দরজা কি তারা বন্ধ করে গেছে? ভয়ে শিলার শরীর ঘামে ভিজে উঠল। পা আর চলে না—শিলা কাঁপতে কাঁপতে বসে পড়ল। কোথায় দরজা?

কতক্ষণ সে এইভাবে বসে রইল জানে না, মনে হল যেন অনেক দূরে পায়ের শব্দ। আবার তারা আসছে ···আর রক্ষা নেই। পালাতে হবে, সময় নেই। কিন্তু পা আর চলে না। কোথায় বা পালাবে? আসুক তারা, আসুক মৃত্যু, এ দুঃস্বপ্নের শেষ হোক। দেহমনে তীব্র অপেক্ষা নিয়ে দেয়ালের ধারে শিলা বসে রইল।

পায়ের শব্দ ক্রমেই এগিয়ে আসছে, সামান্য একটু আলোর আভাসও দেখা যায়। হঠাৎ কে যেন ডাকল। দূর থেকে ক্ষীণ স্বর: "শিলা।" আবার, আবার। মাথার ভেতর রক্তের ঢেউ আছড়ে পড়ল। কে ডাকছে? কে? বিভূতি? পাগলের মতো শিলা চীৎকার করল: "বিভূতি! বিভূতি।" ঘরের অন্ধকারে, চারদিকের ঘন নিঃশব্দতায় গলার স্বর বিকৃত হয়ে গেল। নিজের গলার প্রতিধ্বনিতেই শিলা চমকে উঠল। কারা যেন ছুটে আসছে······আসছে······। এবার মৃত্যুর শেষ, এবার জীবন, আলো। কাঁপতে কাঁপতে শিলা উঠে দাঁড়াল।

তারপর: আলোয় অন্ধকারে ছায়ায় জড়িয়ে অস্পষ্ট দৃশ্য। ওরা

ধল বিভূতি, শঙ্কর

ভজুয়া সব দল বেঁধে তাকে ঘিরে দাঁড়িয়েছে। একটা চাপা কান্নায় দম বন্ধ হয়ে এল, তারপর আবার সব অন্ধকার।

গড়ের ছাতে সৌদামিনী উঠলেন। প্রকাণ্ড ছাত, প্রাচীরের ফাটলে ফাটলে ছোট ছোট গাছ গজিয়েছে। সৌদামিনী অস্থির হয়ে ঘুরে বেড়াতে লাগলেন। বড়ো বড়ো গাছ ঢেউয়েব মতো উঠে নেমে চার-দিকে ছড়িয়ে আছে। অনেক দূরে বনেব পাশ দিয়ে কালো আকাশের তলায় নদীর ধূসব জলবেখা দেখা যাচ্ছে।

সৌদামিনী ফিরলেন। এদিকে ডাইনীব খাল—কালো জল অশ্রান্ত গতিতে ছুটে চলেছে। ওপারে আবাব বন, গাছেব সাবি। গাছেব সবুজ মাথার ওপবে মেঘের মেলা বসেছে। হাওযায় সৌদামিনীব মাথার চুল উড়ছে—গায়ের কাপড় রাখা যায না।

বৃষ্টির প্রথম ফোঁটাগুলো পড়তে আরম্ভ হল। ক্লান্ত অবসন্ন চোখদুটি তুলে সৌদামিনী আকাশেব দিকে তাকালেন। না, সেখানেও মুক্তির কোনো ইঙ্গিত নেই, অনেক উঁচুতে শুধু কালো মেঘের সীমাহীন সমারোহ। বৃষ্টির ছাটে শবীব ভিজে যাচ্ছে। কোনো খেয়াল নেই।

মাথার মধ্যে আবার যন্ত্রণা স্থুরু হল। চোখেব সামনে ডাইনীব খাল এঁকে বেঁকে অনেক দূর পর্যন্ত চলে গেছে। মনে হল জলের ভেতর থেকে কারা যেন হাত তুলে ডাকছে। মাথার ভেতরে চাকা ঘুরছে আবার—হাজার হাজার, লক্ষ লক্ষ চাকা। তাদেব গতিবেগে শরীর কাঁপছে, টলছে। আকাশের সমস্ত অন্ধকাব নামল সৌদামিনীর চোখে...চীৎকার করে উঠে

লাগলেন, কে যেন হাত ধরে টেনে নিল। গড়ের ছাতের প্রাচীর যেখানটায় ভাঙা সৌদামিনী সেখানে এসে দাঁড়ালেন : এক শ ফিট নিচে নাটমন্দিরেব উঠান।

চোখেব অন্ধকাব কেটে আসছে। সৌদামিনী নিচের দিকে তাকালেন। অনেক, অনেক নিচে কাবা যেন ঘুরে বেড়াচ্ছে কাকে যেন ধবাধবি করে নিয়ে যাচ্ছে। সৌদামিনীর হাসি এল—ওবা এখনো যায়নি, এখনো খোঁজ কবে বেড়াচ্ছে ? হঠাৎ কুয়োর দিকে নজর পড়ল ঐ তো ওখানে সেদিনের মতোই আজো ছোট বউ শুয়ে আছে। হাত তুলে ডাকছে · ·"কেন ডাকছো ? একা থাকতে পাবছ না ?" হাওয়ায় সৌদামিনীর বিকৃত হাসি উড়িয়ে নিল। মাথার মধ্যে হঠাৎ একসঙ্গে লক্ষ চাকা গর্জন করে উঠল। এক শ ফিট নিচেব উঠান ওপর দিকে উঠে আসছে······"তোমাকে ছেড়ে থাকবোনা ···"

অতিকষ্টে শিলাকে আমবা কুয়োর পথ দিয়ে ওপবে তুললাম। জ্ঞান হলেও শবীব দুর্বল। অনেক খোঁজ করে, অনেক ঘুবে সুড়ঙ্গেব ঘরে ওকে পেলাম। যে ঝড়বৃষ্টি নিয়ে এই খুনেব তদন্ত আবম্ভ হয়েছিল সেই ঝড়বৃষ্টির মধ্যেই এব সমাপ্তি। কুয়োব ধাব থেকে সবে এসে যখন দাঁড়ালাম তখন বেশ জোবে বৃষ্টি পড়ছে।

হঠাৎ ববিশঙ্কব গড়েব ছাতেব দিকে তাকিয়ে চীৎকাব করে উঠল। আমবা সকলেই একসঙ্গে ওপবেব দিকে চেয়ে স্তব্ধ হয়ে গেলাম। ছাতেব প্রাচীব যেখানটায় ভাঙা সৌদামিনী সেখানে দাঁড়িয়ে আছেন। হাওয়ায় মাথাব চুল উড়ছে, ঝড়েব ঠেলায় সমস্ত শরীব দুলছে। মাথাব ওপব কালো আকাশ, বৃষ্টির ছাটে শরীব ভেসে যাচ্ছে হঠাৎ একটা অদ্ভুত হাসিতে বিষণ্ণ মুখটি ভবে গেল······এক মুহূর্ত··· তারপরেই সৌদামিনী লাফিয়ে পড়লেন। শরীরটা শূন্যে কয়েকবার দুলে ঘুরেই· · ··

শিলা চীৎকার করে কাঁপতে কাঁপতে বসে পড়ল

এই ঘটনার প্রায় এক সপ্তাহ পরে আমরা শিলার সঙ্গে দেখা করলাম। কলকাতায় পৌঁছেই শিলার জ্বর হয়, তাছাড়া এ কয়দিনের ভীষণ অভিজ্ঞতা তো ছিলই। কিন্তু তবু এরই মধ্যে শিলা অমরবাবুর কাছে সমস্ত ঘটনার ছোট বিবরণ দিয়ে একখানা চিঠি লিখেছে।

সন্ধ্যার সময়ে ক্যামাক্ ষ্ট্রীটের বাড়ীতে শিবিরের অধিবেশন আরম্ভ হল। শিলা বেশ সেরে গেছে। দয়াময়ী নৈহাটিতে যাননি—বাতের ব্যথা কমলেও! শিলা তাঁর কাছে কোনো কথা বলেনি, ভজুয়াকেও বারণ করেছে। দয়াময়ী জানেন শিলা তার এক বন্ধুর বাড়ীতে গিয়েছিল।

শিলা প্রথমেই বলল: "বিভূতি, তোমাকে কিন্তু সমস্ত ঘটনাটি লিখে ছাপাতে হবে।"

"আমি লিখব? বল কী? তোমরা সাহিত্যের দুই ধুরন্ধর থাকতে?"

"লিখতে বিভূতিকেই হবে," রবিশঙ্কর বলল, "তবে এসো তার আগে সমস্ত ব্যাপারটা ভালো করে আলোচনা করা যাক।"

ভজুয়া চা দিয়ে গেল, আমাদের আলোচনাও সুরু হল।

শিলা বলল: "এই ঘটনাটার মধ্যে দুটো ব্যাপার জড়িয়ে গেছে: খুন ও আফিম ইত্যাদির ব্যবসা।"

"কিন্তু কালীশ্বরীর ব্যাপারটা কী?" রবিশঙ্কর জিগেস করল।

শিলা বলল: "এটা ধর্মের বিকার ছাড়া আর কিছু নয়। রায়-বংশে তান্ত্রিক উপাসনার রীতি ছিল, কেউ কেউ শবসাধনাও করতেন। কালীশ্বরীর স্বামী সূর্যনারায়ণও এ-সবের মধ্যে জড়িয়ে ছিলেন। কিন্তু

মিলেছে আদিম জাতির কুৎসিত ভীষণ কতকগুলো পদ্ধতি। আমি যা দেখেছি তোমাদের কাছে আগেই হীমারে বলেছি, তোমরা নিজেও সুড়ঙ্গের ঘরে অনেক কিছু দেখেছ। এগুলো অস্বাভাবিক বা অসম্ভব বলে মনে হতে পারে, কিন্তু পৃথিবীর অনেক দেশেই এ ধরণের রীতি, বিশেষতঃ আদিম জাতিদের মধ্যে প্রচলিত আছে। আমার মনে হচ্ছে ফ্রেজারের একখানা বইয়ে আমি এরকম ব্যাপার পড়েছি। কালীশ্বরী খুব সম্ভব সুন্দরবনের বুনো জাত বা আরাকানী বুনো জাতের কারো কাছে এসব শিখেছিলেন।"

"কিন্তু ওয়াং-ফুর দলের সঙ্গে কালীশ্বরীর কী সম্পর্ক?" আমি জিগেস করলাম।

শিলা বলল: "এটা সহজ কথা। কোনো রকমে কাফু বা রোহেমের সঙ্গে এদের পরিচয় হয়। সুড়ঙ্গের ঘর ও পথ ওয়াংকে ব্যবহার করতে দেওয়া হয়। কিন্তু তার পরিবর্তে সে ছেলেমেয়ে ধরে এনে এই পাশবিক পূজোর খোরাক যুগিয়েছে। সুড়ঙ্গের ঘরে যে বিকলাঙ্গ দেহ তোমরা দেখেছিলে তাকে আনা হয়েছিল নিশ্চয় কোনো বিকৃত শব-সাধনার উদ্দেশ্যে। কিন্তু তার আগেই কালীশ্বরী মারা গিয়েছিলেন।"

রবিশঙ্কর বলল: "শিলা, কিন্তু সব চেয়ে জটিল ব্যাপার হচ্ছে কালীশ্বরীর সঙ্গে সৌদামিনীর সম্পর্ক। এটা আমি ভালো করে বুঝতে পারছি না।"

৮ শিলা ব্যাখ্যা সুরু করল: "দেখ, সৌদামিনী প্রথমে একেবারেই নির্দোষ ছিলেন, শেষ পর্যন্ত তাঁর মনে দ্বন্দ্ব ছিল। কিন্তু কালীশ্বরী সাপে যেমন পাখীকে বশ করে ঠিক সেই ভাবেই সৌদামিনীকে নিজের

বশে আনেন। সৌদামিনী অনেক দিন আগে থেকেই কালীশ্বরীর গোপন ব্যাপার সন্দেহ করছিলেন, বারণও করেছিলেন, কিন্তু শেষে তিনি নিজেই জড়িয়ে পড়েন। তারপর থেকেই ধীরে ধীরে মস্তিষ্কের বিকৃতি আরম্ভ হয়। এই মনোবিকারই খুনের কারণ, এরই ফলে ভীষণ অসুখ হয়েছিল।”

আমি বললাম: “কিন্তু, শিলা, ওঁর মনের অবস্থা বা ব্যবহার ঠিক ভালো ভাবে বোঝা যায় না।”

শিলা আপত্তি করল: “বিভূতি, এটা ঠিক কথা নয়। ডক্টর্ মিত্র বুঝতে পারেননি, কারণ সমস্ত ব্যাপার তিনি কিছুই জানতেন না। এ সম্বন্ধে অনেক বই আছে—আমি কিছু কিছু পড়েছি। সৌদামিনীর কেস্‌টা অ্যাবনর্ম্যাল্ সাইকোলজির মধ্যে খানিকটা পড়ে। নার্ভ ও ব্রেণ-সংক্রান্ত অসুখও এটা। ধর্ম, অপরাধ, মনোবিকার—এগুলোর মধ্যে খুব নিকট সম্পর্ক আছে। গত মহাযুদ্ধের পরে বিষাক্ত গ্যাসে বা সেল্-শকের ফলেও এরকম অনেক কেস্ দেখা গেছে। সৌদামিনীর যে ধরণের মনোবিকার বা মস্তিষ্কবিকৃতি হয়েছিল তা হচ্ছে dual personality ও alternate amnesia জড়িয়ে একটা variation যা খুব কম দেখা যায়। আমাদের মন ও ব্রেন্ এতো জটিল যে এ বিষয়ে কোনো বাঁধা-ধরা নিয়ম খুঁজে বার করা প্রায় অসম্ভব। বিশেষতঃ মনোবিকার সংক্রান্ত প্রত্যেকটি কেস্‌ই প্রায় আলাদা। আমার মনে হয়, সৌদামিনীর এই মানসিক অবস্থার নানারকম কারণ আছে। প্রথমে, ধরো, বহুপুরুষের তন্ত্রসাধনার বীজ তাঁর রক্তে এসে গেছে। তারপর, এই স্মৃতিতে ভরা রহস্যময় নির্জন বাড়ীতে দিনের পর দিন থাকা। তারপর, এই কুৎসিত সাধনা

ৌদামিনীকে দীক্ষিত হতে হয়েছিল। তা ছাড়া শেষ পর্যন্ত তাঁর মনের ধ্যে দ্বন্দ্বও ছিল।"

রবিশঙ্কর জিগেস করল, "তোমার কি মনে হয় সৌদামিনী জ্ঞানে খুন করেছিলেন?"

শিলা বলল: "এখানেই তো dual personalityর কথা ওঠে। াবিকারের ফলে সৌদামিনীর ব্যক্তিত্ব যেন দুটো মূর্তি নিয়েছে। জ্ঞানে তিনি খুন করেননি। তোমরা নিশ্চয় শুনেছ অনেক সময়ে াকে ঘুমের ঘোরে অনেক কাজ করে, ঘুরে বেড়ায় কিন্তু জেগে উঠে ছুই মনে রাখে না। লেডি ম্যাকবেথের কথা ভাবো। সৌদামিনীর নের অবস্থা আরো জটিল। এরো amnesia বা বিস্মৃতি যা ভাওয়াল ন্ন্যাসীর হয়েছিল—এরকম অনেক লোকেরই হয়, বইয়ে এরকম নেক কেস্ আছে। এর ফলে অনেক নিরুদ্দেশ হয়ে যায়, অতীত বনের সব কথা ভুলে গিয়ে নতুন জায়গায় নতুন ভাবে জীবন রম্ভ করে। যখন সেই বিস্মৃতির অবস্থা চলে যায় তখন কেউ কেউ মস্ত কথা মনে করতে পারে, আবার কেউ মধ্যের সময়টা একেবারেই লে যায়। সাধারণতঃ এই বিস্মৃতি কিছুদিন থাকে, কখনো কখনো নেক দিন থাকে। কিন্তু সৌদামিনীর amnesia ও স্বাভাবিক বনে ফিরে আসা এত তাড়াতাড়ি ঘটেছে যে এ দুটোই জড়িয়ে একটা টিল অবস্থার সৃষ্টি করেছে। সেইজন্য স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরেও ৌদামিনীর সন্দেহ হয় তিনিই বোধহয় খুন করেছেন, কিন্তু বুঝতে ারেন না কেন ও কী ভাবে এ খুন হয়েছে—সে কথা মনে থাকে না। খন অবচেতন মনে আলোড়ন চলতে থাকে, ধীরে ধীরে আবার স্বাভাবিক বিকৃত অবস্থা জেগে ওঠে। তখন সৌদামিনী নেন

ভীষণ মূর্তি। কিন্তু সব চেয়ে জটিল ও কষ্টকর ব্যাপার হয় যখন এই alternation থেমে গিয়ে দুটো অবস্থাই এক সঙ্গে জড়িয়ে যায়। যখন আমি এটা বুঝতে পারলাম তখনই আমি জানতাম সৌদামিনী বাঁচবেন না। ব্রেনের মধ্যে, ভাবো, কী দারুণ বিপর্যয় চলেছে! খুন করলেও সৌদামিনী বৈজ্ঞানিক মতে সম্পূর্ণ নির্দোষ, বরং তাঁর ওপরে করুণা হওয়া উচিত।"

স্তম্ভিত হয়ে রইলাম: মানুষের মনের অরণ্য কী বিশাল, ভয়ঙ্কর! সত্যি, শিলা দরদ দিয়ে বুঝতে চেষ্টা করেছে- পুঁথিগত বিদ্যা নয়। বললাম: "শিলা, কিন্তু আসল ব্যাপারটা এখনো বলনি। খুনটা হল কী ভাবে? তুমি সৌদামিনীকেই বা সন্দেহ করলে কেন?"

শিলা হেসে বলল: "শোনো আমার ব্যাখ্যা, দেখ পছন্দ হয় কি-না। কালীশ্বরী তাঁর গোপন কাযের জন্য বাড়ীতে কাকেও থাকতে দিতেন না, কূয়োই ছিল তাঁর যাতায়াতের পথ। রোহেম্ কিছুদিন আগে থেকেই সুড়ঙ্গে থাকত, দরকার হলে কাফুও যোগ দিত. সৌদামিনী আসতেন লুকোনো সিঁড়ি দিয়ে। খুনের আগে থেকেই সৌদামিনী স্বাভাবিক অবস্থায় ছিলেন না। ঝড়ের রাতেই তাঁর মানসিক বিকার সম্পূর্ণ হয়। খুব সম্ভব, সুড়ঙ্গের পথে কালীশ্বরীকে অনুসরণ করে কূয়োর তলায় খুন করেন। কালীশ্বরীর শেষ চীৎকার স্বাভাবিক অবস্থাতেও তাঁর কানে লেগে ছিল, কিন্তু বিকারের অবস্থা ভুলে গিয়ে তিনি মনে করেছিলেন যে চীৎকারটা তিনি শুনেছেন বিছানা থেকে। ইচ্ছা করে তিনি খুন গোপন করবার চেষ্টা করেন নি, তাহলে তোমাদের কাছে অত কথা বলতেন না। কিন্তু সব সময়েই মনের মধ্যে একটা অস্পষ্ট সন্দেহ, একটা অস্বস্তি ছিল, বার বার সে

করছিলেন খুনের কথা ভুলে থাকতে। সেইজন্যই তদন্তে সামান্য বাধা তিনি দিয়েছিলেন। গড়ের ছাত থেকে যখন লাস দেখেন তখন থেকেই মনের এই অবস্থা সুরু হয়।"

রবিশঙ্কর বলল : "কিন্তু, শিলা, লাসটা ছিল কুয়োর ধারে। ওটা ওপরে এল কেন ?"

শিলা বলল : "তোমরা কালীশ্বরীর লাস দেখেছ, সকলের কাছেই শুনেছ তাঁর অমানুষিক শক্তি ছিল। মনোবিকার তাঁরও নিশ্চয় ছিল, ফলে এই ক্ষমতা কত গুণ বেড়ে যায়। জান তো একটা দুবল লোকও পাগল হলে তার গায়ে কী ভীষণ জোর হয়। আহত হয়েও কালীশ্বরী তখনই মরেন নি, হয়ত অজ্ঞান হয়ে গিছলেন। পরে জ্ঞান হলে বিকৃত শক্তির জোরে তিনি কুয়ো থেকে উঠছিলেন—সেই অবস্থায় প্রচুর রক্তক্ষয়ে মারা যান। বৃষ্টির জলে রক্ত ধুয়ে গিয়েছিল।"

আমি বললাম : "তোমাকে কুয়ো থেকে তুলে আবার যখন দলবল নিয়ে সুড়ঙ্গে ঢুকেছিলাম তখন আরো দু-একটা ঘর দেখেছি। একটা ঘর নরকঙ্কালে বোঝাই, বোধহয় বহুপুরুষের সঞ্চিত সম্পত্তি। কালীশ্বরী ও কাফুর মৃতদেহও দেখেছি। কিন্তু কাফু মরল কেন, কী ভাবে লাসগুলো সুড়ঙ্গে এল ?"

শিলা আবার ব্যাখ্যা সুরু করল : "কালীশ্বরীর সঙ্গে সৌদামিনীর কোনো কালেই সদ্ভাব ছিল না, কাফুও একথা জানত। খুনের পরেই তার সৌদামিনীর ওপর সন্দেহ হয়। গুনিয়ার কাছে শুনেছি সে সৌদামিনীর সঙ্গে দেখাও করেছিল। লেহাইকে সরিয়ে দিয়ে সে একাই লাসের কাছে ছিল। হয়ত ঘুমিয়ে পড়েছিল, হয়ত একটু অসাবধান হয়েছিল। সৌদামিনী লুকোনো সিঁড়ি দিয়ে নেমে এসে তাকে গলা

টিপে মারেন। লোহার সিন্দুকের দরজা বলে যেটাকে তোমরা সন্দেহ করেছিলে সেটাই হচ্ছে সিঁড়িতে যাবার পথ, ভেতর থেকে খিল দেওয়া আছে। আমি সিঁড়ি দিয়ে নামবার সময়ে দেখেছি। কাফ্রি বাধা দিতে চেষ্টা করে—সেইজন্যই ধুলোর ওপর দাগ, সেইজন্যই সৌদামিনীর হাত ছড়ে গিয়েছিল। কিন্তু শেষে বিকৃত শক্তির কাছে কাফ্রিও হার মানে। ঐ দরজা দিয়ে সৌদামিনী লাসগুটো সরিয়ে ফেলেন।"

"সৌদামিনীকে তোমার সন্দেহ হল কেন?" রবিশঙ্কর জিগেস করল।

শিলা বলল: "প্রথম থেকেই খুনটা আমার কাছে অস্বাভাবিক লেগেছিল। সৌদামিনীর মানসিক অবস্থাও অস্বাভাবিক। তারপর রাজবাড়ীর ইতিহাস, তোমাদের খবর—সন্দেহ ক্রমেই বাড়ছিল। নুনিয়ার ঘুম অসম্ভব—সেই সুযোগে দু দিন সৌদামিনী সিঁড়ি দিয়ে নেমে যান। বার বার অজ্ঞান হয়ে যাওয়ারও অর্থ আছে -বিকারের ঘোরের শেষেই দারুণ অবসাদে এ রকম হত। তোমরা সুড়ঙ্গে যে মূর্তি দেখেছিলে সে সৌদামিনী, তিনিই রামভকতকে গলা টিপে মারতে গিয়েছিলেন—রামভকত অজ্ঞান হয়ে যায়। আমার পেছনে সিঁড়িতে ছুটেছিল বোহেম্, বাঁশীর আওয়াজ তারই। সৌদামিনীর বিকৃত মনে সন্দেহ হয় যে আমরা, বিশেষতঃ আমি, তাঁকে খুনের ব্যাপারে জড়াতে চেষ্টা করছি। সেইজন্যই খাটি উপাসনার পদ্ধতিতে আমাকে মারবার চেষ্টা হয়েছিল।"

রবিশঙ্কর বলল: "ভৌতিক কিছু নেই? ধরো, সুড়ঙ্গের ঘরে তোমার স্বপ্ন?"

শিলা বলল: "তা হতে পারে। এসব রহস্য ভেদ করা মানুষের সাধ্য নয়।"

আমি বললাম : "যাই হোক, তুমি বেঁচে গেছ অদৃষ্টের জোরে রোহেমের ঘাড়ে কোপ না পড়লে কী হত !"

শিলা হেসে বলল : "আমিই তো লণ্ঠনটা ঠেলে ফেলে দিয়েছিলাম শুধু অদৃষ্ট নয়, আমারও কেরামতি আছে।"

রবিশঙ্কর বলল : "শিলা, ধন্যবাদ। তুমি অক্ষয়কীর্তি রাখলে শিবিরের ভবিষ্যৎ অভিযানে আরো কত কাণ্ডই তুমি করবে। বুড়ী হয়ে তুমি যখন মারা যাবে তখন তোমার স্মৃতিস্তম্ভে কী লেখা থাকবে জান আমি সেই এপিটাফ লিখেছি।"

শিলা হেসে বলল "আগে থেকেই শুনে রাখি।"

রবিশঙ্কর কবিতা পাঠ করল

[illegible] শিলাজিৎ'
[illegible] বিসর্টের [illegible] শিলা সেন।
[illegible]
[illegible]

আমরা হেসে উঠলাম। শিলা বলল "ছন্দের সামান্য দো থাকলেও বায়রনের ব্যঙ্গ কবিতার মত শোনাচ্ছে।"

ভজুয়া এসে একটা চিঠি ও প্যাকেট দিল। "একজন পাহাড়ওয়াল ইমাত্র দিয়ে গেল।"

শিলা চিঠি খুলে বলল : "অমরবাবু লিখেছেন। শোন :

প্রিয় শিবির,

তোমাদের কাছে অশেষ ধন্যবাদ জানাচ্ছি। তোমাদের সাহায্যে ওয়াং-হ

দলকে ধরেছি। এর মধ্যে অনেক রহস্য আছে, পরে জানাব। ইহুদি ভাসারম্যান এ দলের নেতা। ওয়াং খুন হয়েছে।

খুনের তদন্ত তোমরা শেষ করেছ। এত কাযে ব্যস্ত আছি যে তোমাদের সঙ্গে দেখা করতে পারছি না। শীঘ্রই যাব। ভবিষ্যতে যদি কোনো দরকার হয়, প্রাণপণে তোমাদের সাহায্য করব। তোমরা সফল হও।

আমার স্নেহ-উপহার নিও।

শিলা প্যাকেট খুলল। একটি সোনার পাত—তাঁবুর ছবি আঁকা, তলায় লেখা 'শিবির'। শিলা বলল : "যাক আমাদের ক্লাবের একটা ব্যাজ হল। কিন্তু, বিভূতি, এইবার সব ঘটনাটা লিখে ফেল। এর মধ্যে বেশ কিছু কল্পনাও ঢুকিয়ে দিও, না হলে সাহিত্য হয় না!"

অনিচ্ছাসত্ত্বেও রাজি হলাম। বললাম : "কিন্তু এ ধরণের লেখা কি সাহিত্য হবে?"

রবিশঙ্কর ক্ষেপে গেল : "খুনজখম বা ভৌতিক ব্যাপার নিয়ে সাহিত্য হয় না একথা বলতে অনেককে শুনেছি। শেক্‌স্‌পীয়র্‌ থেকে আরম্ভ করে চেষ্টারটন্‌ পর্যন্ত ইংরাজী সাহিত্যের রত্নরা লেখেননি এরকম ব্যাপার? ডষ্টয়েভস্কি লেখেন নি? এডগার্‌ অ্যালান্‌ পো?"

আমি বললাম : "বেশ, বেশ, চটো কেন? কিন্তু এ উপন্যাসের নাম কী হবে?"

শিলা মাথার কাঁটা দিয়ে চুলে খোচা মেরে বলল : "এখানে মৃত্যুর হাওয়া।"